সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশে এর প্রয়োগ

Peace and stability in the family and social life in the light of surah an-Noor : its application in Bangladesh

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

নভেম্বর - ২০২২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মুজ্জাম্মিল হক

এম.ফিল. গবেষক

রেজি.নং- ১৯৯/২০১৭-২০১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশে এর প্রয়োগ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার গবেষণাকর্ম। এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ গবেষণাপত্র বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(মুজ্জাম্মিল হক)

এম.ফিল. গবেষক

রেজি.নং- ১৯৯/২০১৭-২০১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মুজ্জাম্মিল হক কর্তৃক উপস্থাপিত সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশে এর প্রয়োগ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোনো অংশ অন্যের ডিগ্রী থেকে নেয়া হয়নি অথবা অন্য কোনো প্রকাশনায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ও

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যার অশেষ কৃপায় আমার গবেষণাপত্র "সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ" শেষ করতে পেরেছি। দুরুদ ও সালাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মানবতার মুক্তির মহান দূত হযরত মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর সাহাবাগণ, তাবি'ঈনসহ ইসলাম প্রচারে আত্ম নিবেদিত মহান ব্যক্তিগণের প্রতি, যাদের জীবনের ত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছেছে। অতঃপর আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার মরহুম পিতা আলহাজ্ব কিরামত আলী মাস্টারকে এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা জাহানারা বেগমের প্রতি যার দু'আ, উৎসাহ ও পরামর্শে আমি এম.ফিল. গবেষণা কর্মটি শেষ করি। আমি তাঁদেরজন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তি কামনা করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন এর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. গবেষণায় যোগদান করি এবং মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে প্রথম পর্বের কোর্স সমাপ্ত করি। উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আন্তরিকতার সাথে আমাকে উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছেন। তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার পথ সুগম করেছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পড়ে এর সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্য মহান আল্লাহ তাংরার কাছে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি। বিভাগের শিক্ষকগণের প্রতি সবিনয় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমার এম.ফিল. গবেষণায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। এছাড়াও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাযুল আসাতিযা অধ্যক্ষ মাওলানা মুহম্মাদ শাহজাহান মাদানী, শ্বশুর মাওলানা রুহুল আমীন, শ্বাশুড়ী সৈয়দা সাওদা আমীন, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা মো. আব্দুর রহমানের প্রতি। কৃতজ্ঞতা জানাই সহধর্মিনী মারিয়া সুলতানার প্রতি যিনি আমার এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উৎসাহ প্রদান, পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই ভাই ফজলুল হক, আজিজুল হক, হাফিজুল হক, আমিনুল হক, এনামুল হক, মাইনুল হক, রেজাউল হক, জিয়াউল হক, সাইদুল হক, বোন দেলোওয়ারা বেগম, মাহমুদা খাতুন, খালেদা খাতুন, ফাতিমা খাতুন, ভগ্নিপতি মনিরুল ইসলাম, সন্তান আব্দুল্লাহ তাফহীম, আফিফা তান্জুম, বিশিষ্ট নাশীদ শিল্পী ইকবাল হোসাইন জীবন, মারজিয়া ইকবাল, আয়েশা তারান্নুম, সা'দ আল আমিন, মাহজুবা সুলতানা, নানী শ্বাশুড়ী আমেনা বেগমের প্রতি, যারা আমাকে বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, আল-আরাফাহ ব্যাংক লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আমি তাদের প্রতিও চির কৃতজ্ঞ। যে সকল লেখক ও ব্যক্তিবর্গের কিতাব থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি তাঁদের প্রতিও আমি শুকরিয়া জানাচ্ছি।

-গবেষক-

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশন

আ.	আলাইহিস সালাম
স.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহুম/আনহা/আনহুমা/আনহুন্না
রহ.	রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
ড.	ডক্টর
পৃ.	পৃষ্ঠা
হি.	হিজরী
বি.দ্র.	বিশেষ দ্রষ্টব্য
ঢা.বি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ্রি.	খ্রিস্টাব্দ
ইমাম বুখারী	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী
ইমাম মুসলিম	আবুর হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিশাপুরী
ইমাম তিরমিযী	আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী
ইমাম আবূ দাউদ	আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআস আস-সিজিস্তানী
ইমাম নাসাঈ	আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসাঈ
ইমাম ইবনে মাযাহ	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাযাহ আল-কাযবীনী
ইমাম আহমাদ	আহমাদ ইবনে হাম্বল
ইবনে কাছীর	আবূল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল আবনে কাছীর
ইবনে জারীর	আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী
ই.ফা.বা.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়হাকী	আহমাদ ইবনে হুসাইন আর-বায়হাকী

সূচিপত্র

ক্রম.	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
ঘোষণাপত্র		১
প্রত্যয়নপত্র		২
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		৩
সারসংক্ষেপ		৪
শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশন		৫
ভূমিকা		১২
প্রথম অধ্যায়	**আল কুরআনের পরিচয়**	১৪-২৪
	আভিধানিক পরিচয়	১৪
	পারিভাষিক পরিচয়	১৫
	সারকথা	১৫
	আল কুরআনের নামসমূহ	১৭
	কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ	১৭
	আল-কুরআনের অন্যান্য নাম	২০
	সারকথা	২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	**সূরা আন নূরের পরিচয়**	২৫-২৭
	শাব্দিক পরিচয়	২৫
	পারিভাষিক পরিচয়	২৫
	নামকরণ	২৬
	শানে নুযূল	২৬
	বিষয়বস্তু	২৬
	সূরা আন নূরের অনুবাদ ও তাফসীর	২৭
তৃতীয় অধ্যায় এর ১ম পরিচ্ছেদ	**ব্যভিচার**	৬১-৯৪
	যৌনাঙ্গ হিফাযতের বিশেষ কয়েকটি ফযীলত	৬৩
	যৌনাঙ্গ হিফাযত সফলতা অর্জনের বিশেষ মাধ্যম	৬৩
	যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী কখনো নিন্দিত নয়, বরং সে একান্তভাবে সবার প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত	৬৩
	লজ্জাস্থান হিফাযত জান্নাতে প্রবেশের একটি বিশেষ চাবিকাঠি	৬৪
	লজ্জাস্থান হিফাযত একান্তভাবে নেককারের পরিচয় বহন করে	৬৫
	লজ্জাস্থান হিফাযত আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা পাওয়ার এক বিশেষ মাধ্যম	৬৫
	লজ্জাস্থান হিফাযত আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ ডাকে সাড়া দেওয়া	৬৬

	লজ্জাস্থান হিফাযত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের এক বিশেষ মাধ্যম	৬৬
	লজ্জাস্থান হিফাযত সফলকামীদের পথ, বিপথগামীদের নয়	৬৬
	লজ্জাস্থান হিফাযত সম্মানেরই মুকুট	৬৭
	লজ্জাস্থান রক্ষার পথে একান্ত বাধাসমূহ	৬৭
	মহিলাদের নতুন নতুন মডেলের পোশাক-পরিচ্ছদ	৬৭
	টিভিচ্যানেল	৬৮
	ইন্টারনেট	৬৯
	অশ্লীল ম্যাগাজিন ও রুচিহীন পত্র-পত্রিকা	৬৯
	ক্যামেরাযুক্ত অত্যাধুনিক মোবাইল সেট	৬৯
	নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং গোপনে সহাবস্থান	৭০
	অসৎবন্ধু-বান্ধব	৭০
	বিলম্বে বিবাহ করা	৭১
	অপর কোনো মহিলা বা পুরুষের সাথে যেকোনো ধরনের শৈথিল্য দেখানো	৭১
	যত্রতত্র চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপণ	৭২
	ব্যভিচারের অপকার ও তার ভয়াবহতা	৮৩
	ব্যভিচারের স্তর বিন্যাস	৮৮
	ব্যভিচারের শাস্তি	৯৪
২য় পরিচ্ছেদ	**সমকাম বা পায়ুগমন**	১০১-১২১
	সমকামিতার অপকার ও তার ভয়াবহতা	১০৪
	ধর্মীয় অপকার	১০৪
	চারিত্রিক অপকারসমূহ	১০৪
	মানসিক অপকারসমূহ	১০৫
	শারীরিক অপকারসমূহ	১০৬
	সমকামিতার শাস্তি	১০৯
	সমকামিতার চিকিৎসা	১১১
	রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের চিকিৎসা	১১১
	রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা	১২১
	সংক্ষিপ্তকারে প্রস্তাবিত চিকিৎসাসমূহ	১২১
৩য় পরিচ্ছেদ	**পর্দা**	১৩১-১৬১
	পর্দার শাব্দিক পরিচয়	১৩২
	পর্দার পারিভাষিক পরিচয়	১৩২
	পর্দার বিধান	১৩২
	পর্দার গুরুত্ব	১৩৩
	পর্দাহীনতার পরিণতি	১৩৪
	যেভাবে পর্দা পালন করতে হবে	১৩৬
	গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা	১৩৬
	বাইরে গমনকালীন পর্দা	১৩৮

	বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা	১৪০
	পবিত্র কুরআনের আলোকে পর্দার অপরিহার্যতা ও বিধি-বিধান	১৪১
	শরয়ী পর্দায় কি মুখ ঢাকা জরুরি	১৪৯
	মাহরাম	১৫৫
	মাহরামের শাব্দিক অর্থ	১৫৬
	মাহরামের পারিভাষিক অর্থ	১৫৬
	মাহরামের প্রকারভেদ	১৫৬
	বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে মাহরাম	১৫৮
	মুসলিমের পোশাক : কিছু মূলনীতি	১৬১
	পোশাকের কিছু মৌলিক নীতিমালা	১৬১
৪র্থ পরিচ্ছেদ	**ইফ্‌কের ঘটনা**	১৭২-১৮২
	আয়েশা (রা.) এর ওপর অপবাদের ঘটনা নিয়ে ইসলাম বিরোধী আপত্তি ও তার	১৭২
	ইফ্‌কের ঘটনার শিক্ষা	১৮২
৫ম পরিচ্ছেদ	**অন্যের গৃহে প্রবেশের ইসলামের বিধান**	১৮৩-২০৮
	অন্যের গৃহে প্রবেশের নিয়ম কী? কুরআন হাদীসের আলোকে আলোচনা	১৮৪
	কুরআনের আলোকে অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান	১৮৫
	অনুমতি গ্রহণের উপকারিতা	১৮৭
	অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণ	১৮৮
	অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি	১৮৯
	কলিংবেল দেওয়া ও দরজায় নক করা	১৯০
	নাম পরিচয় উল্লেখ করা	১৯১
	আমি আমি করা অনুচিত	১৯২
	দরজায় দাঁড়ানোর নিয়ম	১৯২
	জবাব না এলে	১৯৩
	মাহরামের ঘরে গেলে	১৯৪
	মহিলা মহিলার ঘরে গেলে	১৯৬
	পাবলিক নিবাস হলে	১৯৬
	অনুমতি গ্রহণের আদবসমূহ	১৯৭
	অনুমতি গ্রহণের প্রাক্কালে সালাম দেওয়া	১৯৭
	তিনবার অনুমতি চাওয়া	১৯৮
	অনুমতি গ্রহণকারীর পরিচয় পেশ করা	১৯৯
	জোরে জোরে দরজায় খটখট না করা	২০০
	অনুমতি গ্রহণের সময় দরজা বরাবর না দাঁড়ানো	২০১
	অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা	২০১
	বিনা অনুমতিতে অন্যের বাড়ী বা গৃহের অভ্যন্তরে না তাকানো	২০১
	দৃষ্টি অবনমিত রাখা	২০৩

	অনুমতি দেওয়া না হলে ফিরে আসা	২০৩
	বাসিন্দা বিহীন বাড়ী বা ঘরে প্রবেশে অনুমতি নিষ্প্রয়োজন	২০৩
	কাউকে ডাকার জন্য লোক পাঠানো হলে অনুমতি নিষ্প্রয়োজন	২০৪
	মাহরাম মহিলাদের নিকটে প্রবেশকালে অনুমতি নেওয়া	২০৪
	শিশুদের অনুমতি গ্রহণ	২০৬
	বাড়ীতে বা গৃহে কেউ না থাকলে সেখানে প্রবেশ না করা	২০৬
	বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে স্ত্রীকে সতর্ক করা	২০৬
	তাসবীহ বলা বা হাতে হাত মারার মাধ্যমে অনুমতি প্রদান	২০৭
	অনুমতি প্রার্থীকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা	২০৭
	বাড়ী বা গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় অনুমতি নেওয়া	২০৭
	জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি চাওয়া	২০৮
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	**মিথ্যা অপবাদ ইসলামে জঘন্যতম অপরাধ**	২০৯-২৩৫
	ইসলামে কাউকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি	২১২
	অপবাদ ও অপপ্রচার নিয়ে কুরআনের বাণী	২১৪
	মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ভয়াবহতা	২১৭
	অপবাদ জঘন্য অপরাধ	২১৯
	মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদরে পরিনাম	২২৪
	মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান শিরক সমতুল্য গুনাহ	২২৫
	মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার ভালো আমল কবুল হবে না	২২৬
	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবিরা গুনাহ	২২৬
	মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ দেওয়া বড় যুলুম	২২৭
	মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ও গ্রহণকারী উভয়ে সমান অপরাধী	২২৭
	মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ও গ্রহণকারী খেয়ানতকারী হিসেবে অভিযুক্ত	২২৭
	মিথ্যা অপবাদকারী হতভাগা	২২৮
	বায়োনট অভিযোগকারীর স্থান জাহান্নাম	২২৮
	মিথ্যা রটনাকারীর ওপর আল্লাহর গযব	২২৯
	মিথ্যা রটনাকারী ব্যর্থ হয়	২২৯
	অপবাদ ক্ষণস্থায়ী	২২৯
	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়	২৩০
	সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়	২৩০
	সামাজিক ঐক্য ও সংহতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়	২৩০
	রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয়	২৩০
	গীবত এবং অপবাদের পার্থক্য	২৩২
	গীবত কী?	২৩২
	মিথ্যা অপবাদকারী, যুলুমকারী, খুনী ও খেয়ানতকারী সবাই হতভাগা	২৩৪

	যাদের দোষ বর্ণনা করা যায়	২৩৫
৭ম পরিচ্ছেদ	**খোঁটা দেওয়া**	২৩৭
	খোঁটা দেওয়ার কুফল	২৩৮
৮ম পরিচ্ছেদ	**বিবাহ, এর বিধান**	২৫৪-২৫৮
	বিবাহের শাব্দিক সংজ্ঞা	২৫৪
	শরীআতের পরিভাষায় বিবাহ	২৫৪
	বিবাহ শরীআত সম্মত হওয়ার হিকমত	২৫৪
	বিবাহের হিকমতের মধ্যে	২৫৫
	বিবাহের হুকুম	২৫৫
	বিবাহ সংঘটিত হওয়ার শব্দাবলি	২৫৫
	বিবাহের রুকনসমূহ	২৫৬
	বিবাহের শর্তাবলি	২৫৬
	বিবাহে যেসব কাজ সুন্নাত ও যেসব কাজ হারাম	২৫৭
	বিবাহ ও আদর্শ দম্পতি	২৫৮
	বিয়ে সহজ করা হয়েছে ইসলামে	২৫৮
৯ম পরিচ্ছেদ	**ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেআন**	২৬৬
	মাসআলা	২৭২
১০ম পরিচ্ছেদ	**আল্লাহ প্রেমিক বান্দাগণের পরিচয়**	২৭৩-২৮০
	আল্লাহ প্রেমের তাৎপর্য - আল্লাহর ভালোবাসা	২৭৩
	আল্লাহর মুহব্বতের ফযীলতসমূহ	২৭৪
	আল্লাহর প্রতি মুহব্বত সৃষ্টিকারী কিছু বিষয়	২৭৫
	আল্লাহর মুহব্বতের দ্বারা বান্দার লাভ	২৭৬
	আল্লাহর মুহব্বত সংক্রান্ত কিছু জ্ঞাতব্য	২৮০
চতুর্থ অধ্যায়	**বাংলাদেশে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্টকারী বিষয়সমূহ, বাংলাদেশে এর প্রয়োগ**	২৮৫-৩২৫
	পরকিয়া ও ব্যভিচার	২৮৫
	পরকিয়ার সাজা নিয়ে হাইকোর্টের রুল বনাম বাস্তবতা	২৮৭
	বাংলাদেশে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পর্দার গুরুত্ব	২৯০
	পর্দার বিধান	২৯৩
	পর্দা পালনের গুরুত্ব	২৯৪
	পর্দাহীনতার পরিণতি	২৯৫
	গৃহে থাকাকালীন পর্দা	২৯৭
	বাইরে অবস্থানকালীন পর্দা	৩০০
	বয়স্ক অবস্থায় পর্দা	৩০২
	বাংলাদেশের সমকামিতা	৩০৩

	বিবাহ বিচ্ছেদ	৩০৫
	বিবাহ বিচ্ছেদ এবং ৯০ দিন সময়	৩০৬
	আলোচনায় অনীহা	৩০৭
	পেশাদার ম্যারেজ কাউন্সিলর	৩০৭
	সন্ত্রাসবাদ	৩০৮
	লিভ টুগেদার	৩০৯
	বৃদ্ধাশ্রম	৩১২
	পারিবারিক সহিংসতা	৩১৩
	সামাজিক দিক	৩১৫
	ব্যক্তি বনাম পারিবারিক এককের অধিকার	৩১৮
	অভিবাসন নীতি	৩১৯
	অভিবাসী সম্প্রদায়	৩১৯
	বাংলাদেশে মদ	৩২০
	বাংলাদেশে দুর্নীতি	৩২২
	দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলাম যে নির্দেশনা দেয়	৩২৩
	দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করা	৩২৩
	অধীনদের সুষম বেতন-ভাতা প্রদান	৩২৩
	সততার সঙ্গে নিয়োগ প্রদান	৩২৪
	হারাম উপার্জনে নিরুৎসাহ করা	৩২৪
	সুদ ও ঘুষ নিষিদ্ধ করা	৩২৪
	দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নির্দেশ	৩২৫
পঞ্চম অধ্যায়	**সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় এর সমাধান**	৩২৬
	ব্যভিচার	৩২৬
	সূরা আন নূরের আলোকে সমকামিতা	৩২৭
	পারিবারিক সহিংসতা	৩২৯
	সন্ত্রাসবাদ	৩৩২
উপসংহার		৩৪৬
গ্রন্থপুঞ্জি		৩৪৮

ভূমিকা :

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানুষের অবস্থান সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ আকার আকৃতিতে যেমন অনন্য, তেমনি তার বিচার শক্তিও অতুলনীয়। তাই গোটা প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই আল্লাহর খলীফা হিসেবে স্বীকৃত। এটা মানুষের জন্য এক পরম গৌরবের বিষয় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এই গৌরবটা কোনো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার নয় মানুষ আপনা থেকেই এর অধিকারী হয় না। এটি মানুষকে অর্জন করতে হয় এবং নিরন্তর সাধনা বলে একে ধরে রাখতে হয়।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের মানবতাবাদীরা মানুষকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। সমাজের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে অন্যায় অপকর্ম, যিনা-ব্যভিচার মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজের অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে আজ বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে অশান্তির দেশ। আজ মানব জাতি যখন অধঃপতন আর অবক্ষয়ের অন্ধকূপের অতল গহবরে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে, তখন কী করে মুসলিম জাতি চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে? একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আজ মুসলিম উম্মাহকে দায়িত্ব নিতে হবে গোটা মানব জাতিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালনা করার। কারণ মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানোর সময়েই মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনার দায়িত্ব মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির ওপর ন্যাস্ত করেছেন। এ দায়িত্ব পালন কেবল একটি মানবিক দায়িত্ব ও কাজ নয় বরং সৃষ্টিকর্তার ইবাদতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টিকূলের মধ্যে সেরা বানিয়েছেন, বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাকশক্তি, বাকস্বাধীনতা একমাত্র মানূষকেই দিয়েছেন সেহেতু তাদের উচিৎ ছিল একমাত্র তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পরিচালনা করা। কিন্তু মানুষ তা না করে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়েছে এবং তাঁর অবাধ্য হয়েছে, ভুলে গেছে তার অতীত ও ভবিষ্যতের কথা। তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষকে সঠিক পথের সন্ধ্যান দিয়েছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে সেই জীবন ব্যবস্থার দিকে আহবান করাই হচ্ছে ইসলামের মূল কাজ। বর্তমান বিশ্বে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য আধিপাত্যবাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে দ্বীনের মূল অবস্থান থেকে দূরে সরে গেছে। এ কারণেই আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি ও দুঃশাসন বিরাজ করছে। এ পথ থেকে মুক্তির একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর বিধি বিধানকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

আল-কুরআন মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয়। এটা মহান আল্লাহর বাণী। এতে মানব জাতির পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম-বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের শিক্ষার সার সংক্ষেপ এই গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্য সব আসমানী কিতাবের আর কোন কার্যকারিতা নেই। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। কুরআনের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এখন আল-কুরআনই মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শক। আলোচ্য থিসিস বা গবেষণা কর্মটিতে বিস্তারিতভাবে পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধানসহ সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশে এর প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পাব।

প্রথম অধ্যায়

আল-কুরআনের পরিচয়

আভিধানিক পরিচয় :

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পরিপূর্ণ পরিচয় জানার জন্য এর আভিধানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আমরা জানি قران আরবি শব্দ। শব্দটি يقرأ قرء ক্রিয়ার বাবে فتح - يفتح এর ক্রিয়ামূল (مصدر) فعلان) এর ওযনে। قران শব্দটি مقروء 'পঠিত' অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, কিতাব- كتاب অর্থ- مكتوب লিখিত। এর অপর অর্থ হল-সংযোগকরণ। এটা قرن থেকে নির্গত। আর قران অর্থ مقرون বা সংযুক্ত। যেহেতু কুরাআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে সংযুক্ত ও সংযোজিত, এজন্য একে কুরআন বলা হয়। তাছাড়া একটি বর্ণ অপর একটি বর্ণের সংগে মিলিয়ে উচ্চারণ করা হলে তাকে قراءة (কিরায়াত) বলা হয়।

কুরআন শব্দটি قراءة (কিরাআতুন) ধাতু থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ পাঠ করা। আরবি ব্যাকরণের নিয়মে এটা কর্মবাচ্য (Passive Voice) مقروء অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হয়- সেই গ্রন্থ, যা পাঠ করা হয়। অর্থাৎ 'পঠিত গ্রন্থ'।[১]

আল-কুরআন (القران) শব্দের বিশ্লেষণে ইমাম রাগিব ইসফাহানী লিখেন, 'কারউন' (قرء) ধাতু থেকে কুরআন শব্দটির উৎপত্তি। যার অর্থ- একত্র করা, সন্নিবেশ করা, জমা করা। আর এর সম্প্রসারিত অর্থ অধ্যয়ন করা, আবৃত্তি করা ও পাঠ করা।[২]

এ কথার প্রমাণ মেলে আল্লাহর এ বাণীতে-

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ- فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِـعْ قُرْاٰنَهٗ-

"নিশ্চয় এ কুরআন সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, তুমি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করবে।"[৩]

---

১. মুহাম্মাদ আব্দুল আযিম যারকানী, মানাহিলুল ইরফান (কায়রো : দারুল হাদীস, প্রকাশকাল-২০১১), ১ম খন্ড, পৃ. ২৪
২. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, অনু : মাওলানা মাহমুদুল হাসান আরিফ (ঢাকা : মাকতাবাতুত তাকওয়া, তা.বি.)
৩. *আল কুরআন*, ৭৫ : ১৭-১৮

সারকথা :

কুরআন শব্দটি قراءة - يقرأ - قرء থেকে উদ্ভূত হলে এর অর্থ হবে পাঠ করা যা مقروء পঠিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়- সেই পঠিত গ্রন্থ।

আর قرن ধাতু থেকে নির্গত ধরা হলে-এর অর্থ হবে مقرون সংযুক্ত। কুরআনের শব্দ, আয়াত এবং সূরাগুলো পরস্পর সংযুক্ত তাই এ অর্থে কুরআনকে সংযোজিত গ্রন্থ বলা হয়। আর একটি মত হল এটা অনিষ্পন্ন ক্রিয়া, কোনো শব্দ থেকে এটা আসেনি। তাওরাত, যাবূর, ইনজীল কিতাবের মতই এটা সর্বশেষ আসামানী কিতাবের নাম বিশেষ।

পারিভাষিক পরিচয় :

১. আল্লামা নাসাফী (রা.) বলেন,

الكتاب هو القران المنزل على الرسول عليه السلام المكتوب فى المصاحف المنقول عنه نقلا متو اترا بلا شبهة-

"মহাগ্রন্থ আল-কুরআন- যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর ওপর নাযিলকৃত এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর তা রাসূল (স.) থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।"[4]

২. মুফতি আমীমুল ইহসান অত্যন্ত সহজ করে কুরআনের সংজ্ঞা দিয়েছেন-

والقران الكتاب المنزل على سيدنا محمد ﷺ للا عجاز بسورة منه-

"কুরআন মাজীদ এমন আসমানী কিতাব, যা আমাদের নেতা নবী মুহাম্মদ (স.) এর ওপর নাযিল হয়, যার একটি ক্ষুদ্র সূরার মোকাবিলা করতে মানুষ অক্ষম।"

৪. মুহাম্মাদ রশীদ ইবন আলী রিদা, আল মানার, গুগল অনলাইন থেকে উদ্ধৃত।

৩. আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ বলেন,

القران هو كلام الله الذى نزل به روح الامين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله بالفاظه العربية ومعانيها الحقة - المبدو بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس- المنقول الينا بالتواتر وانه محفوظ من الزيادة و النقصان-

"আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি নাযিল করেন। এর ভাষা আরবি। যার অর্থ ও মর্ম সবকিছুই সত্য। যার শুরু সূরা ফাতিহা এবং শেষ সূরা হচ্ছে সূরাতুন নাস, যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে অকাট্য মুতাওয়াতির বর্ণনা সূত্রে। আর তা অবশ্যই যাবতীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন হতে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।"[৫]

৪. হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রা.) কুরআনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, "মহান আল্লাহর সেই অতীব পবিত্র ও সম্মানিত বাণী, যা তাঁর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ওপর নাযিল হয়েছে এবং মাসহাফে লিখিত হয়েছে। আর তা রাসূলুল্লাহ্ (স.) থেকে আমাদের নিকট পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় কোন রূপ সন্দেহ-সংশয় ব্যতীত পৌঁছেছে। আর তা হলো কুরআনের আয়াত ও এর অর্থ উভয়ের সমষ্টিরই নাম।"

সারকথা :

আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার সেই গ্রন্থ যা তিনি অহীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার পথপ্রদর্শক রূপে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওপর নাযিল করেন, যার শব্দ, ভাষা, অর্থ, মর্ম, ভাব সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার।

---

৫. আব্দুল ওয়াহাব খাল্লাফ, *ইলমে উসূলুল ফিকহ* অনু : আবু তারিক হিলাল, গুগল অনলাইন থেকে উদ্ধৃত।

আল-কুরআনের নামসমূহ :

আল-কুরআনের প্রসিদ্ধ দু’টো নাম হচ্ছে আল-কুরআন ও আল-ফুরকান। এ ছাড়াও কুরআনের গুণবাচক অনেক নামের উল্লেখ দেখা যায়। কুরআনেও বিভিন্ন স্থানে একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লামা আবুল মা’আলী “আল বুরহান” গ্রন্থে আল-কুরআনের ৫৫টি নাম উল্লেখ করেন। ‘ফাত্হুর রাহমান’ নামক কিতাবে কুরআনের ৯০টি নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইবনে জারীর আত-তাবারী পবিত্র কুরআনের প্রসিদ্ধ নাম চারটি বলে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আর তা হল-

ক. আল-কুরআন,

খ. আল-ফুরকান,

গ. আল-কিতাব,

ঘ. আয-যিকর।

কুরআন মাজীদে ‘আল-কুরআন’ নামটি ৬১টি বার উল্লেখ আছে।

কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ :

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকালানী (রা.) বলেন, “আরববাসীগণ সাধারণত নিজেদের সাহিত্য কর্মের যেভাবে নামকরণ করেন আল্লাহ তা’আলা তাঁর কিতাবের নাম সে রূপ করেননি। আরবগণ তাদের সাহিত্য কর্মের সংকলন বা সমষ্টিকে বলে থাকেন দীওয়ান। আরবগণ তাদের ‘দীওয়ানের’ অংশ বিশেষকে বলেন, কাসীদা (قصيدة) কিন্তু আল-কুরআনের অংশ বিশেষের নামকরণ করা হয় -‘সূরা (سورة) হিসেবে। আরবরা ছোট বাক্যকে ‘বায়াত’ (بيت) বলে কিন্তু কুরআনের বাক্যকে বলা হয় আয়াত (اية)। কি তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের কারণে আল্লাহর এ কিতাবকে আল-কুরআন নামকরণ করা হয়েছে এ বিষয়ে পন্ডিতগণের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রসিদ্ধ কয়েকটি ব্যাখ্যা হল-

১. আল্লামা তাকী উসমানী লিখেন, কুরআন নাযিলের সময় আরবের অবিশ্বাসীরা কুরআনের পবিত্র বাণী শুনতে চাইত না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তারা নানারূপ হট্টগোল ও শোরগোল করত- যাতে কুরআনের মোহনীয় বাণী তাদের কানে না পৌঁছে এবং বুঝতে না পারে। কাফিরদের এ হীন আচরণ ও আপত্তিকর ব্যবহারের জবাবে 'আল-কুরআন' (পঠিত গ্রন্থ) নাম রেখে বুঝানো হচ্ছে- তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা কুরআনের সুমহান বাণীকে ঠেকাতে চাও না কেন, কিন্তু কিছুতেই তা পারবে না। পবিত্র এ কিতাব 'পঠিত' হওয়ার জন্যই নাযিল করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। সুতরাং দেখা যায়, আজ পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে একমাত্র কুরআনই সর্বাধিক পঠিত ও পঠিতব্য গ্রন্থ।[৬]

২. মাজদুদ্দীন ফিরূযাবাদী পবিত্র কুরআনের নামকরণের চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন-

(ক) এ গ্রন্থ বহু আয়াত ও সূরার সমষ্টি।

(খ) পূর্ববর্তী নবীগণের ওপর নাযিলকৃত কিতাব ও সহীফাসমূহে যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণিত হয়েছিল, এ গ্রন্থে তার সারসংক্ষেপ সন্নিবেশিত হয়েছে।

(গ) এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী উম্মতগণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা ও ঘটনা আদেশ-নিষেধ, অঙ্গীকার এবং সতর্কীকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় যথোচিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(ঘ) এ গ্রন্থ ভাষা বিশ্লেষণের একটি শ্রেষ্ঠ সংকলন, তাই একে কুরআন নামকরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফিরূযাবাদীর মতে কুরআন শব্দটি قرن (সংযুক্ত ও সন্নিবেশিত) থেকে গৃহীত।

৩. আবুল হাসান আশআরী (রা.) সহ বেশ কয়েকজন মনীষী বলেন, "আল-কুরআনের মধ্যে বিভিন্ন হরফ, আয়াত ও সূরাকে মিলিয়ে পাঠ করা হয়, তাই একে কুরআন নামে অভিহিত করা হয়। এদের মতে কুরআন শব্দ قرن (মিলিয়ে দেয়া) ধাতু হতে এসেছে।"

৪. বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফারবার মতে, "যেহেতু কুরআনের আয়াতসমূহ একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণকারী ও সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই একে কুরআন নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর মতে কুরআন- قرائن (পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিস) শব্দ থেকে এসেছে।"

---

৬. *উলূমুল কুরআন*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৪

৫. আল্লামা ইবনে কাসীর, ইমাম শাফিঈ (রা.) ও অন্যান্যদের মতে, 'আল-কুরআন' এ নামটি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওপর নাযিল হওয়া সর্বশেষ আসমানী কিতাবের জন্যই একমাত্র নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট নাম, যা অন্য কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

৬. ইমাম রাগিব ইস্ফাহানী 'কুরআন' শব্দের এ নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন, "আসমানী গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কিতাবকেই কুরআন বলা হয়েছে এ জন্য যে, আসলে এ কিতাবেই অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। সে সব গ্রন্থের শিক্ষা ও সার-নির্যাস এ পবিত্র গ্রন্থে রয়েছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইলম-বিদ্যারও সমাবেশ ঘটেছে এ কিতাবে।"[৭]

পবিত্র কুরআনে একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়-

وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ-

"এ কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত গ্রন্থে যা কিছু আছে তার সত্যায়ন করে এবং সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ দেয়।"[৮]

আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ-

"আমি এ কিতাবকে তোমার প্রতি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যারূপে নাযিল করেছি।"[৯]

তাফসীরকারগণ আরও উল্লেখ করেন যে, একে আল-কুরআন নামে এজন্য অভিহিত করা হয়েছে যে, তা পাঠ করা হয় এবং বহু আয়াত ও সূরার সংকলন। তা ছাড়া এতে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিভিন্ন ইতিবৃত্ত ও ঘটনা অনবদ্য রীতিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

---

৭. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরাহ ইবনে আহনাফ বারদিযবাহ আল জুফী আল বুখারী, *আল আদাবুল মুফরাদ*, অনু : মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ২০১৪), পৃ. ৪০২

৮. *আল কুরআন*, ১২ : ১১১

৯. *আল কুরআন*, ১৬ : ৮৯

আল-কুরআনের অন্যান্য নাম :

আল-কুরআনের অন্যান্য প্রসিদ্ধ কয়েকটি নামের অর্থ ও তাৎপর্যসহ একটি একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল-

আল-ফুরকান- الفرقان (পার্থক্যকারী) :

আল্লামা যারকানী (র) বলেন, ফুরকান শব্দের অর্থ হচ্ছে- 'পার্থক্য ও প্রভেদকারী'। হক ও বাতিলের মধ্যে কুফর-শিরক এবং তাওহীদের মধ্যে তথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনাকারী হচ্ছে এ কুরআন। তাছাড়া সত্য মিথ্যার সীমারেখা ও মানদন্ড হচ্ছে এ কুরআন। এ কারণে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا-

"কতই না মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।"[১০]

আল-কিতাব- الكتاب (মহাগ্রন্থ) :

কিতাব অর্থ সন্নিবেশিত। কুরআনে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এটা একটি সুলিখিত গ্রন্থ। তাই একে আল-কিতাব বা মহাগ্রন্থ বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

ذٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَ يْبَ فِيهِ-

"এটা ঐ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।"[১১]

আয-যিকর- الذكر (স্মারক ও উপদেশ) :

যিকর অর্থ স্মারক। এ গ্রন্থে বিভিন্ন আদেশ-উপদেশ এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা উল্লেখ আছে, তাছাড়া মানুষকে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই কুরআন হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনামা।

---

১০. *আল কুরআন*, ২৫ : ১
১১. *আল কুরআন*, ২ : ২

আল্লাহ মহান বলেন,

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ-

“নিশ্চয় কুরআন তোমার ও তোমার জাতির জন্য সদুপদেশ।”[১২]

মহান আল্লাহ বলেন,

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ-

“এটা কল্যাণময় উপদেশ ও স্মারক, আমি যা নাযিল করেছি।”[১৩]

আত্-তানযীল- التنزيل (অবতরণকৃত) :

এ গ্রন্থ মহান আল্লাহর তরফ থেকে পথভোলা মানবজাতির জন্য সত্য পথের দিশারীরূপে নাযিল হয়েছে। তাই একে ‘তানযীল’ বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

“নিশ্চয় আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া।”[১৪]

আল-কালাম الكلام (বাণী) :

কালাম শব্দের অর্থ প্রভাবিত করা ও আকৃষ্ট করা তথা বাণী। কুরআন-শ্রবণকারীর হৃদয়-মনকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করে বলে একে ‘আল-কালাম’ বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللهِ-

“যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়।”[১৫]

আল-হুদা- الهدى (দিশা) :

এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এটা সত্য পথের দিশারী ও প্রমাণ।

---

১২. *আল কুরআন*, ৪৩ : ৪৪
১৩. *আল কুরআন*, ২১ : ৫০
১৪. *আল কুরআন*, ৪২ : ১৯২
১৫. *আল কুরআন*, ৯ : ৬

যেমন আল্লাহর বাণী-

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ-

“এটা বিশ্ব মানবতার জন্য দিশারী। সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দশন এবং সত্য মিথ্যার মানদন্ড।”[১৬]

আন-নূর- النور (জ্যোতি-আলোকবর্তিকা) :

এ জন্য বলা হয় যে, কুরআনের মাধ্যমে হালাল-হারামের রহস্য উদ্ভাসিত হয়, তাই একে ‘নূর’ বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا

“আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি নাযিল করেছি।”[১৭]

আশ্-শিফা- الشفاء) প্রতিষেধক) :

এ জন্য এ নাম রাখা হয়েছে যে, মানবাত্মার বিভিন্ন রোগ যেমন- কুফর-শিরক, নিফাক, মূর্খতা এমনকি দৈহিক

অলসতার রোগও এর দ্বারা সারানো যায়। তাই কুরআনকে ‘শিফা’ বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَۙ

“আমি নাযিল করি কুরআন, যা মু’মিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ।”[১৮]

আল-মাসানী- المثانى (পুনরাবৃত্তি) :

এ নামকরণের এক কারণ হচ্ছে- প্রাচীন মানবজাতির কাহিনী পুনরায় এতে বর্ণিত হয়েছে। অপর এক কারণ হচ্ছে- এ গ্রন্থে ঘটনা এবং উপদেশকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এ নামের কারণ হচ্ছে কুরআন দু’বার নাযিল হয়েছে। একবার অর্থসহ, দ্বিতীয়বার অর্থ ও শব্দসহ।

---

১৬. *আল কুরআন*, ২ : ১৮৫
১৭. *আল কুরআন*, ৪ : ১৭৪
১৮. *আল কুরআন*, ১৭ : ৮২

যেমন- আল্লাহর বাণী-

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

এ তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে।”[১৯]

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

“আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত, যা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন।”[২০]

আস-সিরাতুল মুস্তাকীম الصراط المستقيم (সরল পথ) :

কুরআনের অনুসরণ করলে সহজ ও সরলপথ পাওয়া যায় এবং জান্নাত লাভ করা যায়। এ কারণে একে জান্নাতের সরল পথ বলা হয়েছে। কুরআনে এসেছে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

“আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর।”[২১]

আল-হিকমা- الحكمة (বিজ্ঞানময়তা) :

আল-কুরআনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। অথবা তা পুরোটাই হিকমতে পূর্ণ। তাই একে ‘হিকমাহ’ বলা হয়।

আল-হাকীম الحكيم (বিজ্ঞানময় গ্রন্থ) :

এ নাম এ জন্যে যে, এর আয়াতসমূহ অত্যধিক সৌন্দর্যমন্ডিত, বিন্যস্ত এবং রহস্যপূর্ণ মর্ম উদ্‌ঘাটনকারী। এটা সর্বপ্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন-বিয়োজন হতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।

মহান আল্লাহ বলেন,

يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ

“ইয়া-সীন, শপথ জ্ঞানগর্ভ বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল-কুরআনের।”[২২]

---

১৯. *আল কুরআন*, ৮৭ : ১৮
২০. *আল কুরআন*, ১৫ : ৮৭
২১. *আল কুরআন*, ১ : ৫

আল-হাবলু- الحبل (রশি-রজ্জু) :

যে ব্যক্তি কুরআনকে শক্ত-মজবুত করে আঁকড়ে ধরবে সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে এবং সত্য পথের সন্ধান পাবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[২৩]

অন্যত্র একে حبل اللهِ المتين "আল্লাহর মজবুত রশি বলা হয়েছে।"

আর-রাহমা- الرحمة (করুণা) :

পবিত্র কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর রহমত ও করুণা। তাই একে রহমাত বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

"নিশ্চয় এটা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"[২৪]

সারকথা :

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে এবং বিভিন্ন গুণ বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। এ গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। লোকেরা সে সব গুণ বৈশিষ্ট্যকে এর এক এক নাম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে কুরআনের মূল নাম আল-কুরআন এবং অপর নাম আল-ফুরকান। এ দু'টো নামই অধিক প্রসিদ্ধ। অন্যান্য নাম হচ্ছে গুণবাচক।

---

২২. *আল কুরআন*, ৩৬ : ১-২
২৩. *আল কুরআন*, ৩ : ১০৩
২৪. *আল কুরআন*, ২৭ : ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূরা আন নূরের পরিচয়

সূরার শাব্দিক পরিচয় :

সূরা (سورة) শব্দটি একবচন। বহুবচনে (سور) সুওয়ারুন। শাব্দিক অর্থ হলো- দীর্ঘ ও সৌন্দর্যমন্ডিত, উচ্চতম অবস্থানস্থল ও মর্যাদা।

সূরার পারিভাষিক পরিচয় :

সূরার সংজ্ঞা সম্বন্ধে 'তানবীর'-এর গ্রন্থকার বলেন,

السورة الطائفة من القران المسماة باسم خاص توقيفا واقلها ثلث ايات-

"সূরা হলো আল-কুরআনের একটি অংশ বিশেষ, যাকে আল্লাহর নির্দেশে নির্দিষ্ট নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো তিন আয়াত।" যেমন- সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান ও সূরা কাওসার ইত্যাদি। আল-কুরআনের সূরা সংখ্যা ১১৪টি।

অন্যভাবে বলা যায়-

ইসলামী পরিভাষায় সূরা হচ্ছে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কুরআনের এক একটি অধ্যায়ের নাম। তবে এটি সাধারণ পুস্তকের অধ্যায়ের মত নয় বরং বিশেষভাবে কেবল কুরআনের বৈশিষ্ট্যের জন্যই এর উৎপত্তি। তাই এটি প্রকৃত অর্থেই একটি কুরআনিক পরিভাষা যাকে কেবল কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়।

আর নূর (نور) শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে আনওয়ারুন (انوار)। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে আলো বা আলোকবর্তিকা। এখানে শুভ্র সমুজ্জল আলোকবর্তিকা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। যার সম্পর্ক রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর নিজ অস্তিত্বের সাথে। এ সূরারই এক আয়াতে যেমন রয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালাই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর নূর। সূরা আন নূর মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআনের ২৪তম সূরা। সূরার নামের বাংলা অর্থ আলো। এটি মাদানী সূরা। এ সূরায় হযরত আয়েশা (রা.) এর ওপর দেয়া অপবাদ খন্ডন করা হয়েছে।

নামকরণ :

পঞ্চম রুকুর প্রথম আয়াত তথা ৩৫ তম আয়াত থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে।[২৫] উক্ত আয়াতে আল্লাহ নিজের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে নূর শব্দ ব্যবহার করেছেন।

শানেনুযুল :

এ সূরাটি যে বনু মুসতালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত।[২৬] কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশার (রা.) বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসংগে এটি নাযিল হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ (ইফকের ঘটনা) খন্ডন করে দেওয়া হয় এ সূরা নাজিলের মাধ্যমে।

বিষয়বস্তু :

এ সূরায় ব্যভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়। কারো বিরুদ্ধে অহেতুক ব্যভিচারের অপবাদ দেবারশাস্তি ঘোষিত হয়। ১১ নং আয়াতে হযরত আয়েশা (রা.) এর বিরুদ্ধে আনা অপবাদের জবাব দেওয়া হয়। ২৭ নং আয়াতে অনুমতি ছাড়া অপরের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করে আইন করা হয়। ৩০ ও ৩১ নং আয়াতে যথাক্রমে পুরুষ ও নারীদের জন্যে পর্দার বিধান দিয়ে দৃষ্টি নিচু করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৩১ আয়াতে গাইরে মাহরামদের (যাদের সাথে বিয়ে জায়েয কিন্তু দেখা দেওয়া হারাম) তালিকা দেওয়া হয়। ৩৫ আয়াতে আল্লাহ একটি উপমার দ্বারা নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে সৃষ্টিজগতের প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কিছু নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করে পরকালের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

---

২৫. আল কুরআন, ২৪ : ৩৫
২৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন*, অনুবাদক : ওয়ারেসুল হক (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ২০১২),খন্ড- ৯ম, পৃষ্ঠা-৭৩

সূরা আন নূরের অনুবাদ ও তাফসীর :

১.

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَ فَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَاۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

অর্থ :

এটা একটা সূরা যা আমি নাযিল করেছি এবং দায়িত্বে অপরিহার্য করেছি। এতে আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[২৭]

২.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ- وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ- وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ :

ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থঠশ। মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

তাফসীর :

১. 'একশত চাবুক' এটা ব্যভিচারের শাস্তি। কুরআন মাজীদ ব্যভিচারকারী নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য এ শাস্তি নির্ধারণ করেছে। পরিভাষায় এ শাস্তিকে ব্যভিচারের 'হদ্দ' বলে। মহানবী (স.) তার বিভিন্ন বাণী ও বাস্তব কর্ম দ্বারা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, ব্যভিচার কোন অবিবাহিত পুরুষ বা অবিবাহিতা নারী করলে তখনই এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে এ অপরাধ যদি কোন বিবাহিত পুরুষ বা বিবাহিতা নারী করে, তবে সেক্ষেত্রে এ শাস্তি প্রযোজ্য নয়। তাদের শাস্তি হল "রজম' করা অর্থাৎ, পাথর মেরে হত্যা করা।

---

২৭. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.), *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনু : মাওলানা মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন খান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০১২), সূরা আন নূরের সম্পূর্ণ অনুবাদ ও তাফসীর এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

৩.

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةًؗ- وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌؗ- وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ :

ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীকে বা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী-তাকে ব্যভিচারী বা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না, মু'মিনদের জন্যে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

তাফসীর :

২. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করতে অভ্যস্ত এবং এ কারণে সে মোটেই লজ্জিত নয় আর না তাওবা করার কোন গুরুত্ব বোধ করে, তার অভিরুচি হয় কেবল ব্যভিচারিণী নারীতেই। কাজেই প্রথমত সে বিবাহ নয়, বরং ব্যভিচারেরই ধান্ধায় থাকে। অগত্যা যদি বিবাহ করতেই হয়, তবে এমন কোন নারীকেই খুঁজে নেয়, যে তার মতই একজন ব্যভিচারিণী, হোক না সে মুশরিক। এমনিভাবে যে নারী ব্যভিচারে অভ্যস্ত, তারও অভিরুচি হয় কেবল ব্যভিচারী পুরুষে। তাই তাকে বিবাহও করে এমন কোন ব্যক্তি যার নিজেরও ব্যভিচারের অভ্যাস আছে। তার স্ত্রী একজন দাসী ব্যভিচারিণী- এ কারণে সে কোন গ্লানি বোধ করে না। সে নারী নিজেও ওই রকম পুরুষই পসন্দ করে, হোক না সে পুরুষটি মুশরিক।

৩. অর্থাৎ, বিবাহের জন্য ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে পসন্দ করা মুমিনদের জন্য হারাম। জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের উচিত চারিত্রিক পবিত্রতাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা। এটা ভিন্ন কথা যে, কেউ কোন ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে বিবাহ করে ফেললে তার সে বিবাহকে বাতিল করা হবে না এবং বিবাহজনিত সমস্ত বিধান ও দায়-দায়িত্ব সেক্ষেত্রে কার্যকর হবে। কিন্তু সে কেন ভুল নির্বাচন করল, সেজন্য অবশ্যই গোনাহগার হবে। প্রকাশ থাকে যে, এ বিধান কেবল সে ব্যভিচারীর জন্য, যে ব্যভিচারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং তা থেকে তাওবার গরজ বোধ করে না। কেউ যদি ব্যভিচারের পর আন্তরিকভাবে তাওবা করে ফেলে, তার সঙ্গে বিবাহে কোন দোষ নেই। আয়াতটির ওপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে এ ব্যাখ্যাই বেশি সহজ ও নিখুঁত। বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)ও এ ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

৪.

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ- وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ-

অর্থ :

যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী।

তাফসীর :

৪. ব্যভিচার যেমন চরম ঘৃণ্য অপরাধ, যে কারণে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অতি কঠিন, তেমনি কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়াও অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। তাই তার জন্যও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি এরূপ অপরাধ করবে তাকে আশিটি দোররা মারা হবে। পরিভাষায় একে হদ্দে কযফ' বলে। এটাও মিথ্যা অপবাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তির একটা অংশ যে, কোন মামলা-মোকদ্দমায় অপবাদদাতার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না।

৫-৬.

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْاۚ-فَاِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللهِۙ- اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ-

অর্থ :

তবে যদি এটার পর এরা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহতো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী।

তাফসীর :

৫-৬. তাওবা দ্বারা মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে ঠিক, কিন্তু ওপরে যে শাস্তি বর্ণিত হয়েছে তা অবশ্যই কার্যকর করা হবে। কোন স্বামী নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে ওপরে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী তাকেও চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু সে যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তবে নিয়ম অনুযায়ী যদিও আশি দোররার শাস্তি তার ওপরও আরোপ হওয়ার কথা, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। পরিভাষায় তাকে 'লিআন' বলে। এখান থেকে ৯নং আয়াত পর্যন্ত সে বিশেষ ব্যবস্থারই বিবরণ। তার সারমর্ম এ যে, কাযী (বিচারক) স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককে পাঁচবার করে কসম করতে বলবে। তাদেরকে কসম করতে হবে কুরআন মাজীদে বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং সে শব্দাবলীতে। তার আগে কাযী তাদেরকে নসীহত করবে।

তাদেরকে বলবে, দেখ, আখেরাতের আযাব দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা অনেক কঠিন। কাজেই তোমরা মিথ্যা কসম করো না। তার চেয়ে বরং প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করে ফেল। স্ত্রী কসম না করে নিজ অপরাধ স্বীকার করলে তার ওপর ব্যভিচারের হদ্দ' আরোপ করা হবে। আর যদি স্বামী কসম করার পরিবর্তে স্বীকার করে নেয় যে, সে স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, তবে তার ওপর হদ্দে কযফ' আরোপিত হবে, যা ৪নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

যদি উভয়েই কসম করে, তবে দুনিয়ায় তাদের কারও ওপর কোন শাস্তি জারি করা হবে না। অবশ্য কাযী তাদের মধ্যকার বিবাহ রহিত করে দেবে। অতঃপর সে নারীর কোন সন্তান জন্ম নিলে এবং স্বামী তাকে নিজ সন্তান বলে স্বীকার না করলে তাকে মায়ের সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে (অর্থাৎ তার পিতৃ পরিচয় থাকবে না, মায়ের পরিচয়ে সে পরিচিত হবে)।

৭-৮.

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ- وَيَدْرَؤُاعَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ- اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ-

অর্থ :

এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী।

৯-১০

وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ-

অর্থ :

এবং পঞ্চমবারে বলে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গযব। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না; এবং আল্লাহ্‌ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর :

৭. অর্থাৎ, লিআনের যে ব্যবস্থা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। অন্যথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সাধারণ নিয়ম কার্যকর হলে মহা মুশকিল দেখা দিত। কেননা সেক্ষেত্রে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যের সাথে পাপকার্যে লিপ্ত দেখলেও যতক্ষণ পর্যন্ত চারজন সাক্ষী না পেত ততক্ষণ মুখ খুলত না। মুখ খুললে তার নিজেকেই আশি দোররা খেতে হত। লিআনের ব্যবস্থা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন।

১১.

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ- لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ- بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ- لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ- وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

অর্থ :

যারা এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে কর না; বরং এটা তো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর; এদের প্রত্যেকের জন্যে আছে এদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং এদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আছে মহাশাস্তি।

তাফসীর :

৮. এখান থেকে ২৬ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে যে ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ, মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী (স.) এর শুভাগমনের পর ইসলামের ক্রমবিস্তারে যে গতি সঞ্চার হয়, তা দেখে কুফরী শক্তি ক্ষোভে-আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করছিল। কাফেরদের মধ্যে একদল ছিল মুনাফেক, যারা মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল মহানবী মহানবী (স.) এর প্রতি বিদ্বেষে ভরা। তাদের সার্বক্ষণিক চেষ্টা ছিল কীভাবে মুসলিমদের বদনাম করা যায় এবং কি উপায়ে তাদেরকে উত্যক্ত করা যায়। খোদ মদীনা মুনাওয়ারার ভেতরই তাদের একটি বড়সড় দল বাস করত।

মহানবী মহানবী (স.) যখন বনুল মুস্তালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালান তখন তাদের একটি দলও সে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ যুদ্ধে মহানবী মহানবী (স.) এর সঙ্গে ছিলেন। অভিযান থেকে ফেরার পথে এক জায়গায় শিবির ফেলা হয়েছিল। সেখানে হযরত আয়েশা (রা.) এর হার হারিয়ে যায়। তিনি তার খোঁজে শিবিরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। বিষয়টি মহানবী মহানবী (স.) এর জানা ছিল না। তিনি সৈন্যদেরকে রওয়ানা হওয়ার হুকুম দিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে দেখেন কাফেলা চলে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ সংযম শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি না করে সেখানেই বসে থাকলেন। তার বিশ্বাস ছিল মহানবী (স.) যখন টের পাবেন তিনি কাফেলায় নেই, তখন হয় নিজেই তার খোঁজে এখানে আসবেন অথবা অন্য কাউকে পাঠাবেন। তাছাড়া মহানবী মহানবী (স.) এর নিয়ম ছিল এক ব্যক্তিকে কাফেলার পিছনে রেখে আসা। কাফেলা চলে যাওয়ার পর কোন কিছু থেকে গেল কি না তা সে ব্যক্তি দেখে আসত। এ কাফেলায় এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিলো হযরত সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল (রা.) কে। তিনি খোজ নিতে গিয়ে যখন হযরত আয়েশা (রা.) যেখানে ছিলেন, সেখানে পৌঁছলেন তখন কী দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তা বুঝে ফেললেন। কালবিলম্ব না করে নিজের উটটি হযরত উম্মুল মুমিনীনের সামনে পেশ করলেন। তাতে সওয়ার হয়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছোলেন।

মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই যখন এ ঘটনা জানতে পারল সে তিলকে তাল করে প্রচার করতে লাগল এবং প্রাণের চেয়েও প্রিয় এ মায়ের প্রতি এমন ন্যাক্কারজনক অপবাদ দিল, যা কোন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মুসলিমের পক্ষে উচ্চারণ করাও কঠিন। আবদুল্লাহ ইবন উবাই এ অপবাদকে এতটাই প্রসিদ্ধ করে তুলল যে, জনা কয়েক সরলমতি মুসলিমও তার প্রচারণার ফাঁদে পড়ে গেল। মুনাফিক শুনে বেশ কিছুদিন এই মাথামুন্ডহীন বিষয় নিয়ে মেতে রইল এবং মদীনা মুনাওয়ারার শান্তিময় পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলল।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা সূরা নুরের এ আয়াতসমূহ নাযিল করলেন। এর দ্বারা এক দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর চারিত্রিক নির্মলতার পক্ষে ঐশী সনদ দিয়ে দেওয়া হল, অন্যদিকে যারা চক্রান্তটির রুই-কাতলা ছিল তাদেরকে জানানো হল কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারী বার্তা।

৯. অর্থাৎ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এ ঘটনাটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল, কিন্তু পরিণাম বিচারে এটি তোমাদের পক্ষে বড়ই কল্যাণকর। একতো এ কারণে যে, যারা নবী-পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, এ ঘটনা দ্বারা তাদের মুখোশ খুলে গেল। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা মানুষের কাছে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তৃতীয়ত এ ঘটনায় মুমিনগণ যে কষ্ট পেয়েছিল, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রভূত সওয়াবের অধিকারী হল।

১০. এর দ্বারা আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে বোঝানো হয়েছে। সে ছিল মুনাফেকদের সর্দার এবং এ ষড়যন্ত্রে সে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

১২.

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًاۙ- وَّ قَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ-

অর্থ :

যখন তারা এটা শুনল তখন মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করল না এবং বলল না, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ!'

তাফসীর :

১১. এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দীন ও ঈমানের ভিত্তিতে সকল মুমিন নর - নারী একান্তই আপনজন। কাজেই কোন মুমিন - নারী সম্পর্কে কোন মন্দ প্রচারণা শুনলে আপনজন হিসেবে তাতে কর্ণপাত না করে তার প্রতি সুধারণা রাখা চাই এবং মিথ্যা অপবাদ ' বলে তার নিন্দা জানানো চাই। যে সকল মুমিন এ নীতি অবলম্বন করেনি, আয়াতে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। তবে অনেকেই এমন ছিলেন, যারা প্রথমেই এ প্রচারণাকে মিথ্যা বলে উরিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন হযরত আবু। আইয়ুব আনসারীকে (রা.) তার স্ত্রী যখন বললেন, লোকে আয়েশা সিদ্দীকা সম্পর্কে কি বলছে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যা শুনেছি, কিন্তু তা সম্পূর্ণ মিথ্যা! হে আইয়ুবের মা! তুমি কি কখনও এরূপ কাজ করবে? স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! কক্ষণও নয়। তিনি বললেন, তা হলে আয়েশা তো আল্লাহর কসম তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! (তার দ্বারা এটা কি করে সম্ভব?)।

১৩-১৫.

لَوْلَاجَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ- فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّ هُوَعِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ-

অর্থ :

তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্যে মহাশাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা এটাকে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

তাফসীর :

১২. নিষ্ঠাবান ও খাঁটি মুমিনদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস ছিল এ ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গুরুতর অপবাদ। তা সত্ত্বেও মুনাফেকদের সোৎসাহ প্রচারণার ফলে মুমিনদের মজলিসেও এ নিয়ে কথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াত সাবধান করছে যে, এরূপ ভিত্তিহীন বিষয়ে মুখ খোলাও কারও জন্য জায়েয নয়।

১৬-১৮.

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ- يَعِظُكُمُ اللهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ- يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِۜ- وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

অর্থ :

এবং তোমরা যখন এটা শুনলে তখন কেন বললে না, ‘এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!’ আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, ‘তোমরা যদি মু’মিন হও তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি কর না।’ আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৯-২০.

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۙ- فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِۜ- وَاللهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ- وَلَوْ لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ :

যারা মু’মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মান্তিক শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো এবং আল্লাহ্ দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত।

২১.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ- وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ
وَالْمُنْكَرِ ؕ- وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ- وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ-
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

অর্থ :

হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -
وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ- اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ-وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ :

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা হিযরত করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না; তারা যেন এদেরকে ক্ষমা করে এবং এদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর :

১৩. যে দু'-তিনজন সরলপ্রাণ মুসলিম মুনাফেকদের অপপ্রচারের শিকার হয়েছিল, তাদের একজন মিসতাহ ইবন আছাছা (রা.)। ইনি একজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। তিনি গরীব ছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। তিনি যখন জানতে পারলেন মিসতাহ (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সম্পর্কে অনুচিত কথাবার্তা বলছে, তখন শপথ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কখনও তাকে আর্থিক সাহায্য করব না। হযরত মিসতাহ (রা.) এর ভুল অবশ্যই হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে ভুলের উপরই গোঁ ধরে বসে থাকেননি; বরং সেজন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন ও খাটিমনে তাওবা করেছিলেন। তাই আল্লাহ

তা'আলা সতর্ক করে দেন যে, তাকে আর্থিক সহযোগিতা না করার শপথ করা উচিত নয়। যখন তিনি তাওবা করে ফেলেছেন, তাকে ক্ষমা করা উচিত। বিশেষত এ কারণেও যে, তোমাদেরও তো কত ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তা'আলা সেগুলো ক্ষমা করে দিন? তা চাইলে তোমরা অন্যের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হও। তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমরাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। এ আয়াত নাযিল হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর চিৎকার করে বলে ওঠেন, অবশ্যই হে আমাদের রব! আমরা চাই তুমি আমাদের ক্ষমা কর। অনন্তর তিনি পুনরায় তার অর্থ সাহায্য জারি করে দেন এবং কসমের কাফফারা আদায় করেন। সে সাথে ঘোষণা করে দেন, আর কখনও এ সাহায্য বন্ধ করব না।

২৩-২৫.

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ-وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللهَ هُوَالْحَقُّ الْمُبِيْنُ-

অর্থ :

যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে আছে মহাশাস্তি। যেই দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্‌বা, তাদের হস্ত ও তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে- সে দিন আল্লাহ্‌ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানিবে, আল্লাহ্‌ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।

২৬.

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ- وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ- اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ- لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ-

অর্থ :

দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্যে; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্যে; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্যে। লোকে যা বলে এরা তা হতে পবিত্র; এদের জন্যে আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

তাফসীর :

১৪. মূলনীতি বলে দেওয়া হল যে, পবিত্র ও চরিত্রবতী নারী পবিত্র ও চরিত্রবান পুরুষেরই উপযুক্ত। এর ভেতর দিয়ে এই ইশারাও করে দেওয়া হল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পবিত্রতা ও আখলাক-চরিত্রের সর্বোচ্চ মার্গে অবস্থিত। কেননা বিশ্বজগতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশি পূত চরিত্রের অধিকারী আর কে হতে পারে? কাজেই এটা কখনও সম্ভবই নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর স্ত্রী হিসেবে এমন কাউকে মনোনীত করবেন যার চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ নয় (নাউযুবিল্লাহ)। কেউ যদি এতটুকু বিষয় চিন্তা করত তবে তার কাছে মুনাফিকদের দেওয়া অপবাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যেত।

২৭.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَاؕ- ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

অর্থ :

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

তাফসীর :

১৫. মৌলিকভাবে যেসব কারণে সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে সেগুলো বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে এবার কিছু বিধান দেওয়া হচ্ছে। তার মধ্যে প্রথম বিধান দেওয়া হয়েছে এই যে, অন্য কারও ঘরে প্রবেশের আগে গৃহকর্তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এর উপকারিতা বহুবিধ। যেমন, এর ফলে অন্যের ঘরে অনাবশ্যক প্রবেশ বা অসময় প্রবেশ বন্ধ হয়ে যাবে। এরূপ প্রবেশের ফলে গৃহবাসীদের কষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া বিনা অনুমতিতে প্রবেশের ফলে অন্যায়-অশ্লীল কাজ সংঘটিত হওয়া বা তার বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা থাকে। অনুমতি গ্রহণ দ্বারা তারও রোধ হবে। অনুমতি কীভাবে গ্রহণ করতে হবে আয়াতে তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নিয়ম হল, বাহির থেকে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলতে হবে। যদি মনে হয় গৃহবাসী সালাম শুনবে না, তবে করাঘাত করবে বা বেল টিপবে। তারপর গৃহবাসী যখন সামনে আসবে তখন সালাম দেবে।

২৮.

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ- وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ- وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ-

অর্থ :

যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তা হলে এতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর :

১৬. অর্থাৎ, অন্যের কোন ঘর যদি খালি মনে হয়, তবুও তাতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা জায়েয নয়। কেননা এমনও তো হতে পারে ভিতরে কোন লোক আছে, যাকে বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে না। আর যদি কেউ নাও থাকে, তবুও ঘরটি যেহেতু অন্যের তাই তার অনুমতি ছাড়া তাতে প্রবেশ করার অধিকার কারও থাকতে পারে না।

২৯-৩০

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ-وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ- ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ- اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ-

অর্থ :

যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্যে দ্রব্যসামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্যে উত্তম। এরা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

তাফসীর :

১৭. এর দ্বারা এমন পাবলিক নিবাস বোঝানো হয়েছে, যা ব্যক্তি বিশেষের মালিকানাধীন নয়; বরং সাধারণভাবে তা যে-কারও ব্যবহার করার অনুমতি আছে, যেমন গণ-মুসাফিরখানা, হোটেলের বহিরাংশ, হাসপাতাল, ডাকঘর, পার্ক, মাদরাসা ইত্যাদি। অনুমতি গ্রহণ-সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধি-বিধানের জন্য 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীর হচ্ছে-

৩১.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ- وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْاٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْاَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ- وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ- وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

অর্থ :

আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

তাফসীর :

১৮. এখানে ভূষণ দ্বারা শরীরের সে অংশ বোঝানো হয়েছে, যাতে অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করা হয়। এভাবে এ আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে, তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের সামনে নিজেদের গোটা শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা ঢেকে রাখে, যাতে তারা তার সাজসজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়। তবে শরীরের এ রকম অংশ যদি কাজকর্ম করার সময় আপনিই খুলে যায় বা বিশেষ প্রয়োজনবশত খোলার দরকার পড়ে, তাতে গোনাহ হবে না। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া। ইবন জারীর তাবারী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, নারী যে চাদর দ্বারা শরীর ঢাকে, এ ব্যতিক্রম দ্বারা সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আবৃত করা সম্ভব নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর ব্যাখ্যা করেন, বিশেষ প্রয়োজনে যদি চেহারা বা হাত খুলতে হয়, তবে এ আয়াত তার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু চেহারাই যেহেতু রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল তাই সাধারণ অবস্থায় তা ঢেকে রাখতে হবে, যেমন সূরা আহযাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে (৩৩ : ৫৯)। হ্যাঁ বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন চেহারাও খোলা যাবে, কিন্তু পুরুষের প্রতি নির্দেশ হল তখন যেন সে নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখে, যেমন এর আগের আয়াতে গেছে।

১৯. যে সকল পুরুষের সামনে নারীর পর্দা রক্ষা জরুরী নয়, এবার তাদের তালিকা দেওয়া হচ্ছে।

২০. 'আপন নারীগণ' কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ মুসলিম নারীগণ। সুতরাং অমুসলিম নারীদের সামনে মুসলিম নারীর জন্য পর্দা রক্ষা জরুরী। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় নবী (স.) এর স্ত্রীগণের কাছে অমুসলিম নারীরা আসা-যাওয়া করত। এর দ্বারা উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কাজেই অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন, 'আপন নারীগণ' বলতে এমন নারীদের বোঝানো হয়েছে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে থাকে। তা মুসলিম নারী হোক বা অমুসলিম নারী। নারীদের জন্য এরূপ নারীর সঙ্গে পর্দা করা জরুরী নয়।

২১. যারা নিজ মালিকানাধীন' এর দ্বারা দাসীগণকে বোঝানো হয়েছে। দাসী (চাকরানী নয়) মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তার সঙ্গে পর্দা করা আবশ্যিক নয়। কোন কোন ফকীহ গোলামকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, অর্থাৎ তার সঙ্গেও পর্দা নেই।

২২. 'যৌন কামনা জাগে না এমন খেদমতগার'। কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে التابعين অর্থাৎ এমন লোক, যে অন্যের অধীন থাকে। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, এক ধরনের হাবাগোবা লোক থাকে, যারা কোন পরিবারের সঙ্গে লেগে থাকে, তাদের ফুট - ফরমাশ খাটে আর তারা কিছু দিলে খায় কিংবা কোন মেহমানের সাথে জুটে যায় এবং বিনা দাওয়াতে হাজির হয়ে যায়। পেটে কিছু খাবার দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য নেই। যৌন চাহিদার কোন ব্যাপারও তাদের থাকে না। সেকালেও এ ধরনের লোক ছিল। আয়াতের ইশারা তাদের দিকেই।

২৩. অর্থাৎ সে নাবালেগ শিশু, নর-নারীর যৌন সম্পর্ক বিষয়ে যার কোন ধারণা সৃষ্টি হয়নি।

২৪. অর্থাৎ পায়ে যদি নুপুর পরা থাকে, তবে হাঁটার সময় এমনভাবে পা ফেলবে না, যাতে নুপুরের আওয়াজ কেউ শুনতে পায় বা অলংকারের পারস্পরিক ঘর্ষণজনিত আওয়াজ কোন গায়রে মাহরাম পুরুষের কানে পৌঁছে।

৩২.

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ- اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ- وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

অর্থ :

তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' (যে পুরুষের স্ত্রী নেই এবং নারীর স্বামী নেই) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর :

২৫. এ সূরায় অশ্লীলতা ও ব্যভিচার রোধ করার লক্ষ্যে যেমন বিভিন্ন বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে। তেমনি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছ, সে যেন তার স্বভাবগত যৌনচাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করে। সে হিসেবেই এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বালেগ নারী-পুরুষ যদি বিবাহের উপযুক্ত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত তাদের বিবাহের জন্য চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে বর্তমান সামর্থ্যই যথেষ্ট। বিবাহের পর স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে সে অভাবে পড়তে পারে এ আশঙ্কায় বিবাহ বিলম্বিত করা সমীচীন নয়। চরিত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে বিবাহ দিলে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আল্লাহ তা'আলাই উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। বাকি যাদের

বর্তমান অবস্থাও সচ্ছল নয় এবং বিবাহ করার মত অর্থ-সম্পদ হাতে নেই, তারা কী করবে? পরের আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য দান করেন, ততক্ষণ তারা সংযম অবলম্বন করবে এবং নিজ চরিত্র রক্ষায় যত্নবান থাকবে।

৩৩.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ- وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِىْٓ اٰتٰىكُمْ- وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا- وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ :

যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা এদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা এদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসিগণ, সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধনলালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কর না, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের ওপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর :

২৬. দাস-দাসীর প্রচলন থাকাকালে অনেক সময় দাস-দাসীগণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের জন্য মনিবদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হত। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হত। তারা যথাসময়ে মনিবকে সে অর্থ পরিশোধ করলে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যেত। মুক্তি লাভের জন্য সম্পাদিত এ চুক্তিকেই 'মুকাতাবা' বা 'কিতাবা' বলা হয়। এ আয়াতে মনিবদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, দাস-দাসীগণ এরূপ চুক্তি করতে চাইলে তারা যেন তাতে সম্মত হয়। আর অন্যান্য মুসলিমকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে তারা যেন এরূপ দাস-দাসীর মুক্তির লক্ষ্যে তাদেরকে অর্থসাহায্য করে।

২৭. আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখ। অর্থাৎ যদি মনে হয় এরূপ চুক্তি দাস-দাসীর পক্ষে বাস্তবিকই কল্যাণকর হবে। অর্থাৎ, মুক্তি লাভের পর তারা চুরি, ব্যভিচার, অন্যায়অপকর্ম করে বেড়াবে না। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেওয়া উচিত, যাতে তারা মুক্তি লাভের পর আত্মসংশোধনের পথে উন্নতি লাভ করতে পারে এবং কোথাও বিবাহ করতে চাইলে স্বাধীনভাবে তা করতে সমর্থ হয়; দাসত্বের কারণে ক্ষেত্র সংকুচিত না থাকে।

২৮. জাহেলী যুগে রেওয়াজ ছিল, দাস-দাসী মালিকগণ তাদের দাসীদেরকে দিয় দেহ বিক্রি করাত এবং এভাবে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করে অর্থোপার্জন করত। এ আয়াত তাদের সেই ঘৃণ্য প্রথাকে একটি গুরুতর গোনাহ সাব্যস্ত করত সমাজ থেকে তার মূলোৎপাটন করেছে।

২৯. অর্থাৎ, যে দাসীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়েছে, সে যদি ব্যভিচার থেকে বাঁচার যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে, তবে সে যেহেতু অপারগ হয়ে তা করেছে তাই তার কোন গোনাহ হবে না এবং ব্যভিচারের শরয়ী শাস্তি ও তার ওপর আরোপিত হবে না। হাঁ যে ব্যক্তি তার সাথে ব্যভিচার করেছে তাকে অবশ্যই শরয়ী শাস্তি দেওয়া হবে এবং যে মনিব তাকে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য করেছে, বিচারক তাকেও উপযুক্ত শাস্তি (তাযীর) দেবে।

৩৪

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ-

অর্থ :

আমি তো তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ।

৩৫.

اَللّٰهُ نُوْرُالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِؕ- مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌؕ-اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍؕ- اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍۙ- يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌؕ- نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُؕ- وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِؕ- وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ-

অর্থ :

আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ; এটা প্রজ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যায়তূন বৃক্ষের তৈল দিয়ে যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি একে স্পর্শ না করলেও যেন এর তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্যে উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর :

৩০. আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর নূর' এ বাক্যের সরল অর্থ তো এই যে, আসমান যমীনের সমস্ত মাখলুক হেদায়েতের আলো পায় কেবল আল্লাহ তা'আলারই নিকট থেকে। তবে এর আরও অর্থ ও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এর ভেতর আছে পন্ডিতমনষ্ক। ব্যক্তিবর্গের চিন্তার খোরাক আছে তত্ত্বানুসন্ধানীদের জন্য কৌতুহলী অভিযাত্রার আহ্বান। ইমাম গাযালী (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দার্শনিক ভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইমাম রাযী (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে সম্পূর্ণ নিবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন। জ্ঞানপিপাসু পাঠকের তা একবার পড়া উচিত।

৩১. ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, সূর্যের আলো যদিও প্রদীপের আলো অপেক্ষা অহৈশ বেশি, তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর হেদায়াতের আলোকে সূর্যের সাথে নয়; প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ, এখানে উদ্দেশ্য হল এমন হেদায়েতের দৃষ্টান্ত দেখানো, যা গোমরাহীর অন্ধকারের মাঝখানে থেকে পথ প্রদর্শন করে। আর সে দৃষ্টান্ত প্রদীপের দ্বারাই হয়। কেননা প্রদীপই সর্বদা অন্ধকারের ভেতর থেকে আলো দান করে। সূর্যের ব্যাপারটা সে রকম নয়। সূর্যের বর্তমানে অন্ধকারের অস্তিত্বই থাকে না। ফলে অন্ধকারের সাথে তার তুলনা যুগপভাবে প্রকাশ পায় না

৩২. অর্থাৎ, সে বৃক্ষ এমন অবারিত স্থানে অবস্থিত যে, সূর্য পূর্বে থাকুক বা পশ্চিম দিকে, তার আলো সর্বাবস্থায়ই তাতে পড়ে। এরূপ গাছের ফল খুব ভালো হয়, তা পাকেও ভালো এবং তার তেল খুব স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়।

৩৩. পাকা যয়তুনের তেল খাঁটি হলে তা বড় স্বচ্ছ ও ঝলমলে হয়। দূর থেকে মনে হয় আলো ঠিকরাচ্ছে।

৩৬-৩৭

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ- يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ- رِجَالٌ-لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ- يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ-

অর্থ :

সে সকল গৃহে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, **সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।**

তাফসীর :

৩৪. পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা যাকে চান হিদায়াতের আলোতে উপনীত করেন। এবার যারা হেদায়েতের আলোপ্রাপ্ত হয়, তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণিত হচ্ছে। সুতরাং এ আয়াতে বলা হয়েছে, তারা মসজিদ ও ইবাদতখানায় আল্লাহর তাসবীহ ও যিকির করে। মসজিদ ও ইবাদতখানা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার হুকুম হল, এগুলোকে যেন উচ্চমর্যাদা দেওয়া হয় ও সম্মান করা হয়। যারা এসব ইবাদতখানায় ইবাদত করে, তারা যে দুনিয়ার কাজকর্ম বিলকুল ছেড়ে দেয় এমন নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার হুকুম অনুসারে জীবিকা উপার্জনের কাজও করে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনায়ও লিপ্ত হয়। তবে ব্যবসায়িক ধান্ধায় পড়ে তারা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও তাঁর হুকুম-আহকাম পালন থেকে গাফেল হয়ে যায় না। তারা ওয়াক্ত মত নামায পড়ে, যাকাত ফরয হলে তাও আদায় করে এবং কখনওই একথা ভুলে যায় না যে, এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যে দিন জীবনের সব কাজ-কর্মের হিসাব দিতে হবে। সে দিনটি এমনই বিভীষিকাময়, তখন সমস্ত মানুষের বিশেষত নাফরমানদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাবে, চোখ উল্টে যাবে।

৩৮.

لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ- وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ-

অর্থ :

যাতে তারা যে কর্ম করে তার জন্যে আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

তাফসীর :

৩৫. নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত আরও কিছু দিবেন। আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মের যেসব পুরস্কার দান করবেন, তার কিছু কিছু তো কুরআন ও হাদীসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক কিছু রাখা হয়েছে অব্যক্ত। এ আয়াতে কৌতুহলোদ্দীপক ভাষায় বলা হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে যা প্রকাশ করা হয়েছে, পুণ্যবানদের প্রাপ্তব্য পুরস্কার তার মধ্যেই সীমিত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা তার বাইরেও এমন অনেক নেয়ামত দান করবেন, যা কুরআন-হাদীসে তো বর্ণিত হয়ইনি, কারও অন্তর তা কল্পনা করতেও সক্ষম নয়।

৩৯.

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءًۚ- حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗۚ- وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

অর্থ :

যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে এর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছু নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহ্কে, এরপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে তৎপর।

তাফসীর :

৩৬. মরুভূমিতে যে বালুরাশি চিকচিক করে, দূর থেকে তাকে মনে হয় পানি। আসলে তো তা পানি নয়; মরীচিকা। আরবীতে বলে سراب (সারাব)। সফরকালে মুসাফিরগণ ভ্রমবশত তাকে পানি মনে করে বসে। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই নয়। ঠিক এ রকমই কাফেরগণ যে ইবাদত ও সৎকর্ম করে আর ভাবে বেশ নেকী কামাচ্ছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তার কিছুই কামাই হয় না, তা মরীচিকার মতই ফাঁকি।

৩৭. যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাওহীদ ও রিসালাতকে স্বীকার করে না, এটা সেই সকল কাফেরের উপমা। বোঝানো হচ্ছে, কাফেরগণ তাদের সেসব কাজ সম্পর্কে মনে করে আখেরাতে তা তাদের উপকারে আসবে। প্রকৃতপক্ষে তখন তা কোনোই উপকারে আসবে না, মৃত্যুর পর তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল কাজের হিসাব বুঝিয়ে দিবেন পুরোপুরি। তারপর দেখা যাবে তারা তাদের কৃতকর্মের কারণে জান্নাতের নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছে। এভাবে তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি বরং ক্ষতিরই কারণ হয়েছে।

৪০.

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌؕ-ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍؕ- اِذَاۤ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَاؕ- وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ-

অর্থ :

অথবা তাদের কর্ম গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের ওপর স্তর, এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্যে কোন জ্যোতিই নেই।

তাফসীর :

৩৮. যেসব কাফের আখেরাতকেও মানে না, এটা তাদের দৃষ্টান্ত। বিশ্বাসের দিক থেকে এরা অধিকতর নিঃস্ব হওয়ার কারণে এরা অতটুকু আলোও পাবে না, যতটুকু প্রথমোক্ত দল পেয়েছিল। তারা তো অন্তত এই আশা করতে পেরেছিল যে, তাদের কর্ম আখেরাতে তাদের উপকারে আসবে, কিন্তু এ দলের সে রকম আশারও লেশমাত্র থাকবে না। কোন কোন মুফাসসির উপমা দু'টির পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, কাফেরদের কর্ম দু' রকম হয়ে থাকে। (এক) সে সকল কাজ, যাকে তারা পুণ্য মনে করে এবং সে বিশ্বাসেই তা করে। তাদের আশা তা করলে তাদের উপকার হবে। এ জাতীয় কাজের দৃষ্টান্ত হল মরীচিকা। (দুই) এমন সব কাজ যাকে তারা পুণ্য মনে করে না এবং তাতে তাদের উপকারের আশাও থাকে না। এর দৃষ্টান্ত হল পুঞ্জীভূত অন্ধকার, যাতে আলোর লেশমাত্র থাকে না। এখানে সমুদ্রগর্ভের অন্ধকার হল তাদের কুফরী আকীদা-বিশ্বাসের উপমা। তাতে এক তরঙ্গ

তাদের অসৎকর্মের আর দ্বিতীয় তরঙ্গ জেদ ও হঠকারিতার উপমা। এভাবে ওপর-নিচ স্তরবিশিষ্ট নিবিড় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে গেল। এরূপ ঘন অন্ধকারের ভেতর মানুষ যেমন নিজের হাতও দেখতে পায় না, তেমনিভাবে কুফর ও নাফরমানীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার কারণে তারা নিজেদের স্বরূপও উপলব্ধি করতে পারছে না।

৪১.

اَلَمْ تَرَاَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُصَٰٓفّٰتٍۜ- كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗۜ- وَاللهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ-

অর্থ :

তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার ‘ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং এরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

তাফসীর :

৩৯. সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তা’আলা বর্ণনা করেছেন, বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ তা’আলার তাসবীহ পাঠ করে। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না (১৭ : ৪৪)। এখানে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের তাসবীহের পদ্ধতি আলাদা। বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু আপন-আপন পন্থায় আল্লাহ তা’আলার তাসবীহ আদায়ে রত আছে। সূরা বনী ইসরাঈলের উল্লিখিত আয়াতের টীকায় বলা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদের বহু আয়াত দ্বারা জানা যায়, দুনিয়ায় আমরা যে সকল বস্তুকে অনুভূতিহীন মনে করি, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু অনুভূতি অবশ্যই আছে। এখন তো আধুনিক বিজ্ঞানও একথা স্বীকার করছে।

৪২.

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۚ- وَاِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ-

অর্থ :

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

৪৩.

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖۚ-وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ- يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ-

অর্থ :

তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাদেরকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, এরপর তুমি দেখতে পাও, এর মধ্য হতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এটা দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার ওপর হতে এটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়।

৪৪-৪৫

يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ- اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ- وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍۚ- فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖۚ- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِۚ- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍؕ- يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَآءُ ؕ- اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থ :

আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্যে। আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, এদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪৬.

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍؕ- وَاللهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

অর্থ :

আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

৪৭.

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَؕ- وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ :

এরা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম', কিন্তু এটার পর এদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুত এরা মু'মিন নয়।

তাফসীর :

৪০. মুনাফিক শ্রেণি কেবল মুখেই ঈমানের দাবি করত, আন্তরিকভাবে তারা ঈমান আনত না। আর সে কারণেই তারা সর্বদা মহানবী (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণে লিপ্ত থাকত। যেমন একবার এ ঘটনা ঘটেছিল, জনৈক ইয়াহুদীর সাথে বিশর নামক এক মুনাফিকের ঝগড়া লেগে যায়। ইয়াহুদী জানত মহানবী (স.) এর বিচার সর্বদা ইনসাফভিত্তিক হয়। তাই সে বিশরকে প্রস্তাব দিল, চলো নবী (স.) এর কাছে যাই, তিনি আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। বিশর মুনাফিক। তার মনে ছিল ভয়। তাই সে মহানবী (স.) কে বিচারক বানাতে রাজি হল না। সে প্রস্তাব দিল ইয়াহুদীদের নেতা কাব ইবন আশরাফের কাছে যাওয়া যাক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

৪৮-৫০

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ- وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ- اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗؕ- بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

অর্থ :

এবং যখন এদেরকে আহ্বান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে এদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবার জন্যে তখন এদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আর যদি এদের প্রাপ্য থাকে তা হলে এরা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে। এদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না এরা সংশয় পোষণ করে? না এরা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এদের প্রতি যুলুম করবেন? বরং এরাই তো যালিম।

তাফসীর :

৪১. শরীআতী বিচার - ব্যবস্থায় যাদের আস্থা নেই, যারা তা গ্রহণে প্রস্তুত নয় বা তার যথার্থতা ও উপযোগিতায় সন্দেহ পোষণ করে এসব আয়াত তাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্কবাণী। বলা হচ্ছে, তাদের অন্তরে কি মুনাফিকীর ব্যাধি আছে, না রাসূলুল্লাহ (স.) এর সত্যতা সম্পর্কে তারা সন্দিহান, নাকি মনে করে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিচার ইনসাফভিত্তিক নয়? বলা বাহুল্য এরূপ কোন কারণে কেউ ইসলামী বিচারব্যবস্থাকে অপছন্দ করলে তার ঈমান ও ইসলামের দাবিই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা এরূপ লোকদেরকে যালিম সাব্যস্ত করেছেন। তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিচারকে উপেক্ষা করে কেবল নিজেদের প্রতিই যুলুম করে, অনৈসলামিক বিচার - ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে সমাজেও যুলুম - নির্যাতন বিস্তারের পথ করে দেয়।

৫১-৫২

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَاؕ- وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ-

অর্থ :

মু'মিনদের উক্তি তো এ- যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবার জন্যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর এরাই তো সফলকাম। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।

৫৩.

وَاَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّؕ- قُلْ لَّا تُقْسِمُوْاۚ-طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌؕ- اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ-

অর্থ :

এরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করে বলে যে, তুমি এদেরকে আদেশ করলে এরা অবশ্যই বের হবে; তুমি বল, 'শপথ কর না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।'

তাফসীর :

৪২. যখন জিহাদ থাকত না, মুনাফিকরা তখন কসম করে বড় মুখে বলত, মহানবী (স.) আদেশ করলে তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে জিহাদে বের হয়ে পড়বে। কিন্তু জিহাদের ঘোষণা এসে গেলে তারা নানা ছলছুতা দেখিয়ে গা বাঁচাত। এজন্যই বলা হয়েছে, তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ সকলেরই জানা আছে। বহুবার পরীক্ষা হয়ে গেছে সময়কালে তোমরা কেমন আনুগত্য দেখাও। তখন আর কসমের কথা মনে থাকে না।

৫৪.

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَۚ- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْؕ- وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْاؕ- وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ-

বল, 'আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।' এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে লও, তবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে সে-ই দায়ী এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্যে তোমরাই দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।

তাফসীর :

৪৩. মক্কা মুকাররমায় সাহাবায়ে কেরামকে অশেষ যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। হিযরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পরও তারা স্বস্তি পাননি। কাফেরদের পক্ষ থেকে সব সময়ই হামলার আশঙ্কা ছিল। সে পরিস্থিতিতে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করেছিলেন, এমন কোনও দিন কি আসবে, যখন আমরা অস্ত্র রেখে শান্তিতে সময় কাটাতে পারব? তার উত্তরে, মহানবী (স.) বলেছিলেন, হাঁ, অচিরেই সে দিন আসছে। এ আয়াত সে প্রেক্ষাপটেই নাযিল হয়েছে। এতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, আল্লাহর যমীনে মহানবী (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের জন্য একদিন পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে যাবে। তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না। চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। পৃথিবীর ক্ষমতা তখন তাদেরই হাতে থাকবে। তারা অপ্রতিদ্বন্ধী শক্তির অধিকারী হয়ে যাবে। ফলে তারা নির্বিঘ্নে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা পূর্ণ হতে বেশি দিন লাগেনি। মহানবী (স.) এর যামানায়ই সমগ্র জাযীরাতুল আরব ইসলামের ছায়াতলে এসে

গিয়েছিল। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা অর্ধজাহানে বিস্তার লাভ করেছিল।

৫৫.

وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ- وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاؕ- يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔاؕ- وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ-

অর্থ :

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ‘ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।

৫৬-৫৭

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ- لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِۚ- وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُؕ- وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

অর্থ :

তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে কখনো প্রবল মনে কর না। এদের আশ্রয়স্থল দোযখ; কত নিকৃষ্ট এ পরিণাম!

৫৮.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍؕ- مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِوَ حِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ ومِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ- ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْؕ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّؕ- طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍؕ- كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِؕ- وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

অর্থ :

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ের অনুমতি গ্রহণ করে, ফযরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং 'ইশার সালাতের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্যে এবং তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের এক-কে অপরের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর :

৪৪. ২৭-২৯ আয়াতসমূহে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, কেউ যেন অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ না করে। মুসলিমগণ সাধারণভাবে এ হুকুম মেনে চলছিল। কিন্তু ঘরের দাস-দাসী ও নাবালেগ, ছেলে-মেয়েদের যেহেতু বারবার এ ঘর-ও ঘর করতে হয় বা এক কামরা : থেকে অন্য কামরায় যাতায়াত করতে হয়, তাই তাদের ব্যাপারে তারা এ নিয়ম রক্ষা করত। এর ফলে অনেক সময় এমনও ঘটে যেত যে কেউ হয়ত আরাম করছে বা একা খোলামেলা অবস্থায় আছে আর এ সময় হঠাৎ কোন দাস-দাসী বা ছেলে-মেয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। এতে যে কেবল বিশ্রামের ব্যাঘাত হত তাই নয়, অনেক সময় পর্দাও নষ্ট হত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। এতে স্পষ্টভাবে বিধান জানিয়ে দেওয়া হল যে, অন্ততপক্ষে তিনটি সময়ে দাস-দাসী ও শিশুদেরকেও অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে তারাও অন্য ঘরে বা অন্য কক্ষে প্রবেশ করবে না। বিশেষভাবে এ তিনটি সময় (অর্থাৎ ফযরের পূর্ব, দুপুর বেলা ও ইশার পর)-এর কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ সময়গুলোতে মানুষ সাধারণত একা থাকতে ভালোবাসে। একটু খোলামেলা থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। তাই একান্ত জরুরী পোশাক ছাড়া অন্য কাপড় খুলে রাখে। এ অবস্থায় হঠাৎ করে কেউ এসে পড়লে পর্দাহীনতার আশঙ্কা থাকে আর আরাম তো নষ্ট হয়ই। এছাড়া অন্যান্য সময়ে যেহেতু এসব ভয় থাকে আবার এদের বেশি-বেশি আসা-যাওয়া করার প্রয়োজন থাকে, তাই হুকুম শিথিল রাখা হয়েছে। তখন তারা অনুমতি ছাড়াও প্রবেশ করতে পারবে।

৫৯-৬০

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْؕ- كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖؕ- وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍؕ- وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّؕ- وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

অর্থ :

আর তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্যে অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এটা হতে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর :

৪৫. চরম বার্ধক্যে পৌছার কারণে যারা বিবাহের উপযুক্ত থাকে না, ফলে তাদের প্রতি কারও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীদের জন্যই এ বিধান। তাদেরকে এ সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন বড় কোন চাদর জড়িয়ে বা বোরকা পরে যেতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়। এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হল, তারা তাদের সামনে সেজেগুজে যেতে পারবে না। এর সাথে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধানের এ শিথিলতা কেবলই জায়েয পর্যায়ের। সুতরাং তারা যদি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য নারীদের মত তারাও পরপুরুষের সামনে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলে তবে সেটাই উত্তম।

৬১.

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَاعَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْبُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْمَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْصَدِيْقِكُمْؕ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْاَشْتَاتًاؕ- فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةًؕ- كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

অর্থ :

অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রুগ্নের জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই আহার করা তোমাদের গৃহে বা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে বা সেসব গৃহে যার চাবির মালিক তোমরা বা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর বা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের জন্যে কোন অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমর তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদনস্বরূপ যা আল্লাহ্‌র নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

তাফসীর :

৪৬. এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট এ যে, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ শ্রেণির লোকে অনেক সময় অন্যদের সাথে খাবার খেতে সঙ্কোচবোধ করত। তারা ভাবত অন্যরা তাদের সাথে বসে খেতে অস্বস্তি বোধ করে থাকবে। কখনও তাদের এ রকম চিন্তাও হত যে, প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তারা পাছে অন্যদের তুলনায় বেশি জায়গা আটকে ফেলে কিংবা দেখতে না পাওয়ার ফলে অন্যদের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলে। অপর দিকে অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তিরাও মনে করত, মাযূর হওয়ার কারণে তারা হয়ত সুস্থদের সাথে একযোগে চলতে পারবে না; হয়ত কম খাবে, নয়ত খাদ্যের পাত্র থেকে অন্যদের মত নিজ অভিরুচি বা নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার তুলে নিতে পারবে না। তাদের এসব অনুভূতির উৎস হল শরীয়তের এমন কিছু বিধান, যাতে অন্যকে কষ্ট দেওয়াকে গোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, যাতে নিজের কোন আচার-আচরণ অন্যের পক্ষে অপ্রীতিকর না হয়। সে সঙ্গে

আছে যৌথ জিনিসপত্র ব্যবহারেও সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ। তো এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আপনজনদের হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে এততা হিসাবী দৃষ্টির দরকার নেই।

৪৭. আরব জাতির মধ্যে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের পারস্পরিক চাল-চলনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বড় উদার। ওপরে যে সকল আত্মীয়-স্বজনের কথা বলা হল, তারা যদি অনুমতি ছাড়া একে অন্যের ঘর থেকে কিছু খেয়ে ফেলত, সেটাকে দোষের তো মনে করা হতই না; বরং তাতে তারা অত্যন্ত খুশী হত। যখন বিধান দেওয়া হল কারও জন্য অন্যের কোনবস্তু তার আন্তরিক সম্মতি ছাড়া ব্যবহার করা জায়েয নয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গেলেন। কোন কোন সাহাবী এত কঠোরতা অবলম্বন করলেন যে, যদি কারও বাড়িতে যেতেন আর গৃহকর্তা উপস্থিত না থাকত, তবে সেখানে খাদ্যগ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন। গৃহকর্ত্রী ও তার ছেলেমেয়েরা আতিথেয়তা স্বরূপ কিছু পেশ করলে তারা চিন্তা করতেন, ঘরের আসল মালিক তো উপস্থিত নেই। তার অনুমতি ছাড়া এখানে খাওয়া আমাদের সমীচীন হবে কি? এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যেখানে এ নিশ্চয়তা থাকে যে, আতিথেয়তা গ্রহণ করলে গৃহকর্তা খুশী হবে, সেখানে তা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যেখানে বিষয়টি সন্দেহযুক্ত সেখানে সাবধানতাই শ্রেয়, তাতে সে যত নিকটাত্মীয়ই হোক।

৪৮. অনেকে জিহাদে যাওয়ার সময় ঘরের চাবি এমন কোনো মাযুর ব্যক্তির কাছে দিয়ে যেত, যে জিহাদে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাকে বলে যেত, ঘরের কোন জিনিস খেতে চাইলে আপনি নির্দ্বিধায় খাবেন। কিন্তু এরূপ অনুমতি থাকা সত্বেও মাযুর ব্যক্তিগণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং খাওয়া হতে বিরত থাকতেন। এ আয়াত তাদেরকে বলছে, এতটা সাবধানতার দরকার নেই। মালিকের পক্ষ হতে যখন চাবি পর্যন্ত সমর্পণ করা হয়েছে এবং অনুমতিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন খাওয়াতে কোনো দোষ থাকতে পারে না।

৬২.

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ- اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ- فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ- اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ :

মু'মিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা অনুমতি ব্যতীত সরে পড়ে না; যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাহিরে যাবার জন্যে তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর :

৪৯. এ আয়াত নাযিল হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে। এ যুদ্ধে আরবের বেশ কয়েকটি গোত্র একাট্টা হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা করতে এসেছিল। মহানবী (স.) প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারার পাশে পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মুমিনদেরকে একত্র করে খননকার্য বণ্টন করে দিলেন। তারা সকলে কাজ করে যাচ্ছিলেন। কারও কোন প্রয়োজন দেখা দিলে মহানবী (স.) এর কাছে অনুমতি নিয়ে যেতেন। কিন্তু মুনাফিকরা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একে তো তারা এ কাজে অংশ নিতেই অলসতা করত। আর যদি কখনও এসেও পড়ত নানা বাহানায় চলে যেত। অনেক সময় অনুমতি ছাড়াই চুপি চুপি সরে পড়ত। এ আয়াতে তাদের নিন্দা জানানো হয়েছে এবং মুখলিস ও নিষ্ঠাবান মুমিনদের, যারা অনুমতি ছাড়া যেত না, প্রশংসা করা হয়েছে।

৬৩.

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا- قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا-
فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

অর্থ :

রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য কর না; তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ্ তো তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে বা আপতিত হবে তাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর :

৫০. সমপর্যায়ের লোক যখন একে অন্যকে ডাকে তখন তার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কাজেই তাতে সাড়া দিয়ো গেলে যেমন দোষ মনে করা হয় না, তেমনি যাওয়ার পর যদি অনুমতি ছাড়া চলে আসে তাও বিশেষ দূষনীয় হয় না। কিন্তু বড়দের ডাকের ব্যাপারটা ভিন্ন। তাদের ডাককে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নেওয়াই নিয়ম। আর সে ডাক যদি হয় রাসূলের, তার গুরুত্ব হয় অপরিসীম। আয়াতে বলা হচ্ছে, যখন রাসূল (স.) তোমাদেরকে কোন কাজের জন্য ডাকেন, তখন তাকে তোমাদের আপসের ডাকের মত মামুলি গণ্য করো না যে, চাইলে সাড়া দিলে আর চাইলে দিলে না। বরং তাঁর ডাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সাড়া দিয়ে পত্রপাঠ ছুটে যাওয়া উচিত। আর যাওয়ার পরও যেন এমন না হয় যে, ইচ্ছা হল আর অনুমতি ছাড়া ওঠে গেলে। যদি যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তবেই যাবে। এ আয়াতের এ রকম তরজমা করাও সম্ভব যে, তোমরা রাসূলকে ডাকার বিষয়টিকে তোমাদের পরস্পরে একে অন্যকে ডাকার মত (মামুলি) গণ্য করো না। এ হিসেবে ব্যাখ্যা হবে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (স.) কে লক্ষ্য করে যখন কোন কথা বলবে, তখন তোমরা নিজেরা একে অন্যকে যেমন ডাক দিয়ে থাক, যেমন হে অমুক! শোন, তাকেও সেভাবে ডাক দিও না। সুতরাং তাকে লক্ষ্য করে ‘হে মুহাম্মাদ! বলা কিছুতেই উচিত নয়। বরং তাকে সম্মানের সাথে ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে সম্বোধন করা চাই।

৬৪.

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِؕ- قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِؕ- وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْاؕ- وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ-

অর্থ :

জেনে রাখ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই; তোমরা যাতে ব্যাপৃত তিনি তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তৃতীয় অধ্যায় এর ১ম পরিচ্ছদ

ব্যভিচার

ব্যভিচার একটি মারাত্মক অপরাধ। হত্যার পরই যার স্থান। কারণ তাতে বংশ পরিচয় ঠিক থাকে না। লজ্জাস্থানে হিফাযত হয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক সম্মান রক্ষা পায় না। মানুষে মানুষে কঠিন শত্রুতার জন্ম নেয়। দুনিয়ার সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থা এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। একে অন্যের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। একারণেই আল্লাহ তা'য়ালা এবং তদীয় রাসূল (স.) হত্যার পরই এর উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ- وَمَنْ اِلَّا مَنْ تَابَ واٰمَنَ وَعَمِلَ يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا- يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا- عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ- وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

আর যারা আল্লাহ তা'য়ালার পাশাপাশি অন্যকে উপাস্য ডাকে না। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়ত সম্মত) কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করবে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে এবং তারা ওখানে চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিতাবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে নেয়, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; আল্লাহ তা'য়ালা তাদের পাপগুলো পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[২৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন,

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ-

জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহর রাসূল! কোন পাপটি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মহাপাপ বলে বিবেচিত? রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরীক করা; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

২৮. *আল কুরআন*, ২৫ : ৬৮-৭০

সে বললো, অতঃপর কী? তিনি বললেন, নিজ সন্তানকে হত্যা করা ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে খাবে বলে। সে বললো, অতঃপর কী? তিনি বললেন, নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা।[২৯]

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজীদে ব্যভিচারের কঠিন নিন্দা করেন। তিনি বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا-

তোমরা যিনা তথা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না। কারণ তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[৩০]

তবে এ ব্যভিচার মুহরিমা যে মহিলাকে বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম) এর সাথে হলে তো আরো জঘন্য। একারণেই আল্লাহ তা'য়ালা নিজ বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা সম্পর্কে বলেন,

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا-

তোমরা নিজেদের বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করো না। তবে যা গত হয়েগেছে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তা অশ্লীল, অরুচিকর ও নিকৃষ্টতম পন্থা।[৩১]

বারা (রা.) থেকে বর্ণিক- তিনি বলেন, একদা আমার চাচার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তার হাতে ছিলো একখানা যুদ্ধের ঝান্ডা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম; আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন,

بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ اِمْرَأَةَ أَبِيْهِ ؛ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ-

আমাকে রাসূল (স.) এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, যে নিজ পিতার স্ত্রী তথা তার সৎ মায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। রাসূল (স.) আমাকে আদেশ করেছেন তার গর্দান কেটে দিতে এবং তার সম্পদ হরণ করতে।[৩২]

মুহরিমাকে বিবাহ করা যদি এতো বড় অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তাদের সাথে ব্যভিচার করা যে কতো বড় অপরাধ হবে তা সহজেই বুঝা যায়।

---

২৯. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন আহনাফ বারদিযবাহ আল জুফী আল বুখারী, *সহীহ বুখারী*, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১২), কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং ৪৪৭৭

৩০. *আল কুরআন*, ১৭ : ৩২

৩১. *আল কুরআন*, ৪ : ২২

৩২. সুলাইমান ইবন আশআস ইবন ইসহাক ইবন বুশাইর ইবন সাদ্দাদ ইবন আমর ইবন ইমরান আল আযদি আস সিজিস্তানি, *সুনানে আবু দাউদ*, অনু : ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক (ঢাক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), হাদীস নং ৪৪৫৭

যৌনাঙ্গ হিফাযতের বিশেষ কয়েকটি ফযীলত

১. যৌনাঙ্গ হিফাযত সফলতা অর্জনের বিশেষ মাধ্যম :

আল্লাহ তা'য়ালা লজ্জাস্থান হিফাযতকারীকে সফলকাম বলেছেন। এর বিপরীতে অবৈধ যৌন সংযোগকারীকে ব্যর্থ, নিন্দিত ও সীমালঙ্ঘনকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ- ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ- وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرِضُونَ - وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ - وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ - إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ-

মুমিনরা অবশ্যই সফলকাম। যারা সালাতে অত্যন্ত মনোযোগী। যারা অযথা ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত। যারা যাকাত দানে অত্যন্ত সক্রিয়। যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এছাড়া অন্য পন্থায় যৌন ক্রিয়া সম্পাদনকারী অবশই সীমালঙ্ঘনকারী।[৩৩]

২. যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী কখনো নিন্দিত নয়, বরং সে একান্তভাবে সবার প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত :

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজীদে ব্যাপকভাবে মানব জাতির নিন্দা করেছেন। তবে যারা নিন্দিত নয় তাদের মধ্যে যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী অন্যতম।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ- إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ- فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ-

আর যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থায় যৌন ক্রিয়া সম্পাদনকারীরা অবশই সীমালঙ্ঘনকারী।[৩৪]

---

৩৩. *আল কুরআন*, ২৩ : ১-৭
৩৪. *আল কুরআন*, ৭০ : ২৯-৩১

লজ্জাস্থান হিফাযতের কারণেই মারইয়াম (আ.) মহিলাদের মধ্যে বিশেষ পূর্ণতা লাভ করেছেন এবং পবিত্র কুরআন মাজীদে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ-

আল্লাহ তা'য়ালা আরো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের। যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছে। ফলে আমরা তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছে। সে ছিলো অনুগতদের অন্যতম।[৩৫]

৩. লজ্জাস্থান হিফাযত জান্নাতে প্রবেশের একটি বিশেষ চাবিকাঠি :

রাসূল (স.) লজ্জাস্থান হিফাযতকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ! احْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، لاَ تَزْنُوْا، أَلاَ مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ-

হে কুরাইশ যুবকরা! তোমরা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযত করো। কখনো ব্যভিচার করো না। জেনে রাখো যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান হিফাযত করতে পেরেছে তার জন্যইতো জান্নাত।[৩৬]

সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَنْ يَّضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ-

যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ তথা জিহবা এবং পায়ের মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হিফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো।[৩৭]

উবাদহ ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন-

اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: أُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا الْأَمَانَةَ إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ-

---

৩৫. *আল কুরআন*, ১৪ : ১২

৩৬. শাইখ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.), *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, অনু : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল কাফী আল-মাদানী (ঢাকা : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, প্রকাশকাল- তা.বি.), হাদীস নং- ২৪১০

৩৭. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬৪৭৪

তোমরা নিজ থেকেই ছয়টি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো। তোমার কথা বললে সত্য বলবে। ওয়াদা করলে তা পুরা করবে। কেউ তোমাদের নিকট কোনো কিছু আমানত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করবে। লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে। চোখকে নিম্নগামী করবে এবং হাতকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখবে।[৩৮]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا؛ دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ-

কোনো মহিলা যদি রীতি মতো পাঁচ বেলা সালাত পড়ে, রামাদানের সাওম পালন করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে; উপরন্তু তার স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে চায় ঢুকতে পারবে।[৩৯]

৪. লজ্জাস্থান হিফাযত একান্তভাবে নেককারের পরিচয় বহন করে :

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ-

সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারাই স্বামীর আনুগত্য করে এবং তার অনুপস্থিতে তার সম্পদ ও নিজ সতীত্ব রক্ষা করে। যা আল্লাহ তা'য়ালা রক্ষা করলেই তার রক্ষা পাওয়া সম্ভব।[৪০]

৫. লজ্জাস্থান হিফাযত আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা পাওয়ার এক বিশেষ মাধ্যম :

অল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا-

---

৩৮. *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৯৩১
৩৯. *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৯০১
৪০. *আল কুরআন*, ৪ : ৩৪

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মহিলা, মুমিন পুরুষ ও মহিলা, অনুগত পুরুষ ও মহিলা, সত্যবাদী পুরুষ ও মহিলা, ধৈর্যশীল পুরুষ ও মহিলা, বিনয়ী পুরুষ ও মহিলা, সাদাকাকারী পুরুষ ও মহিলা, নিজ লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষ ও মহিলা এবয় আল্লাহ তা'য়ালাকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও মহিলা এদের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা রেখেছেন তাঁর ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।[৪১]

৬. লজ্জাস্থান হিফাযত আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ ডাকে সাড়া দেওয়া :

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ - وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ-

হে মুহাম্মদ! তুমি মুমিনদেরকে বলে দাও যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত। তেমনিভাবে তুমি মুমিন মহিলাদেরকেও বলে দাও যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে।[৪২]

৭. লজ্জাস্থান হিফাযত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের এক বিশেষ মাধ্যম :

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ-

যাদের বিয়ে কারার (অর্থনৈতিক) কোনো সামর্থ্য নেই তারা যেন নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দেন।[৪৩]

৮. লজ্জাস্থান হিফাযত সফলকামীদের পথ, বিপথগামীদের নয় :

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

---

৪১. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৫
৪২. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩০-৩১
৪৩. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩৩

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ - وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيۡلًا عَظِيمٗا - يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا-

আল্লাহ তা'য়ালা চান তোমাদের জন্য (তাঁর হালাল-হারামসমূহ) বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করতে; উপরন্তু তোমাদের তাওবা গ্রহণ করতে। আল্লাহ তা'য়ালাতো মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। আল্লাহ তা'য়ালা চান তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে। এদিকে প্রবৃত্তি পূজারীরা চায় তোমরা যেন ঘোর অধঃপতনে পতিত হও। আল্লাহ তা'য়ালা চান তোমাদের সাথে লঘু ব্যবহার করতে। কারণ মানুষকে তো মূলতঃ দুর্বলরূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে।[৪৪]

৯. লজ্জাস্থান হিফাযত সম্মানেরই মুকুট :

আজ পর্যন্ত কেউ উক্ত বাস্তবতা অস্বীকার করেনি। আদি যুগ থেকে মানুষ সাধুতা ও পবিত্রতা নিয়ে গর্ব করে আসছে।

ইবরাহীম ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহ.) বলেন, আমি আমার পিতার মৃত্যুও সময় তাঁর পার্শ্বেই অবস্থান করছিলাম। আমি কাঁদতে শুরু করলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি কাঁদো কেন? তোমার পিতাতো কখনো ব্যভিচার করেনি।

লজ্জাস্থান রক্ষার পথে একান্ত বাধাসমূহ

যৌনাঙ্গ রক্ষার ফলাফল যখন জান্নাত তখনই এর পথে যেকোনো বাধা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই নিম্নে এ জাতীয় কিছু বাধা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

১. মহিলাদের নতুন নতুন মডেলের পোশাক-পরিচ্ছদ :

বর্তমান যুগের মহিলারা বাজারে গিয়ে নতুন নতুন মডেলের পোশাক-পরিচ্ছদ খুঁজে বেড়ায়। যা সামনে পায় তাই খরিদ করে। যদিওতা পাশ্চত্য স্টাইলের এবং ইসলামী শরীয়ত বিরোধীই হোক না কেন। মূলতঃ এ পোশাক পরিচ্ছদ মুসলিম মহিলাদেরকে ধ্বংস করার একটি বিরাট মাধ্যম। যা ইসলামের শত্রুরা আজ ইসলামের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মেয়েলি

৪৪. *আল কুরআন*, ৪ : ২৬-২৮

পোশাকের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ শরীর ঢেকে রাখা এবং ভারিক্কি পনা অবলম্বন করা তথা উলঙ্গতা ও চঞ্চলতা থেকে দূরে থাকা। যেন মহিলারা ফিতনা ও খবিস লোকদের খপ্পর থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য স্টাইলের পোশাকসমূহের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, উলঙ্গতা ও বেলেল্লাপনা। যাতে যুবক-যুবতীদের লুক্কায়িত কু-প্রবৃত্তি জাগরিত হয় এবং তাদের মধ্যে যৌন ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। লজ্জা, সাধুতা ও পবিত্রতা বলতে যেন তাদের মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। মানুষ যেন প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে যায়।

২. টিভিচ্যানেল :

বর্তমান যুগের টিভিচ্যানেলগুলোতে যেকোনো অনুষ্ঠান, নাটক, গান কিংবা ছায়াছবিই দেখানো হোক না কেন তার অধিকাংশই প্রেম-ভালোবাসা, ফ্যামিলিগত অশ্লীলতা, স্বামী-স্ত্রীর যৌন কেলেঙ্কারী, উলঙ্গতা, নির্লজ্জতা, চুমোচুমি, শরীয়তের বিরোধিতা কিংবা শরীয়তের কোনো ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা মশকারা করা ছাড়া তেমন আর গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়। যেমন : বহু বিবাহ নিয়ে ঠাট্টা করা কিংবা মহিলাদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব নিয়ে তামাশা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং কোনো যুবক-যুবতী দীর্ঘ সময় এ সমস্ত অশ্লীলতা, উলঙ্গতা ও নির্লজ্জতা তথা প্রেম-ভালোবাসার আবেগতাড়িত রকমারি ডায়ালগ শুনে নিজের সাধুতা ও সতীত্ব কীভাবে রক্ষা করতে পারবে? নিচে এ সম্পর্কে জনৈকা যুবতীর সুস্পষ্ট হুবহু উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। যা শুনে আমার প্রত্যেকেই সময় থাকতে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। সে একদা নাম উল্লেখ না করার শর্তে এবং চিকিৎসা পরামর্শ নেয়ার উদ্দেশ্যে বলে; আমি ছোট বেলা থেকেই প্রেমজনিত ছায়াছবি দেখতে অভ্যস্ত। এমনকি তা দেখতে এখন আমার খুবই ভালোলাগে। এতে করে এখন আমার মধ্যে এমন এক ধরনের অদম্য যৌন স্পৃহা জন্ম নিয়েছে যা সত্যিই অস্বাভাবিক। আর এটা আমার জন্য নতুন কিছুই নয়। কারণ আমি সাবালক হওয়ার পূর্বেই যৌন সংক্রান্ত সবকিছুই জেনে ফেলি। এখন আমি আমার মধ্যে এক অদম্য যৌন আবেগ অনুভব করছি। যা আমার পুরো অনুভূতিকে এখন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। আমি এখন রাত্রি বেলায় এতটুকুও ঘুমোতে পারছি না। ঘুমোতে গেলে অনেক ধরনের চিন্তা ও স্বপ্ন আমাকে ঘিরে নেয়।

যখনই আমি আবেগতাড়িত কোনো ফিল্ম দেখি অথবা এজাতীয় কোনো উপন্যাস পড়ি তখনই আমার আবেগ ও যৌন উত্তেজনা অত্যধিক বেড়ে যায়। তখনই আমার মনে হয়, আহ! কেউ যদি এখন আমার সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতো। এ পরিস্থিতিতে আমি এখন কি করতে পারি দয়া করে সুন্দর পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন।

৩. ইন্টারনেট :

এর খপ্পরে পড়েছে বহু যুবক-যুবতী। তারা এখন একে উত্তেজনা বৃদ্ধির এক মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেছে। সময় পেলেই তারা অশ্লীল সাইটগুলোতে যৌন সঙ্গম, ব্যভিচার ও সমকামিতার প্রকাশ্য অনুশীলন দেখতে চায়। এ কথা সবারই জানা যে, ইন্টারনেটে জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তবে তা ব্যবহারের সময় কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধান অবশ্যই মানতে হবে। অন্তরে সর্বদা আল্লাহ ভীতি জাগরূক থাকতে হবে।

৪. অশ্লীল ম্যাগাজিন ও রুচিহীন পত্র-পত্রিকা :

মানব জীবনে এগুলোর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ এগুলো উলঙ্গতা ও বেহায়াপনা শিক্ষা দেয়। এগুলোতে নতুন নতুন মডেলের পোশাক পরিহিতা বহু নারী ও পুরুষ প্রদর্শিত হয়। তাতে করে পাশ্চাত্য মডেলের সকল পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলিম সমাজে প্রচলন পায়। যা খরিদ করে মুসলিমরাই নিজের অজান্তে কাফিরদের অর্থনৈতিক শক্তি ও সামার্থ যোগান দেয়; অথচ তারা জানে না যে, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব পোশাক রয়েছে। যা অন্যের জন্য কোনোভাবেই মানানসই নয়।

৫. ক্যামেরাযুক্ত অত্যাধুনিক মোবইল সেট :

এগুলো চরিত্র নষ্টের আরেকটি বিরাট মাধ্যম। প্রেম-ভালোবাসার জগতে মোবাইলের ব্যবহারতো সবারই জানা। এর সাথে আরো যুক্ত হয়েছে ক্যামেরাযুক্ত অত্যাধুনিক মোবাইল সেট। যাতে অশ্লীল ছায়াছবি ও কুরুচীপূর্ণ যৌন সঙ্গম ধারণ করা ও অন্যের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়। ফলে তা তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসাকে ব্যভিচার ও সমকামিতার দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর করে।

একথা সবারই জানা যে, মোবাইলের মাধ্যমে অন্যের সাথে দ্রুত যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। তবে তা ব্যহারের সময় কিছু ধর্মীয় বিধি- বিধান অবশ্যই মানতে হবে। অন্তরে সর্বদা আল্লাহ ভীতি জাগরূক থাকতে হবে।

৬. নারী-পুরষের অবাধ মেলামেশা এবং গোপনে সহাবস্থান :

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অন্তরের বিক্ষিপ্ততা এবং যৌন উত্তেজনাকে বৃদ্ধি কারার একটি বিরাট মাধ্যম। কারণ কোনো পুরুষ অন্য কোনো নারীর সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেলেইতো সে তাকে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার সুযোগ পায়। তেমনিভাবে কোনো নারী অন্য কোনো পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেলেইতো সে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার সুযোগ পায়। অন্যথায় নয়। আর তখনই উভয়ের মধ্যে পরস্পর গোপনে মিলনের চিন্তা আসে এবং তখনই ব্যভিচার সংঘটিত হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাই সকল বিপদ ও অঘটনের মূল। এরই কারণে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে মানুষের ওপর ব্যাপক শাস্তি নেমে আসে এবং এরই কারণে দুনিয়াতে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। আর গোপনে নারী-পুরুষের সহাবস্থানতো ব্যভিচারের প্রতি কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়া বৈকি?

রাসূল (স.) বলেন,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ-

কোনো পুরুষ অন্যকোনো মহিলার সাথে একান্তে মিলিত হলে শয়তান হয় তাদের তৃতীয়জন।[৪৫]

৭. অসৎবন্ধু-বান্ধব :

বন্ধু-বান্ধবতো এতোই প্রভাবশালী হয় যে, কোনো বন্ধু ইচ্ছে করলেই তার অপর বন্ধুকে দিয়ে যেকোনো অঘটন ঘটাতে পারে। এ ব্যাপারে পুরুষের চাইতে মহিলারাই বেশি পারদর্শী এবং তারাই পুরুষের চাইতে বেশি নিজ বান্ধবী কর্তৃক প্রভাবিত হয়। একারণেই বন্ধু বান্ধব চয়ন করার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে। বন্ধু-বান্ধব যেন দ্বীনদার ও চরিত্রবান হয়। যাতে একে অপরকে নেক কাজে সহযোগিতা করতে পারে। কেউ গাফিল হলে অন্যজন তাকে নেক কাজে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। কেউ পথভ্রষ্ট হলে অন্যজন তাকে সতর্ক করতে পারে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ-

---

৪৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আস সুলামি আদ দারির আল বুগি আত তিরমিযি, *সুনানে তিরমিযী*, অনু : হুসাইন বিন সোহরাব (ঢাকা-হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী-২০১১), হাদীস নং- ১১৭১ (কিতাবুর রিদা)

মানুষ তার একান্ত বন্ধুর ধর্মই গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন একটু ভেবে দেখে যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে যাচ্ছে।[৪৬]

৮. বিলম্বে বিবাহ করা :

বিবাহ হচ্ছে বৈধ পন্থায় যৌন উত্তেজনা প্রশমনের একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং কেউ বিবাহ করতে বা বসতে দীর্ঘদিন বিলম্ব করলে সে স্বভাবতই তার অদম্য যৌন উত্তেজনা প্রশমনের বৈধ কোনো ক্ষেত্র না পাওয়ার দরুন তা অক্ষেত্রে অপচয় করতে পারে। এজন্যই রাসূল (স.) যুবকদেরকে দ্রুত বিবাহ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ-

হে যুবকরা! তোমাদের কেউ বিবাহ করতে সক্ষম হলে সে যেন দ্রুত বিবাহ করে নেয়। কারণ তা চক্ষুকে নিম্নগামী করে এবং লজ্জাস্থানকে করে পবিত্র। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন সাওম পালন করে। কারণ তা সত্যিই যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।[৪৭]

৯. অপর কোনো পুরুষ বা মহিলার সাথে যেকোনো ধরনের শৈথিল্য দেখানো :

উক্ত শৈথিল্য পোশাক- পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তা যেমন মহিলার ক্ষেত্রে হতে পারে তেমনিভাবে তা পুরুষের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে তা পুরুষের ক্ষেত্রে খুবই কম। কিন্তু কোনো মহিলা যদি আঁট, সাঁট, পাতলা, খাটো কিংবা জায়গায় জায়গায় খোলাও কারুকার্যময় পোশাক পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাহলে পুরুষরা স্বভাবতই তাকে লজ্জা ও চরিত্রহীনা মনে করে তার প্রতি অতিসত্বর ঝুঁকে পড়বে। তেমনিভাবে কোনো পুরুষও যদি ফাসিকের পোশাক পরিধান করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাহলে খারাপ মহিলারাও স্বভাবতই তার পিছু নিবে। উক্ত শিথিলতা আবার কখনো কখনো আচার-আচরণ এবং চলাফেরার ঢংয়ের মধ্যেও হতে পারে। তাতে করে মহিলাদের

৪৬. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৩৭৮
৪৭. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫০৬৫

প্রতি পুরুষদের সরল দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের সুপ্ত উত্তেজনা জেগে ওঠবে। তেমনিভাবে মহিলারাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের সুপ্ত উত্তেজনা জেগে ওঠবে।

আবার তা কখনো কখনো কথা-বার্তার ঢংয়েও হতে পারে। কারণ কোনো মহিলা অপর পুরুষের সাথে ইচ্ছাকৃত কোমল ও সুমিষ্ট এবং দীর্ঘ অপ্রয়োজনীয় আলাপ করলে স্বভাবতই পুরুষরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা মহিলাদেরকে পুরুষদের সাথে ইচ্ছাকৃত নরম কথা বলতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (স.) এর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا-

তোমরা যদি মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে থাকো তাহলে অন্য পুরুষের সাথে কথা বলতে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। তাহলে যার অন্তরে রোগ রয়েছে সে তোমাদের প্রতি প্রলুব্ধ হবে। তবে তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে।[৪৮]

১০. যত্রতত্র চোখের দৃষ্টিক্ষেপণ :

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষরা যেমন আদিষ্ট তেমনিভাবে মহিলারাও। কোনো যুবক-যুবতী যদি চরিত্রহীন বা চরিত্রহীনা হয়ে থাকে তাহলে এর মূলে রয়েছে যত্রতত্র দৃষ্টিক্ষেপণ।

এছাড়াও যৌনাঙ্গ রক্ষার পেছনে বাধা হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও গণ্য করা হয় :

যৌনকর্ম সম্পর্কীয় আলোচনা, গানের নেশা, খারাপ উপন্যাস ও খারাপ কবিতা পড়ার নেশা, শয়তানের কুমন্ত্রনার কাছে হারমানা, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, দীর্ঘ আশা ও দুনিয়ার ভালোবাসা, নিয়ন্ত্রনহীন সুখভোগ এবং সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের লাগাতার অবহেলা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'য়ালা শুধু যৌন কর্মকেই হারাম করেননি, বরং তিনি এরই পাশাপাশি সব ধরনের অশ্লীলতাকেও হারাম করেছেন।

---

৪৮. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩২

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلۡ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلۡإِثۡمَ وَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ-

হে মুহাম্মাদ! তুমি ঘোষণা করে দাও, নিশ্চয় আমার প্রভু হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য- অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতা, পাপকর্ম, অন্যায় বিদ্রোহ, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরীক করা; যে ব্যাপারে তিনি কোনো দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ তায়'ালা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ কিছু বলা।[৪৯]

আল্লাহ তা'য়ালা যখথন ব্যভিচার কর্মকে নিষেধ করে দিয়েছেন তখন তিনি সে সকল পথকেও নীতিগতভাবে রোধ করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে স্বভাবত ব্যভিচার কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতিকে লজ্জাস্থান হিফাযতের পূর্বে সর্ব প্রথম নিজ দৃষ্টিকে সংযত করতে আদেশ করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ - وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ-

হে মুহাম্মদ! তুমি মুমিনদেরকে বলে দাও যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য পবিত্র সর্বোত্তম মাধ্যম। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। তেমনিভাবে তুমি মুমিনদেরকে বলে তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে।[৫০]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ-

তিনিই চক্ষুর অপব্যহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত।[৫১]

---

৪৯. *আল কুরআন*, ৭ : ৩৩
৫০. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩০-৩১
৫১. *আল কুরআন*, ৪০ : ১৯

আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে অন্য কারোর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। যাতে চক্ষুর অপব্যবহার না হয় এবং তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ - فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ-

হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটাইতো তোমাদের জন্য অনেক শ্রেয়। আশাতো তোমরা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যদি তোমরা উক্ত গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তোমরা তাতে একেবারেই প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদেরকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে, ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাইতো তোমাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত।[৫২]

আল্লাহ তা'য়ালা বিশেষভাবে মহিলাদেরকে অপর পুরুষ থেকে পর্দা করতে আদেশ করেছেন। যাতে পুরষেরা লোভাতুর দৃষ্টি তার অপূর্ব সৌন্দর্যের উগ্র আকর্ষণ থেকে রক্ষা পায় এবং ক্রমান্বয়ে সে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত না হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ-

৫২. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৭-২৮

মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য (শরীরের সাথে এঁটে থাকা অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক) প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যায় (বোরকা, চাঁদর, মোজা ইত্যাদি) তা প্রকাশ পেলে কোনো অসুবিধা নেই। তারা যেন তাদের ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ চেহারাসহ) মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইপো, বোনপো, স্বজাতীয় মহিলা, মালিকানাধীনদাস, যৌনকামনা রহিতাধীন পুরুষ, নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো নিকট নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তেমনিভাবে তারা যেন সজোরে ভূমিতে নিজ পদযুগলক্ষেপণ না করা। কারণ তাতে করে তাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে, বরং হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ তা'য়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করো। তখনই তোমরা সফলকাম হতে পারবে।[৫৩]

কোনো ব্যক্তি চারটি অঙ্গকে সঠিক ও শরীয়ত সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সত্যিকারার্থে সে অনেকগুলো গোনাহ বিশেষভাবে ব্যভিচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। তেমনিভাবে ধার্মিকতাও অনেকাংশে রক্ষা পাবে। আর তা হচ্ছে-

১. চোখ ও দৃষ্টি শক্তি : তা রক্ষা করা লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার শামিল।

রাসূল (স.) বলেন,

غُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ-

তোমাদের চোখ নিম্নগামী করো এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করো।[৫৪]

হঠাৎ কোনো হারাম বস্তুর উপর চোখ পড়ে গেলে তা তড়িগড়ি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার কিংবা একদৃষ্টি ওদিকে তাকিয়ে রাখা যাবে না।

রাসূল (স.) হযরত আলী (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا عَلِيُّ! لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُوْلَى ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ -

৫৩. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১

৫৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আল রবঈ ইবনু মাজাহ আল কাযবীনী, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, অনু : মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা- আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১), কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং- ৩৭৪৯

হে আলী! বারবার দৃষ্টিক্ষেপণ করো না। কারণ হঠাৎ দৃষ্টিতে তোমার কোনো দোষ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই দোষের।[৫৫]

রাসূল (স.) হারাম দৃষ্টিকে যিনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তির হাত, পা, মুখ, কান, মনও ব্যভিচার করে থাকে। তবে মারাত্মক ব্যভিচার হচ্ছে লজ্জাস্থানের ব্যভিচার। যাকে বাস্তবার্থেই ব্যভিচার বলা হয়।

রাসূল (স.) বলেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ، وَالْفَمُ يَزْنِيْ فَزِنَاهُ الْقُبَلُ، وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الاِسْتِمَاعُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِيْ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ-

নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যিনার কিছু অংশ বরাদ্দ করে রেখেছেন। যা সে অবশ্যই করবে। চোখের যিনা হচ্ছে অবৈধভাবে কারোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপণ, মুখের যিনা হচ্ছে অশ্লীল কথোপকথন, হাতও ব্যভিচার করে, তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে হাত দিয়ে ধরা, পাও ব্যভিচার করে। তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে কোনো ব্যভিচার সংঘটনের জন্য রওয়ানা করা, মনও ব্যভিচারের কামনা-বাসনা করে। আর তখনই লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়িত করে অথবা করে না।[৫৬]

দৃষ্টিই সকল অঘটনের মূল। কারণ কোনো কিছু দেখার পরইতো তা মনে জাগে। মনে জাগলে তার প্রতি চিন্তা আসে। চিন্তা আসলে অন্তরে তাকে পাওয়ার কামনা-বাসনা জন্মে। কামনা-বাসনা জন্মিলে তাকে পাওয়ার খুবই ইচ্ছে হয়। দীর্ঘদিনের ইচ্ছে প্রতিজ্ঞারূপ ধারণ করে। আর তখনই কোনো কর্ম সংঘটিত হয়। **যদি পথিমধ্যে কোনো ধরনের বাধা না থাকে। দৃষ্টির কুফল হচ্ছে আফসোস, ঊর্ধ্বশ্বাস ও অন্তর জ্বালা। কারণ মানুষ যা চায় তার সবটুকুই সে কখনোই পায় না। আর তখনই তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।** অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দৃষ্টি হচ্ছে তীরের ন্যায়। অন্তরকে নাড়া দিয়েই তা লক্ষবস্তুতে পৌঁছায়। একেবারে শান্তভাবে নয়। আরো আশ্চর্যের কাহিনী এই যে, দৃষ্টি অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে

৫৫. সুনানে আবু দাউদ, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২১৪৯
৫৬. সুনানে আবু দাউদ, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২১৫২

দেয়। আর এ ক্ষতের ওপর অন্য ক্ষত (আবার তাকানো) সামান্যটুকু হলেও আরামপ্রদ। যার নিশ্চিত নিরাময় কখনোই সম্ভবপর নয়।

২. মন ও মনোভাব : এপর্যায় খুবই কঠিন। কারণ মানুষের মনই হচ্ছে ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র উৎস। মানুষের ইচ্ছা, স্পৃহা, আশা ও প্রতিজ্ঞা মনেরই সৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সে নিজ কুপ্রবৃত্তির ওপর বিজয় লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না নিশ্চিতভাবে কুপ্রবৃত্তির শিকার হবে। পরিশেষে তার ধ্বংস একেবারেই অনিবার্য।

মানুষের মনোভাবই পরিশেষে দুরাশার রূপ নেয়। মনের দিক থেকে সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যে দুরাশায় সন্তুষ্ট। কারণ দুরাশাই হচ্ছে সকল ধরনের আলস্য ও বেকারত্বেও পুঁজি। এটিই পরিশেষে লজ্জা ও আফসোসের মূলকারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুরাশাগ্রস্থ ব্যক্তি আলস্যের কারণে যখন বাস্তবতায় পৌঁছতেতে পারে না তখনই তাকে শুধু আশার ওপরই নির্ভর করতে হয়। মূলতঃ বাস্তববাদী হওয়াই একমাত্র সাহসীর পরিচয়।

মানুষের ভালোমনোভাব আবার চার প্রকার :

১. দুনিয়ার লাভার্জনের মনোভাব।

২. দুনিয়ার ক্ষতি থেকে বাঁচার মনোভাব।

৩. আখিরাতের লাভার্জনের মনোভাব।

৪. আখিরাতের ক্ষতি থেকে বাঁচার মনোভাব।

নিজ মনোভাবকে উক্ত চারের মধ্যে সীমিত রাখাই যেকোনো মানুষের একান্ত কর্তব্য। এ গুলোর যে কোনোটিই মনে জাগ্রত হলে তা অতি তাড়াতাড়ি কাজে লাগানো উচিৎ। আর যখন এগুলোর সবকটিই মনের মাঝে একত্রে জাগ্রত হয় তখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। যা এখনই না করলে পরে করা সম্ভবপর হবে না। কখনো এমন হয় যে, অন্তরে একটি প্রয়োজনীয় কাজের মনোভাব জাগ্রত হলো যা পরে করলেও চলে অথচ এরই পাশাপাশি আরেকটি এমন কাজের মনোভাবও অন্তরে জন্মালো যা এখনই করতে হবে। না করলে তা পরবীতে কখনোই করা সম্ভবপর হবে না। এক্ষেত্রে আপনাকে প্রয়োজনীয় বস্তুটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ কেউ অপরটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন যা শরীয়তের মৌলিকনীতি পরিপন্থী। তবে সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা ও মনোভাব

সেটিই যা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুটি কিংবা পরকালের জন্যই হবে। এছাড়া যত চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা হচ্ছে শয়তানের ওয়াসওয়াসা অথবা ভ্রান্ত আশা।

যে চিন্তা-ফিকির একামত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য তা আবার কয়েক প্রকার :

১. কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাতে নিহিত আল্লাহ তা'য়ালার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করা।

২. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নাম ও গুণাবলী, কৌশল ও প্রজ্ঞা, দান ও অনুগ্রহ বুঝতে চেষ্টা করবে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে মানুষকে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।

৩. মানুষের ওপর আল্লাহ তা'য়ালার যে অপার অনুগ্রহ রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। তাঁর দয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

উক্ত ভাবনাসমূহ মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার একান্ত পরিচয়, ভয়, আশা ও ভালোবাসার জন্ম দেয়।

৪. নিজ অন্তর ও আমলের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এরূপ চিন্তা-চেতনা খুবই কল্যাণকর বরং একে সকল কল্যাণের সোপানই বলা চলে।

৫. সময়ের প্রয়োজন ও নিজ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। সত্যিকার ব্যক্তিতো সেই যে নিজ সময়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, আমি সূফীদের নিকট মাত্র দুটি ভালো কথাই পেয়েছি। যা হচ্ছে তারা বলে থাকে, সময় তলোয়ারের ন্যায়। তুমি তাকে ভালোভাবে কাজে নিঃশেষ করবে। নতুবা সে তোমাকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত করবে। তারা আরো বলে, তুমি অন্তরকে ভালো কাজে লাগাবে। নতুবা সে তোমাকে খারাপ কাজেই লাগাবে। মনে কোনো চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক তা ভালো অথবা খারাপ যাই হোক না কেন দোষের নয়। বরং দোষ হচ্ছে খারাপ চিন্তা-চেতনাকে মনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ স্থান দেওয়া। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে দুটি চেতনা তথা প্রবৃত্তি দয়িে সৃষ্টি করেছেন। যার একটি ভালো অপরটি খারাপ। একটি সর্বদা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টিই কামনা করে। পক্ষান্তরে অন্যটি গায়রুল্লাহর সন্তুটি কামনা করে। ভালোটি অন্তরের ডানে অবস্থিত যা ফেরেশতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অপরটি অন্তরের বামে অবস্থিত যা শয়তান

কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। পরস্পরের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অব্যাহত। কখনো এর জয় আবার কখনো ওর জয়। তবে সত্যিকারের বিজয় ধারাবাহিক ধৈর্য, সতর্কতা ও আল্লাহভীরুতার ওপরই নির্ভরশীল। অন্তরকে কখনো খালি রাখা যাবে না। ভালো চিন্তা-চেতনা দিয়ে ওকে ভর্তি রাখতেই হবে। নতুবা খারাপ চিন্তা-চেতনা তাতে অবস্থান নিবেই। সূফীবাদীরা অন্তরকে কাশফের জন্য খালি রাখে বিধায় শয়তান সুযোগ পেয়ে তাতে ভালোর বেশে খারাপের বীজ বপন করে। সুতরাং অন্তরকে সর্বদা ধর্মীয় জ্ঞান ও হিদায়াতের উপকরণ দিয়ে ভর্তি রাখতেই হবে।

৩. মুখ ও বচন : কখনো অযথা কথা বলা যাবে না। অন্তরে কথা বলার ইচ্ছা জাগলেই চিন্তা করতে হবে, এতে কোনো ফায়দা আছে কিনা? যদি তাতে কোনো ধরনের ফায়দা না থাকে তাহলে সে কথা কখনো বলবে না। আর যদি তাতে কোনো ফায়দা থেকে থাকে তাহলে দেখবে এর চাইতে আরো লাভজনক কোনো কথা আছে কিনা? যদি থেকে থাকে তাহলে তাই বলবে, অন্যটা নয়। কারোর মনোভাব সরাসরি বুঝা অসম্ভব। তবে কথার মাধ্যমে তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিতে হয়।

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রহ.) বলেন, অন্তর হচ্ছে ডেগের ন্যায়। তাতে যা রয়েছে অথবা দেওয়া হয়েছে তাই রন্ধন হতে থাকবে। বাড়তি কিছু নয়। আর মুখ হচ্ছে চামচের ন্যায়। অন্য কিছু নয়। যেভাবে আপনি কোনো পাত্রে রাখা খাদ্যের স্বাদ জিহবা দিয়ে অনুভব করতে পারেন ঠিক তেমনিভাবে কারোর মনোভাব আপনি তার কথার মাধ্যমেই টের পাবেন। মন আপনার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রক ঠিকই। তবে সে আপনার কোনোকোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহযোগিতা ছাড়া যেকোনো কাজ সম্পাদন করতে পারে না। সুতরাং আপনার মন যদি আপনাকে কোনো খারাপ কথা বলতে বলে তখন আপনি আপনার জিহবার মাধ্যমে তার কোনো সহযোগিতা করবেন না। তখন সে নিজ কাজে ব্যর্থ হবে নিশ্চয় এবং আপনিও গুনাহ কিংবা তার অঘটন থেকে রেহাই পাবেন।
এজন্য রাসূল (স.) বলেন,

لاَ يَسْتَقِيْمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ قَلْبُهُ ، وَلاَ يَسْتَقِيْمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ-

কোনো বান্দার ঈমান ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক হয়। তেমনিভাবে কোনো বান্দার অন্তর ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার মুখ ঠিক হয়।[৫৭]

৫৭. ইমাদ আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ আহমাদ*, অনু : অনুবাদকমন্ডলী কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা : ইফাবা, প্রকাশকাল-২০০৮) হাদীস নং- ১৩০৪৮

সাধারণত মন, মুখ ও লজ্জাস্থানের মাধ্যমেই বেশি অঘটন ঘটায়। তাই রাসূল(স.) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কোন জিনিস সাধারণতঃ মানুষকে বেশির ভাগ জাহান্নামের সম্মুখীন করে? তখন তিনি বলেন,

الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

মুখ ও লজ্জাস্থান।[৫৮]

একদা রাসূল (স.) মুআয ইবনে জাবাল (রা.) কে জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সহযোগী আমল বলে দেওয়ার পর আরো কিছু ভালো আমলের কথা বলেন। এমনকি তিনি সকল ভালো কাজের মূল কান্ড ও চূড়া সম্পর্কে বলার পর বলেন,

أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟! قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟! فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِيْ النَّارِعَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ-

আমি কি তোমাকে এমন বস্তু সম্পর্কে বলবো যার ওপর এসবই নির্ভরশীল? আমি বললাম হে আল্লাহর নবী! আপনি দয়া করে তা বলুন। অতঃপর তিনি নিজ জিহবা ধরে বললেন, এটাকে তুমি অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাদেরকে কথার জন্যও কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, তোমার কল্যাণ হোক হে মুআয! একমাত্র কথার কারণেই বিশেষভাবে সে দিন মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৫৯]

অনেক সময় একটি মাত্র কথাই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত এমনকি তার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দেয়।

জুন্দাব ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: مَنْ ذَا الَّذِيْ يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ ، فَإِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ-

৫৮. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২০০৪
৫৯. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৬১৬

জনৈক ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'য়ালাও ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন, কে সে? যে আমার ওপর কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না। অতএব আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ওপর শপথকারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি ওকেই ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দিলাম।[৬০]

আবু হুরায়রা (রা.) উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَه-

সে সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! লোকটি এমন কথাই বলেছে যা তার দুনিয়া ও আখিরাত সবই ধ্বংস করে দিয়েছে।[৬১]

রাসূল (স.) আরো বলেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ-

বান্দা কখনো কখনো যাচাই বাছাই ছাড়াই এমন কথা বলে ফেলে যার দরুন সে জাহান্নামে এত দূর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয় যতদূর দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝের ব্যবধান।[৬২]

রাসূল (স.) আরো বলেন,

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ-

তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ তা'য়ালা তার ওপর অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছবে। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত কথার দরুনই কিয়ামত পর্যন্ত তারওপর তাঁর অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন।[৬৩]

উক্ত জটিলতার কারণেই রাসূল (স.) নিজ উম্মতকে সর্বদা ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

---

৬০. আল ইমাম আল হাফেজ হুজ্জাতুল ইসলাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জজ আল কুশিয়ারী আন-নায়সাবুরী, সহীহ মুসলিম, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনুদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০), হাদীস নং- ২৬২১

৬১. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৯০১

৬২. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬৪৭৭

৬৩. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৩১৯

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ-

যার আল্লাহ তা'য়ালা ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রয়েছে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।[৬৪]

সালফেসালেহীনগণ আজকের দিনটা ঠান্ডা কিংবা গরম এ কথা বলতেও অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ করতেন। এমনকি তাদের জনৈককে স্বপ্ন দেখার পর তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমাকে এখনো একথার জন্য আটকে রাখা হয়েছে যে, আমি একদা বলেছিলাম, আজ বৃষ্টির কতইনা প্রয়োজন ছিলো! অতএব, আমাকে বলা হলো তুমি এটা কীভাবে বুঝলে যে, আজ বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিলো? বরং আমিই আমার বান্দার কল্যাণ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত।

অতএব, জানা গেলো জিহবার কাজ খুবই সহজ। কিন্তু তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। সবার জানা উচিৎ যে আমাদের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ হচ্ছে। তা যত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হোক না কেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ-

মানুষ যাই বলুক না কেন তা লিপিব্ধ করার জন্য দুজন তৎপর প্রহরী (ফেরেশেতা) তার সাথেই রয়েছে।[৬৫]

মানুষ তার জিহবা সংক্রান্ত দুটি সমস্যায় সর্বদা ভুগতে থাকে। একটি কথার সমস্যা। অপরটি চুপ থাকার সমস্যা। কারণ অকথ্য উক্তিকারী গুনাহগার বক্তা শয়তান। আর সত্য কথা বলা থেকে বিরত ব্যক্তি গুনাহগার বোবা শয়তান।

৪. পদ ও পদক্ষেপ : অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে পদক্ষেপণ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি জায়েয কাজ একমাত্র নিয়্যাতের কারণেই সাওয়াবে রূপান্তরিত হয়।

উক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা সহজে একথাই বুঝতে পারলাম যে, কোনো ব্যক্তি তার চোখ, মন, মুখ ও পা সর্বদা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখলে তার থেকে কোনো গুনাহ বিশেষ করে ব্যভিচার কর্মটি কখনো প্রকাশ পেতে পারেনা। কারণ দেখলেইতো ইচ্ছে হয়। আর ইচ্ছে হলেইতো তা মুখ খুলতে মন চায়। আর তখনই তা অধীর আগ্রহে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

---

৬৪. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬০১৮ ও ৬০১৯
৬৫. *আল কুরআন*, ৫০ : ১৮

বিচ্যুতি তথা স্খলন যখন দুধরনেরই তথা পায়ের ও মুখের তাই আল্লাহ তা'য়ালা উভয়টিকে কুরআন মাজীদের মধ্যে একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

তিনি বলেন,

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا-

দয়ালু আল্লাহর বান্দা ওরাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে এ পৃথিবীতে। মূর্খরা যখন তাদেরকে (তাচ্ছিল্যভরে) সম্বোধন করে তখন তারা বলে তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।[৬৬]

যেমনিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা দেখাও ভাবাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ-

তিনি চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত।[৬৭]

ব্যভিচারের অপকার ও তার ভয়াবহতা

১. কোনো বিবাহিতা মহিলা ব্যভিচার করলে তার স্বামী, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মারত্মকভাবে লাঞ্ছিত হয়। জনসমক্ষে তারা আর মাথা উঁচু করে কথা বলতে সাহস পায় না।

২. কোনো বিবাহিতা মহিলার ব্যভিচারের কারণে যদি তার পেটে সন্তান জন্ম নেয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে অথবা জীবিত রাখা হবে। যদি তাকে হত্যাই করা হয় তাহলে দুটি গুনাহ একত্রেই করা হলো। আর যদি তাকে জীবিতই রাখা হয় এবং তার স্বামীর সন্তান হিসেবেই তাকে ধরে নেওয়া হয় তখন এমন ব্যক্তিকেই পরিবারভুক্ত করা হলো যে মূলতঃ সে পরিবারের সদস্য নয় এবং এমন ব্যক্তিকেই ওয়ারিশ বানানো হলো যে মূলতঃ ওয়ারিশ নয়। তেমনিভাবে সে এমন ব্যক্তির সন্তান হিসেবেই পরিচয় বহন করবে যে মূলতঃ তার পিতা নয়। আরো কতো কি?

৩. কোনো পুরুষ ব্যভিচার করলে তার বংশ পরিচয়ে গরমিল সৃষ্টি হয় এবং একজন পবিত্র মহিলাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

---

৬৬. *আল কুরআন*, ২৫ : ৬৩
৬৭. *আল কুরআন*, ৪০ : ১৯

৪. ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারীর ওপর দরিদ্রতা নেমে আসে এবং তার বয়স কমে যায়। তাকে লাঞ্ছিত হতে হয় এবং তারই কারণে সমাজে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ছড়ায়।

৫. ব্যভিচার ব্যভিচারীর অন্তরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং ধীরে ধীরে তাকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। তেমনিভাবে তার মধ্যে চিন্তা, ভয় ও আশঙ্কার জন্ম দেয়। তাকে ফেরেশতা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং শয়তানের নিকটবর্তী করে দেয়। সুতরাং অঘটনের দিক দিয়ে হত্যার পরেই ব্যভিচারের অবস্থান। যার দরুন বিবাহিতের জন্য এর শাস্তিও জঘন্য হত্যা।

৬. কোনো ঈমানদারের জন্য এ সংবাদ শ্রবণ করা সহজ যে, তার স্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু এ সংবাদ শ্রবণ করা তার জন্য অবশ্যই কঠিন যে, তার স্ত্রী কারোর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। সাদ ইবনে উবাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ اِمْرَأَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ-

আমি কাউকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে দেখলে তৎক্ষণাৎই আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।[৬৮]

উল্লিখিত উক্তিটি রাসূল (স.) এর কানে পৌঁছতেই তিনি বললেন,

أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّيْ ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ-

তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছো সা'দের আত্ম সম্মানবোধ দেখে? আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি আমার আত্ম সম্মানবোধ তার চেয়েও বেশি এবং আল্লাহ তা'য়ালার আরো বেশি। যার দরুন তিনি হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্লীলতাকে।[৬৯]

রাসূল (স.) আরো বলেন,

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَّزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ-

হে মুহাম্মাদ! এর উম্মতরা! আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি; আল্লাহ তা'য়ালার চাইতেও আর কারোর আত্ম সম্মানবোধ বেশি হতে পারে না। একারণেইতো তাঁর অসহ্য যে, তাঁর কোনো বান্দা অথবা বান্দী ব্যভিচার করবে।[৭০]

---

৬৮. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬৮৪৬ ও ৭৪১৬
৬৯. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১৪৯৯

ব্যভিচারের সময় ব্যভিচারী ও ব্যভিচাররিণীর ঈমান সঙ্গে থাকে না। আবু হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ؛ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ-

যখন কোনো পুরুষ ব্যভিচার করে তখন তার ঈমান তার অন্তর থেকে বের হয়ে মেঘের ন্যায় তার ওপরে চলে যায়। অতঃপর যখন সে ব্যভিচার কর্ম সম্পাদন করে ফেলে তখন আবারো তার ঈমান তার নিকট ফিরে আসে।[৭১]

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْـخَمْرَ نَزَعَ اللهُ مِنْهُ الْإِيْمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيْصَ مِنْ رَأْسِهِ-

যে ব্যক্তি ব্যভিচার অথবা মদ পান করলো আল্লাহ তা'য়ালা তার ঈমান ছিনিয়ে নিবেন যেমনিভাবে কোনো মানুষ তার জামা নিজ মাথার ওপর থেকে খুলে নেয়।[৭২]

৮. ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর ঈমানে ঘাটতি আসে।

আবু হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

لاَ يَزْنِيْ الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ-

ব্যভিচার যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদপানকারীযখন মদ পান করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দেওয়া হয়।[৭৩]

৯. ব্যভিচারের প্রচার-প্রসার কিয়ামতের অন্যতম আলামত।

রাসূল (স.) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا-

---

৭০. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১০৪৪
৭১. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৬৯০
৭২. সুনানে ইবনে মাজাহ, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪০০৭
৭৩. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৬৮৯

কিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। মূর্খতা ছেয়ে যাবে (প্রকাশ্যে) মদ্যপান করা হবে এবং প্রকাশ্যে ব্যভিচার সংঘটিত হবে।[৭৪]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِيْ قَرْيَةٍ إِلاَّ أَذِنَ اللهُ بِإِهْلاَكِهَا-

কোনো এলাকায় সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তা'য়ালা তখন সে জনপদের জন্য ধ্বংসের অনুমতি দিয়েদেন।

১০ ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোনো দন্ড বিধিতে নেই। যা নিম্নরূপ :

ক. বিবাহিত ব্যভিচারীরর শাস্তি তথা হত্যা খুব ভয়ানকভাবেই প্রয়োগ করা হয়। এমনকি অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি কমানো হলেও তাতে দুটি শাস্তি একত্রেই থেকে যায়। বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শারীরিক শাস্তি এবং দেশান্তরের মাধ্যমে মানসিক শাস্তি।

খ. আল্লাহ তা'য়ালার শাস্তি দিতে গিয়ে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর প্রতি দয়া করতে নিষেধ করেছেন।

গ. আল্লাহ তা'য়ালা এর শাস্তি জনসমক্ষে দেওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। লুক্কায়িতভাবে নয়।

১১. ব্যভিচার থেকে দ্রুত তাওবা করে খাঁটি নেক আমল বেশি বেশি করতে না থাকলে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর খারাপ পরিণামের বিপুল আশঙ্কা থাকে। মৃত্যুর সময় তাদের ঈমান নসীব নাও হতে পারে। কারণ বারবার গুনাহ করতে থাকা ভালো পরিণামের বিরাট অন্তরায়। বিশেষ করে কঠিন প্রেম ও ভালোবাসার ব্যাপারগুলো এমনই।

প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা রয়েছে, জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় কালেমা পড়তে বলা হলে সে বলে

أَيْنَ الطَّرِيْقُ إِلَى حَمَّامِ مِنْجَاب-

মিনজাবের গোসলখানায় কীভাবে যেতে হবে, কোন পথে? এর ঘটনায় বলা হয়, জনৈক ব্যক্তি তার ঘরের দরজায় দাঁড়ানো ছিলো। এমতাবস্থায় তার পাশ দিয়ে জনৈকা সুন্দরী মহিলা যাচ্ছিলো।

৭৪. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৮০

মহিলাটি তাকে মিনজাব গোসলখানার পথ জিজ্ঞাসা করলে সে তার ঘরের দিকে ইশারা করে বললো, এটিই মিনজাব গোসলখানা। অতঃপর মহিলাটি তার ঘরে ঢুকলে সেও তার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলো। মহিলাটি যখন দেখলো সে অন্যের ঘরে এবং লোকটি তাকে ধোকা দিয়েছে তখন সে তার প্রতি খুশি প্রকাশ করে বললো, তোমার সঙ্গে একত্রিত হতে পেরে আমি খুবই ধন্য। সুতরাং কিছু খাবার-দাবার ও আসবাবপত্র জোগাড় করা প্রয়োজন যাতে করে আমরা উভয় একত্রে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। দ্রুত লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র খরিদ করে আনলো। ফিরে এসে দেখলো, মহিলাটি ঘরে নেই, সে ভুলবশতঃ ঘরে তালা লাগিয়ে যায়নি। অথচ মহিলাটি যাওয়ার সময় ঘরের কোনো আসবাবপত্র সঙ্গে নেয়নি।

তখন লোকটি আধপাগল হয়ে গেলো এবং গলিতে গলিতে এবলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

يَا رُبَّ قَائِلَةٍ يَوْماً وَقَدْ تَعِبَتْ   كَيْفَ الطَّرِيْقُ إِلَى حَمَّامِ مِنْجَابِ

হে অমুক! যে একদা ক্লান্তহয়ে বলেছিলে, মিনজাবের গোসলখানায় কীভাবে যেতে হয়, কোন পথে? একদা সে উক্ত ছন্দটি বলে বেড়াতে লাগলো এমন সময় জনৈকা মহিলা ঘরের জানালা দিয়ে প্রত্যুক্তি করে বললো,

هَلاَّ جَعَلْتَ سَرِيْعاً إِذْ ظَفِرْتَ بِهَا   حِرْزاً عَلَى الدَّارِ أَوْ قُفْلاً عَلَى الْبَابِ

কেন তুমি তাকে পাওয়ার সাথে সাথে দ্রুত দরজা বন্ধ করে ফেলোনি অথবা ঘরে তালা লাগিয়ে যাওনি? তখন তার চিন্তা আরো বেড়ে যায় এবং প্রথমোক্ত ছন্দ বলতে বলতেই তার মৃত্যু হয়। নাঊযুবিল্লাহ।

১২. কোনো জাতির মধ্যে ব্যভচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার তাদের ওপর আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপক আযাব নিপতিত হওয়ার এক বিশেষ কারণ।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَا ظَهَرَ فِيْ قَوْمٍ الزِّنَا أَوِ الرِّبَا إِلاَّ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ-

কোনা জাতির মধ্যে ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটলে তারা নিজেরাই যেন হাতে ধরে তাদের ওপর আল্লাহ তা'য়ালার আযাব নিপতিত করলো।[৭৫]

---

৭৫. *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৪০২

মাইমুনা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا ، فَإِذَا فَشَا فِيْهِمْ وَلَدُ الزِّنَا؛ فَأَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ-

আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণের ওপর থাকবে যতক্ষণ না তাদের মধ্যে জারজ সন্তানের আধিক্য দেখা না দিবে। যখন তাদের মধ্যে জারজ সন্তান বেড়ে যাবে তখনই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ব্যাপক আযাব দিবেন।[৭৬]

ব্যভিচারের স্তর বিন্যাস

১. অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার। এতে মেয়েটির সম্মান হানি ও চরিত্র নষ্ট হয়। কখনো কখনো ব্যাপারটি সন্তান হত্যা পর্যন্ত পৌঁছায়।

২. বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু স্বামীর সম্মানও বিনষ্ট হয়। তার পরিবার ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছায়। তার বংশ পরিচয়ে ব্যাঘাত ঘটে। কারণ সন্তানটি তারই বলে বিবেচিত, অথচ সন্তানটি মূলতঃ তার নয়। যেন এমন ঘটনা ঘটতেই না পারে সেজন্য রাসূল (স.) স্বামী অনুপস্থিত এমন মহিলার বিছানায় বসা ব্যক্তির এক ভয়ানক রূপ চিত্রায়ন করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْ يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْـمُغِيْبَةِ مَثَلُ الَّذِيْ يَنْهَشُهُ أَسْوَدُ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

যে ব্যক্তি স্বামী অনুপস্থিত এমন কোনো মহিলার বিছানায় বসে তার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে কিয়ামরে দিন কোনো বিষাক্ত সাপ দংশন করে।[৭৭]

৩. যেকোনো প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু প্রতিবেশীর অধিকারও বিনষ্ট হয় এবং তাকে চরম কষ্ট দেওয়া হয়।

মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

---

৭৬. *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং ২৪০০

৭৭. *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৪০৫

لَأَنْ يَّزْنِـيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَّزْنِـيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ-

সাধারণ দশটি মহিলার সাথে ব্যভিচার করা এতো ভয়ঙ্কও নয় যতো ভয়ঙ্কও নিজ প্রতিবেশী স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।[৭৮]

রাসূল (স.) আরো বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الْـجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৭৯]

৪. যে প্রতিবেশী সালাতের জন্য অথবা ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য কিংবা জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার।

বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْـمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْـمُجَاهِدِيْنَ فِيْ أَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنُّكُمْ؟

মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা লোকদের নিকট তাদের মায়েদের সম্মানের মতো। কোনো ঘরে বসে থাকা ব্যক্তি যদি কোনো মুজাহিদ পুরুষের পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে তাদের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে আমানতের খিয়ানত করে তখন তাকে মুজাহিদ ব্যক্তির প্রাপ্য আদায়ের জন্য কিয়ামতের দিন দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। অতঃপর মুজাহিদ ব্যক্তি ঘরে বসা ব্যক্তির আমল থেকে যা মনে চায় নিয়ে নিবে। রাসূল (স.) বলেনতোমাদের কি এমন ধারণা হয় যে, তাকে এতোটুকু সুযোগ দেওয়ার পরও সে এ প্রয়োজনের দিনে ওর সব আমল না নিয়ে ওর জন্য একটুখানি রেখে দিবে?[৮০]

৫. আত্মীয় মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু আত্মীয়তার বন্ধনও বিনষ্ট করা হয়।

৬. মাহরাম (যে মহিলাকে বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে চিরতরের জন্য হারাম) মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু মাহরামের অধিকারও বিনষ্ট করা হয়।

---

৭৮. *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৪০৪
৭৯. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং-১৮৯৭
৮০. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১০৭

৭. বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এজন্যই যে, তার উত্তেজনা প্রশমনের জন্যতো তার স্ত্রীই রয়েছে। তবুও সে ব্যভিচার করে বসলো।

৮. বুড়ো ব্যক্তির ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এজন্যই যে, তার উত্তেজনা তেমন আর উগ্র নয়। তবুও সে ব্যভিচার করে বসলো।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَـهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ-

তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে গোনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, তাদেরকে দয়ার দৃষ্টিতেও তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি এবং অহঙ্কারী গরীব।

৯. মর্যাদাপূর্ণ মাস, স্থান ও সময়ের ব্যভিচার। এতে উপরন্তু উক্ত মাস, স্থান ও সময়ের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। কোনো ব্যক্তি শয়তানের ধোকায় পড়ে ব্যভিচার করে ফেললে এবং তা কেউ জানলে অথবা বিচারকের নিকট তা পৌঁছলে তার উচিৎ হবে যে, সে তা লুকিয়ে রাখবে এবং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কায়মনো বাক্যে খাঁটি তাওবা করে নিবে। অতঃপর বেশি বেশি নেক আমল করবে এবং খারাপ জায়গা ও সাথী থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَهُوَ ٱلَّذِي يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَعۡفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ-

তিনিই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সমূহ পাপ মোচন করেন। আর তোমরা যা করো তাও তিনি জানেন।[৮১]

উক্ত কারণেই মায়িয ইবন মালিক (রা.) যেখন রাসূল (স.) এর নিকট বারবার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করছিলেন তখন রাসূল (স.) তার প্রতি এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করেন নি। চারবারের পর তিনি তাকে এও বললেন, হয়তোবা তুমি তাকে চুমু দিয়েছো, ধরছো কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো। কারণ এতে করে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট খাঁটি তাওবা করার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন।

---

৮১. *আল কুরআন*, ৪২ : ২৫

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَى رَسُوْلَ اللهِ (صلعم) رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ فِيْ الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُوْلُ اللهِ (صلعم) فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ أُحْصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ (صلعم) : اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ-

রাসূল (স.) এর নিকট জনৈক মুসলিম আসলো। তখনো তিনি মসজিদে। অতঃপর সে রাসূল (স.) কে ডেকে বললো হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার কওে ফেলেছি। রাসূল (স.) তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে অন্যদিকে তাঁর চেহারা মুবারক ঘুড়িয়ে নিলেন।

সে রাসূল (স.) এর চেহারা বরাবর এসে আবারো বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি। রাসূল (স.) তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে অন্যদিকে তাঁর চেহারা মুবারক ঘুড়িয়ে নিলেন। এমনকি সে উক্ত স্বীকারোক্তি চারচার বার করলো। যখন সে নিজের ওপর ব্যভিচাররের সাক্ষ্য চারচার বার দিয়েছে তখন রাসূল (স.) তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি পাগল? সে বললো না। রাসূল (স.) বললেন, তুমি কি বিবাহিত? সে বললো জী হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (স.) সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা একে নিয়ে যাও এবং রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করো।[৮২]

বুরাইদা (রা.) এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স.) মায়িয ইবনে মালিক (রা.) কে বলেছিলেন,

وَيْحَكَ! اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ-

আহ! তুমি ফিরে যাও। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ক্ষমা চাও এবং তাঁর নিকট তাওবা করে নাও।[৮৩]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَبِيِّ (صلعم) قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ، قَالَ: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ!-

যখন মায়িয ইবন মালিক (রা.) রাসূল (স.) এর নিকট আসলো তখন তিনি তাকে বললেন, হয়তোবা তুমি তাকে চুমু দিয়েছো, ধরেছো কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো। সে বললো, না, হে আল্লাহর রাসূল![৮৪]

---

৮২. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫২৭১
৮৩. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৬৯৫

তবে বিচারকের নিকট ব্যাপারটি (সাক্ষ সবুতের মাধ্যমে) পৌঁছলে অবশ্যই তাকে বিচার করতে হবে। তখন আর কারোর ক্ষমা ও সুপারিশের কোনো সুযোগ থাকে না।

এ কারণেইতো রাসূল (স.) সাফওয়ান ইবন উমাইয়াহকে চোরের জন্য সুপারিশ করতে চাইলে তাকে বললেন,

هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ؟!-

আমার নিকট আসার পূর্বেই কেন তা করলে না।[৮৫]

তেমনিভাবে উসামা (রা.) জনৈকা কুরাইশী চুন্নি মহিলার জন্য সুপারিশ করতে চাইলে রাসূল (স.) তাকে অত্যন্ত রাগতস্বরে বললেন,

يَا أُسَامَةُ! أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟-

হে উসামা! তুমি কি আল্লাহ তা'য়ালার দন্ড বিধির ব্যাপারে সুপারিশ করতে আসলে?[৮৬]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

تَعَافَوْا الْـحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ ، فَمَا بَلَغَنِيْ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَب-

তোমরা দন্ড বিধি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো একে অপরকে ক্ষমা করো। কারণ, আমার নিকট এর কোনো একটি পৌঁছলে তা প্রয়োগ করা আমার ওপর আবশ্যক হয়ে যাবে।[৮৭]

একথা মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র তিনটি পদ্ধতিতেই কারোর ওপর ব্যভিচারের দোষ প্রমাণিত হয়। যা নিম্নরূপ :

১. ব্যভিচারী একবার অথবা চারবার ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করলে। কারণ জুহাইনী মহিলা ও উনাইস (রা.) এর রজমকৃতা মহিলা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি একবারই করেছিলো। অন্যদিকে মায়িয ইবনে মালিক (রা.) রাসূল (স.) এর নিকট চারবার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেছিলেন। কিন্তু সংখ্যার ব্যাপারে হাদীসটির বর্ণনাসমূহ মুযতারিব তথা এককথার নয়। কোনো কোনো বর্ণনায় চারচারবারের কথা। কোনো কোনো বর্ণনায় তিনতিন বারের কথা। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় দুদুবারের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

---

৮৪. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং ৬৮২৪
৮৫. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৩৯৪
৮৬. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬৭৮৮
৮৭. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৩৭৬

তবুও চারচারবার স্বীকারোক্তি নেওয়াই সর্বোত্তম।

কারণ হতে পারে স্বীকারোক্তিকারী এমন কাজ করেছে যাতে সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। যা বারাবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। আর একথা সবারই জানা যে, ইসলামী দন্ড বিধি যেকোনো যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ কিংবা অজুহাতের কারণে রহিত হয় এবং যা উমার (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ থেকেও বর্ণিত। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যেরও দাবি করেছেন। তেমনিভাবে চারচারবার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ব্যভিচারীকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তাওবা করারও সুযোগ দেওয়া হয়। যা একান্তভাবেই কাম্য।

তবে স্বীকারোক্তির মধ্যে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং দন্ড বিধি প্রয়োগ পর্যন্ত স্বীকারোক্তির ওপর স্বীকারকারী অটল থাকতে হবে। অতএব কেউ যদি এর আগেই তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তার কথাই তখন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তেমনিভাবে স্বীকারকারী জ্ঞানসম্পন্নও হতে হবে।

২. ব্যভিচারের ব্যাপারে চারচারজন সত্যবাদী পুরুষ এ বলে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিলে যে, তারা সত্যিকারার্থেই ব্যভিচারী ব্যক্তির সঙ্গমকর্ম স্বচক্ষে দেখেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ-

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ ব্যভিচার করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারচারজন সাক্ষী সংগ্রহ করো।[৮৮]

৩. কোনো মহিলা গর্ভবতী হলে; অথচ তার কোনো স্বামী নেই। উমার (রা.) তার যুগে এমন একটি বিচারে রজম করেছেন। তবে এ প্রমাণ যেহেতু কোনো মহিলার ওপর দন্ড বিধি প্রয়োগ করতেই হবে ব্যাপারটি এমন নয়। এজন্য যে, গর্ভটি সন্দেহবশত সঙ্গমের কারণেও হতে পারে অথবা ধর্ষণের কারণেও। এমনকি মেয়েটি গভীর নিদ্রায় থাকাস্থায়ও তার সঙ্গে উক্ত ব্যভিচারকর্মটি সংঘটিত হতে পারে। তাই উমার (রা.) তাঁর যুগেই শেষোক্ত দুটি অজুহাতে দুজন মহিলাকে শাস্তি দেন নি। তবে কোনো মেয়ে যদি গর্ভবতী হয়; অথচ তার কোনো স্বামী নেই এবং সে এমন কোনো যুক্তিসঙ্গত

৮৮ *আল কুরআন*, ৪ : ১৫

অজুহাতও দেখাচ্ছে না যার দরুন দন্ড বিধি রহিত হয় তখন তার ওপর ব্যভিচারের উপযুক্ত দন্ড বিধি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উমার (রা.) একদা তাঁর এক সুদীর্ঘ খুৎবায় বলেন,

وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنْ زَنَى ، إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوِ الإِعْتِرَافُ-

নিশ্চয় রজম আল্লাহ তা'য়ালার বিধানে এমন পুরুষ ও মহিলার জন্যই নির্ধারিত যারা ব্যভিচার করেছে; অথচ তারা বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমেই ইতোপূর্বে নিজ স্ত্রী অথবা স্বামীর সাথে সম্মুখ পথে সঙ্গম করেছে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়জনই তখন ছিলো প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্বাধীন যখন ব্যভিচারের উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ মিলে যায় অথবা মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় অথবা ব্যভিচারী কিংবা ব্যভিচারিণী ব্যভিচারের ব্যাপারে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেয়।[৮৯]

ব্যভিচারের শাস্তি

কেউ শয়তানের ধোকায় পড়ে ব্যভিচার করে ফেলে সে যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে একশটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর যদি বিবাহিত হয় তাহলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ-

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী; তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ করে বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে যদি তোমরা আল্লাহ তা'য়ালা ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো এবং মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[৯০]

---

৮৯. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬৮২৯
৯০. *আল কুরআন*, ২৪ : ২

আবু হুরায়রা ও যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفاً عَلَى هٰذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالُوْا لِيْ: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِيْ مِنْهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ (صلعم) : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ! فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا-

জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল (স.) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে কুরআনের ফয়সালা করুন। তার প্রতিপক্ষও দাঁড়িয়ে বললো, সে সত্য বলেছে। আপনি আমাদের মাঝে কুরআনের ফয়সালা করুন। তখন বেদুঈন ব্যক্তিটি বললো, আমার ছেলে এ লোকটির নিকট কামলা খাটতো। ইতোমধ্যে সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। সবাই আমাকে বললো, তোমার ছেলেটিকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। তখন আমি আমার ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নেই এ লোকটিকে একটি বান্দী ও একশটি ছাগল দিয়ে। অতঃপর অত্র এলাকার আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, তোমার ছেলেকে একশটি বেত্রাঘাত ও একবছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। এরপর নবী (স.) বললেন, আমি তোমাদের মাঝে কুরআনের বিচার করছি, বান্দী ও ছাগলগুলো তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমার ছেলেটিকে একশটি বেত্রাঘাত ও একবছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে।

আর হে উনাইস! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও। অতঃপর তাকে রজম করো। অতএব উনাইস তার নিকট গেলো। অতঃপর তাকে রজম করলো।[৯১]

উবাদা ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

خُذُوْا عَنِّيْ، خُذُوْا عَنِّيْ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ-

৯১. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৬৯৫, ২৬৯৬

তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা দিয়েছেন তথা বিধান অবতীর্ণ করেছেন। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর শাস্তি হচ্ছে একশটি বেত্রাঘাত ও একবছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার শাস্তি হচ্ছে একশটি বেত্রাঘাত ও রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা।[৯২]

উক্ত হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাকে একশটি বেত্রাঘাত করার কথা থাকলেও তা করতে হবে না। কারণ রাসূল (স.) মায়িয ও গামীদি মহিলাকে একশটি করে বেত্রাঘাত করেননি। বরং অন্য হাদীসে তাদেরকে শুধু রজম করারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকটি হচ্ছে, শরীয়তের সাধারণ নিয়ম হলো-কারোর ওপর কয়েকটি দন্ড বিধি একত্রিত হলে এবং তার মধ্যে হত্যার বিধানও থাকলে তাকে শুধু হত্যাই করা হবে। অন্যগুলো করা হয় না। উমার ও উসমান (রা.) তারা এটির ওপরই আমল করেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকেও তাবর্ণিত হয়েছে। তবে আলী (রা.) তার যুগে জনৈক ব্যক্তিকে রজমও করেছেন এবং বেত্রাঘাতও। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, উবাই ইবন কাব এবং আবু যরও একমত পোষণ করেন।

ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত. তিনি বলেন,

أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّيْ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى-

একদা জনৈকা জুহানী মহিলা রাসূল (স.) এর নিকট আসলো। তখন সে ব্যভিচার করে গর্ভবতী। সে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমি ব্যভিচারের শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। অতএব আপনি আমার ওপর প্রয়োগ করুন। অতঃপর রাসূল (স.) তার অভিভাবককে ডেকে বললেন, এর ওপর একটু দয়া করো। এ যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। লোকটি তাই করলো। অতঃপর রাসূল (স.) আদেশ করলে তার কাপড় শরীরের সাথে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো।

৯২. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং ১৬৯০

এরপর তাকে রজম করা হলে রাসূল (স.) তার জানাযার সালাত পড়ান। উমার (রা.) রাসূল (স.) কে আশ্চর্যান্বিত স্বরে বললেন, আপনি এর জানাযার সালাত পড়াচ্ছেন; অথচ সে ব্যভিচারিণী? রাসূল (স.) বললেন, সে এমন তাওবা করেছে যা মদীনাবাসীর সত্তর জনকে বন্টণ করে দেওয়া হলেও তাদের যথেষ্ট হবে। তুমি এর চাইতেও কি উৎকৃষ্ট কোনো কিছু পেয়েছো যে তার জীবন স্বেচ্ছায় আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিয়েছে?[৯৩]

উমার (রা.) একদা তার এক সুদীর্ঘ খুৎবায় বলেন,

إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَّقُوْلَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِيْ كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ-

নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা মুহাম্মাদ (স.) কে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিলো। আমরা তা পড়েছি, মুখস্থ করেছি ও বুঝেছি। অতঃপর রাসূল (স.) রজম করেছেন এবং আমরাও তাঁর ইন্তেকালের পর রজম করেছি। আশঙ্কা হয় বহুকাল পর কেউ বলবে, আমরা কুরআন মাজীদে রজম পাইনি। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একটি ফরয কাজ ছেড়ে পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[৯৪]

কোনো অবিবাহিত ব্যভিচারী কিংবা ব্যভিচারিণী যদি এমন অসুস্থ বা দুর্বল হয় যে, তাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একশটি বেত্রাঘাত করা হলে তার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে তাহলে তাকে একশটি বেত একত্র করে একবার প্রহার করা হবে।

সাঈদ ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ فِيْ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيْفٌ ، فَخَبُثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعِيْدٌ لِرَسُوْلِ اللهِ (صلعم) ، فَقَالَ: اِضْرِبُوْهُ حَدَّهُ ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: خُذُوْا عِثْكَالاً فِيْهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوْهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَفَعَلُوْا-

৯৩. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৬৯৬
৯৪. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬৮২৯

আমাদের এলাকায় জনৈক দুর্বল ব্যক্তি বসবাস করতো। হঠাৎ সে জনৈকা বান্দির সাথে ব্যভিচার করে বসে। ব্যাপারটি সাঈদ (রা.) রাসূল (স.) কে জানালে তিনি বললেন, তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে দাও তথা একশটি বেত্রাঘাত করো। উপস্থিত সকলে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সেতো তা সহ্য করতে পারবে না। তখন রাসূল (স.) বললেন, একটি খেজুরবিহীন একশটি শাখা গুচ্ছ বিশিষ্ট থোকা নিয়ে তাকে তা দিয়ে একবার মারবে। অতএব তারা তাই করলো।[৯৫]

অমুসলিমকেও ইসলামী বিচারাধীন রজম করা যেতে পারে।

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَجَمَ النَّبِيُّ (صلعم) رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ ، وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ وَامْرَأَةً-

নবী (স.) আসলাম বংশের একজন পুরুষকে এবং একজন ইয়াহুদী পুরুষ ও একজন মহিলাকে রজম করেন।[৯৬]

ব্যভিচারের কারণে কোনো সন্তান জন্ম নিলে এবং ভাগ্যক্রমে সে জীবনে বেঁচে থাকলে তার মায়ের সন্তানরূপেই সে পরিচয় লাভ করবে। বাপের সন্তানরূপে নয়। কারণ তার কোনো বৈধ বাপ নেই। অতএব ব্যভিচারীর পক্ষ থেকে সে কোনো মিরাস পাবে না।

আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ-

সন্তান মহিলারই এবং ব্যভিচারীর জন্য শুধু পাথর তথা রজম।[৯৭]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَا، لاَ يَرِثُ وَلاَ يُوْرَثُ-

যে ব্যক্তি কোনো বান্দী অথবা স্বাধীন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলো তার সন্তান হবে ব্যভিচারের সন্তান। সে মিরাস পাবে না এবং তার মিরাসও কেউ পাবে না।[৯৮]

যেকোনো ঈমানদার পবিত্র পুরুষের জন্য কোনো ব্যভিচারিণী মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। তেমনিভাবে যেকোনো ঈমানদার সতী মেয়ের জন্যও কোনো ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা হারাম।

---

৯৫. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৬২২
৯৬. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৭০১
৯৭. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২০৫৩, ২২১৮
৯৮. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৭৯৪

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ-

একজন ব্যভিচারী পুরুষ আরেকজন ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিকা মেয়েকেই বিবাহ করে এবং একজন ব্যভিচারিণী মেয়েকে আরেকজন ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিকই বিবাহ করে। মুমিনদের জন্য তা করা হারাম।[৯৯]

দন্ডবিধি সংক্রান্ত কিছু কথা

কাউকে লুক্কায়িতভাবে ব্যভিচার কিংবা যেকোনো হারাম কাজ করতে দেখলে তা তড়িঘড়ি বিচারককে না জানিয়ে তাকে ব্যক্তিভাবে নসীহত করা ও পরকালে আল্লাহ তা'য়ালার কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো উচিত।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ-

কোনো মুসলমানের দোষ লুকিয়ে রাখলে আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ লুকিয়ে রাখবেন।[১০০]

দন্ডবিধি প্রয়োগের সময় চেহারার প্রতি লক্ষ্য রাখবে

কারোর ওপর শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো দন্ড বিধি প্রয়োগ করার সময় তার চেহারার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ-

কেউ কাউকে (দন্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে) মারলে তার চেহারার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যাতে তা আঘাত প্রাপ্ত না হয়।[১০১]

যেকোনো দন্ডবিধি মসজিদে প্রয়োগ করা যাবে না।আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

لاَ تُقَامُ الْـحُدُوْدُ فِيْ الْـمَسَاجِدِ-

মসজিদে কোনো দন্ডবিধি কায়েম করা যাবে না।[১০২]

---

৯৯. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩

১০০. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৪২৫

১০১. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫৫৯

১০২. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৬৪৮

হাকীম ইবন হিযাম (রা.) থেকি বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِيْ الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ-

রাসূল (স.) মসজিদে কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতে, কবিতা আবৃত্তি করতে ও দন্ডবিধি কায়েম করতে নিষেধ করেছেন।[১০৩]

দুনিয়াতে কারোর ওপর শরীয়তের কোনো দন্ডবিধি কায়েম করা হলে তা তার জন্য কাফফারা হয়ে যায় তথা তার অপরাধটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। পরকালে এজন্য তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না।

উবাদাহ ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا، فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوْبَتُهُ ؛ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَإِلاَّ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ-

যে ব্যক্তি (শয়তানের ধোকায় পড়ে) এমন কোনো হারাম কাজ করে ফেলেছে যাতে শরীয়তের নির্দিষ্ট কোনো দন্ডবিধি রয়েছে। অতঃপর তাকে দুনিয়াতেই সে দন্ড দেওয়া হয়েছে। তখন তা তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যদি তা তার ওপর প্রয়োগ না করা হয় তাহলে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালাই ভালো জানেন। চায়তো আল্লাহ তা'য়ালা তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন নয়তোবা ক্ষমা করে দিবেন।[১০৪]

কোনো এলাকায় ইসলামের যেকোনো দন্ডবিধি একবার প্রয়োগ করা সে এলাকায় চল্লিশদিন যাবৎ বারি বর্ষণ থেকেও অনেক উত্তম।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِيْ الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُّمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا-

বিশ্বের বুকে ধর্মীয় কোনো দন্ডবিধি প্রয়োগ করা তা বিশ্ববাসীদের জন্য অনেক উত্তম চল্লিশদিন লাগাতার বারি বর্ষণ থেকেও।[১০৫]

---

১০৩. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৪৯০
১০৪. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৪৩৯
১০৫. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৫৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমকাম বা পায়ুগমন

সমকাম বা পায়ুগমন বলতে পুরুষে পুরুষে একে অপরের মলদ্বার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ যৌন উত্তেজনা নিবারণ করাকেই বুঝানো হয়। সমকাম একটি মারাত্মক গুনাহের কাজ। যার ভয়াবহতা কুফরের পরই। হত্যার চাইতেও মারাত্মক। বিশ্বে সর্বপ্রথম লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ই একাজে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করেন যা ইতোপূর্বে কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ঘর বাড়ি তাদের ওপরই উল্টিয়ে ভূমিতে তলিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ- إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ-

আর আল্লাহ তা'য়ালা লূত (আ.) কে নবুওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন। যিনি তার সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কি এমন মারাত্মক অশ্লীল কাজ করছো যা ইতোপূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা স্ত্রী লোকদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ কর্তৃক যৌন উত্তেজনা নিবারণ করছো। প্রকৃত পক্ষে তোমরা হচ্ছো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।[১০৬]

আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত কাজকে অত্যন্ত নোংরা কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَٰٓئِثَۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ-

আর আমরা লূতকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছি এবং তাকে উদ্ধার করেছি এমন জনপদ থেকে যারা নোংরা কাজ করতো। মূলত তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির ফাসিক সম্প্রদায় ছিলো।[১০৭]

আল্লাহ তা'য়ালা অন্য আয়াতে সমকামীদেরকে যালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ-

ফিরিশতারা ইবরাহীম (আ.) কে বললেন, আমরা এক জনপদবাসীকে ধ্বংস করে দেবো। এর অধিবাসীরা নিশ্চয় যালিম।[১০৮]

---

১০৬. *আল কুরআন*, ৭ : ৮০-৮১
১০৭. *আল কুরআন*, ২১ : ৭৪

লূত (আ.) এদেরকে বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার কথাই হুবহু কুরআন মাজীদে উল্লেখ করে বলেন,

قَالَ رَبِّ ٱنصُرۡنِي عَلَى ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُفۡسِدِينَ-

লূত (আ.) বলেন, হে আমার রব! আপনি আমাকে এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন।[১০৯]

ইবরাহীম (আ.) তাদের ক্ষমার জন্য জোর সুপারিশ করলেও তা শুনা হয়নি, বরং তাকে বলা হয়েছে :

يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ أَعۡرِضۡ عَنۡ هَٰذَآۖ إِنَّهُۥ قَدۡ جَآءَ أَمۡرُ رَبِّكَۖ وَإِنَّهُمۡ ءَاتِيهِمۡ عَذَابٌ غَيۡرُ مَرۡدُودٖ-

হে ইবরাহীম! এ ব্যাপারে আর একটি কথাও বলোনা। (তথা তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে) তোমার রবের ফরমান এসে গেছে এবং তাদের ওপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই টলবার মতো নয়।[১১০]

যখন তাদের শাস্তি নিশ্চিত হয়ে গেলো এবং তা ভোরে ভোরেই আসবে বলে লূত (আ.) কে জানিয়ে দেওয়া হলো তখন তিনি তা দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে আপত্তি জানালে তাকে বলা হলো :

أَلَيۡسَ ٱلصُّبۡحُ بِقَرِيبٖ-

সকাল কি অতি নিকটেই নয়? কিংবা সকাল হতে কি এতই দেরী?[১১১]

আল্লাহ তা'য়ালা লূত (আ.) এর সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে বলেন,

فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ - مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٖ-

অতঃপর যখন আমার ফরমান জারি হলো তখন ভূ-খন্ডটির উপরিভাগকে নিচু করে দিলাম এবং ওর উপর পোড়া মাটির পথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা ছিলো একাধারে এবং যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলো আপনার রবের ভান্ডারে। আর উক্ত জনপদটি এ যালিমদের থেকে দূরে নয়।[১১২]

---

১০৮. *আল কুরআন*, ২৯ : ৩১
১০৯. *আল কুরআন*, ২৯ : ৩০
১১০. *আল কুরআন*, ১১ : ৭৬
১১১. *আল কুরআন*, ১১ : ৮১
১১২. *আল কুরআন*, ১১ : ৮২-৮৩

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّيۡحَةُ مُشۡرِقِينَ- فَجَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٍ- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡمُتَوَسِّمِينَ- وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٖ مُّقِيمٍ- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ-

অতঃপর তাদেরকে সূর্যোদয়ের সময়েই এক বিকট আওয়াজ পাকড়াও করলো। এর পরই আমরা জনপদটিকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। আর উক্ত জনপদটি স্থায়ী তথা বহু প্রাচীন লোক চলাচলের পথ পার্শ্বেই এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন।[১১৩]

আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল (স.) সমকামীদেরকে তিনতিন বার লানত দিয়েছেন যা অন্য কারোর ব্যাপারে দেননি।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ، مَلْعُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ-

সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত।[১১৪]

বর্তমান যুগের সমকামের বহুল প্রচার ও প্রসারের কথা কানে আসতেই রাসূল (স.) এর ভবিষ্যত বাণীর কথা স্বরণে এসে যায় যাতে তিনি বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ-

আমি আমার উম্মতের ওপর সমকামেরই বেশি আশঙ্কা করছি।[১১৫]

১১৩. *আল কুরআন*, ১৫ : ৭৩-৭৭
১১৪. *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৪২০
১১৫. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৪৫৭

সমকামিতার অপকারিতা ও তার ভয়াবহতা

সমকামিতার মধ্যে এতো বেশি ক্ষতি ও অপকার নিহিত রয়েছে যার সঠিক গননা সত্যিই দুষ্কর। যা ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ের এবং দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কীয়। যার কিয়দাংশ নিম্নরূপ :

ধর্মীয় অপকার :

সমকামিতা কবীরা গুনাসমূহের একটি। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক নেক আমল থেকে সরিয়ে রাখে। এমনকি তা যে কারোর তাওহীদ বিনষ্টে বিশেষ ভূমিকা রাখে। আর তা এভাবে যে, এ নেশায় পড়ে ছেলেদের সাথে ধীরে ধীরে ভালোবাসা জন্ম নেয়। আরতা একদা তাকে শির্ক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। সে ধীরে ধীরে ভালোবেসে ফেলে এবং সাধুতাকে ঘৃণা করে। তখন সে হালাল মনে করেই সহজভাবে উক্ত কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যায়। তখন সে কাফির ও মুরতাদ হতে বাধ্য হয়। এ কারণেই বাস্তবে দেখা যায় যে, যে যত বেশি শির্কের দিকে ধাবিত সে ততবেশি এ কাজে লিপ্ত। তাই লূত সম্প্রদায়ের মুশরিকরাই এ কাজে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়।

এ কথা সবারই জানা থাকা উচিত যে, শির্ক ও ইশক পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর ব্যভিচার ও সমকামি পূর্ণ মজা তখনই অনুভূত হয় যখন এর সাথে ইশক জড়িত হয়। তবে এ চরিত্রের লোকদের ভালোবাসা এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তনশীল।

চারিত্রিক অপকারসমূহ :

সমকামই হচ্ছে চারিত্রিক এক অধঃপতন। স্বাভাবিকতা বিরুদ্ধ। এরই কারণে লজ্জা কমে যায়, মুখ হয় অশ্লীল এবং অন্তর হয় কঠিন, অন্যদের প্রতি দয়া মায়া সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ হয়ে একবারেই তা এক কেন্দ্রিক হয়ে যায়, পুরুষত্ব ও মানবতা বিলুপ্ত হয়, সাহসিকতা, সম্মান ও আত্মমর্যাদা বোধ বিনষ্ট হয়। নির্যাতন ও অঘটন ঘটাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাহসী করে তোলে। উচ্চ মানসিকতা বিনষ্ট করে দেয় এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বেকুব বানিয়ে তোলে। তার ওপর থেকে মানুয়ের আস্থা কমে যায়। তারদিকে মানুষ খিয়ানতের সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায়। উক্ত ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় এবং উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতি থেকে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে যায়।

মানসিক অপকারসমূহ :

উক্ত কর্মের অনেকগুলো মানসিক অপকার রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

১. অস্থিরতা ও ভয়-ভীতি অধিক হারে বেড়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে সার্বিক শান্তি নিরাপত্তা। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই ভয় করবে। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করবে না তাকে সকল ভয় এমনিতেই ঘিরে রাখবে। কারণ, শাস্তিতো যেকোনো অপরাধের অনুরূপ হওয়াই শ্রেয়।

২. মানসিক বিশৃঙ্খলা ও মনের অশান্তি তার নিকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এ হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সে ব্যত্তির জন্য নগদ শাস্তি যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে ছাড়া অন্যকে ভালোবাসবে। আর এ সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হবে মনের অশান্তি ততই বেড়ে যাবে। আল্লামা ইবন তাইমিয়্যা (রহ.) বলেন, এ কথা সবারই জানা উচিৎ যে, কেউ কাউকে ভালোবাসলে (যে ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য নয়) সে ব্যক্তি অবশ্যই তার প্রেমিকের ক্ষতি সাধন করবে এবং এ ভালোবাসা অবশ্যই প্রেমিকের যেকোনো ধরনের শাস্তির কারণ হবে।

৩. এ ছাড়াও উক্ত অবৈধ সম্পর্ক অনেক ধরনের মানসিক রোগের জন্ম দেয় যা বর্ণনাতীত। যার দরুন তাদের জীবনের স্বাদ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

৪. এ জাতীয় লোকেরা একাকী থাকাকেই বেশি ভালোবাসে এবং তাদের একান্ত শিকার অথবা উক্ত কাজের সহযোগী ছাড়া অন্য কারোর সাথে এরা একেবারেই মিশতে চায় না।

৫. এ জাতীয় লোকদের মাঝে স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বহীনতা ধীরে ধীরে জন্ম নেয় এবং তাদের মেজায পরিবর্তন হয়ে যায়। যে কোনো কাজে এরা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

৬. এদের নিজেদের মাঝে ক্রমান্বয়ে পরাজয় ভাব জন্ম নেয়। নিজেদের ওপর তখন এরা কোনো ব্যাপারেই আস্থাশীল হতে পারে না।

৭. এ জাতীয় মানুষের নিজের মধ্যে এক জাতীয় পাপ বোধ জন্ম নেয়। যার দরুন সে মনে করে সবাই আমার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। সুতরাং মানুষের ব্যাপারে তার একটা খারাপ ধারণা জন্মে।

৮. এ জাতীয় লোকদের মাঝে হরেক রকমের ওয়াসওয়াসা ও অমূলক চিন্তা জন্ম নেয়। এমন কি ধীরে ধীরে সে পাগলের রূপ ধারণ করে।

৯. এ জাতীয় লোক ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ হীন যৌনতাড়নায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সর্বদা সে যৌন চেতনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

১০. এদের মধ্যে ধীরে ধীরে মানসিক টানাপোড়েন ও বেপরোয়া ভাব জন্ম নেয়।

১১. তেমনিভাবে এদের মধ্যে বিরক্তি ভাব, নিরাশা, কুলক্ষণ ভাব, আহাম্মকি জযবাও জন্ম নেয়।

১২. এদের দেহের কোষ সমূহের ওপরও এর একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। যার দরুন এ ধরনের লোকেরা নিজেকে পুরুষ বলে মনে করে না। একারণেই কাউ কাউকে মহিলাদের সাজ সজ্জা গ্রহণ করতেও দেখা যায়।

শারীরিক অপকারসমূহ :

শারীরিক ক্ষতির কথাতো বলাই বাহুল্য। কারণ, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কিছু দিন পর পরই এ সংক্রান্ত নতুন নতুন রোগ আবিষ্কার করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ জাতীয় কোনো একটি রোগের ঔষধ খুঁজতে খুঁজতেই দেখা যায় নতুন আরেকটি রোগ আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। এইতো হচ্ছে রাসূল (স.) এর ভবিষ্যত বাণীর সত্যিকার ফলাফল।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِيْ أَسْلاَفِهِمْ الَّذِيْنَ مَضَوْا-

কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যভিচার তথা অশ্লীলতা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে অবশ্যই মহামারি ও বহু প্রকারের রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে যা পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিলো না।[১১৬]

সুতরাং ব্যাধিগুলো নিম্নরূপ :

১. এ জাতীয় মানুষের নিজ স্ত্রীর প্রতি ধীরে ধীরে অনীহা জন্ম নেয়।

২. এ জাতীয় মানুষের লিঙ্গের কোষগুলো একেবারেই ঢিলে হয়ে যায়। যদ্দরুন পেশাব ও বীর্য পাতের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না।

---

১১৬. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪০৯

৩. এ জাতীয় লোকেরাই টাইফয়েড এবং ডিসেন্ট্রি রোগে আক্রান্ত হয়।

৪. এরই ফলে সিফিলিস রোগেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। লিঙ্গ, হৃদপিন্ড, আঁত, পাকস্থলী, জিহ্বার ক্যান্সার এবং অঙ্গহানীর বিশেষ কারণ ও হয়ে দাড়ায়। এটি ডাক্তারদের ধারণায় একটি দ্রুত সংক্রামক ব্যাধি।

৫. কখনো কখনো এরা গনোরিয়ায়ও আক্রান্ত হয় এবং এ রোগে আক্রান্তে সংখ্যা সাধারণত একটু বেশি। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসংস্থার রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭৫ সালে উক্ত রোগে প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়। বর্তমানে ধারণা করা হয়, এ জাতীয় রোগীর হার বছরে বিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি। যার অধিকাংশই যুবক। এ জাতীয় রোগে প্রথমত লিঙ্গে এক ধরনের জ্বলন সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি তাতে এক ধরনের বিশ্রী পুঁজও জন্ম নেয়। এটি বন্ধ্যাত্বের একটি কারণও বটে। এরই কারণে ধীরে ধীরে প্রস্রাবে রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়।

উক্ত জ্বলনের কারণে ধীরে ধীরে লিঙ্গাগ্রের ছিদ্রের আশপাশ লাল রং হয়ে যায়। পরিশেষে জ্বলন মুত্রথলী পর্যন্ত পৌঁছায়। তখন মাথা ব্যাথা, জ্বর ইত্যাদি হয়ে যায়। এমনকি এর প্রতিক্রিয়া শরীরের রক্তে পৌঁছলে তখন হৃদপিন্ডে জ্বলন সৃষ্টি হয়, আরো কত কী?

৬. হেরপেস রোগও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম ব্যাধি। আমেরিকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি রিপোর্টে বলা হয়, হেরপেসের এখনো কোনো চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয়নি এবং এটি ক্যান্সারের চাইতেও মারাত্মক। শুধু আমেরিকাতেই এ রোগীর হার বছরে বিশ কোটি এবং ব্রিটেনে এক লক্ষ।

এ রোগ হলে প্রথমে লিঙ্গাগ্রে অনুভূত হয়। অতঃপর চুলকানির জায়গায় লাল ফোস্কা জাতীয় কিছু দেখা দেয় যা দ্রুত বড় হয়ে পুরো লিঙ্গে এবং যার সাথে সমকাম করা হয় তার গুহ্যদ্বারে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর ব্যাথা খুবই চরম এবং এগুলো ফেটে গিয়ে পরিশেষে জ্বলন ও পুঁজ সৃষ্টি হয়। কিছুদিনপর রান ও নাভীর নিচের অংশও ভীষণভাবে জ্বলতে থাকে। এমনকি তা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের শারীরিক ক্ষতির চাইতেও মানসিক ক্ষতি আরো অনেক বেশি।

৭. এইডসও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম রোগ। এ রোগের ভয়ঙ্করতা নিম্নের ব্যাপারগুলো থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় :

ক. এ রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি।

খ. এ রোগ খুবই অস্পষ্ট। যার দরুন এ সংক্রান্ত প্রশ্ন অনেক বেশি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা সেগুলোর তেমন আশানুরূপ কোনো উত্তর দিতে পারছে না।

গ. এ রোগের চিকিৎসা একেবারেই নেই অথবা থাকলেও অতি স্বল্প মাত্রায়।

ঘ. এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এইডস এ কারণে মানুয়ের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়ে। যার দরুন যেকোনো ছোট রোগও তাকে সহজে কাবু করে ফেলে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ রোগে আক্রান্ত শতকরা ৯৫ জনই সমকামী এবং এ রোগে আক্রান্তদের শতকরা ৯৫ জনই তিন বছরের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে।

৮. এ জাতীয় লোকেরা ভালোবাসার ভাইরাস অথবা ভালোবাসার রোগ নামক এক নতুন ব্যাধিতেও কখনো কখনো আক্রান্ত হয়। তবে এটি এইডস চাইতেও অনেক ভয়ানক। এ রোগের তুলনায় এইডস খেলনা মাত্র। এ রোগে কেউ আক্রান্ত হলে ছয় মাস যেতে না যেতেই তার পুরো শরীর ফোস্কা ও পুঁজে ভরে যায় এবং ক্ষরণ হতে হতেই সে পরিশেষে মারা যায়। সমস্যার ব্যাপার হলো এই যে, এ রোগটি একেবারেই লুকায়িত থাকে যতক্ষণ যৌন উত্তেজনা প্রশমনের সময় এ সংক্রান্ত হরমোনগুলো উত্তেজিত হয়। আর তখনই উক্ত ভাইরাসগুলো জীবন পায়। তবে এ রোগ যেকোনো পন্থায় সংক্রমণ করতে সক্ষম। এমনকি বাতাসের সাথেও।

সমকামিতার শাস্তি

কারোর ব্যাপারে সমকাম প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে ও তার সমকামী সঙ্গীকে শাস্তি স্বরূপ হত্যা করতে হয়।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْـمَفْعُوْلَ بِهِ-

কাউকে সমকাম করতে দেখলে তোমরা উভয় সমকামীকে হত্যা করবে।[১১৭]

উক্ত হত্যার ব্যাপরে সাহাবীগণের ঐকমত্য রয়েছে। তবে হত্যার ধরনের ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য করেছে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

اُرْجُمُوْا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ،اُرْجُمُوْهُمَا جَمِيْعاً-

তোমরা উপর-নিচের উভয়কেই রজম করে হত্য করো।[১১৮]

আবুবকর, ও আলি, ও আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) এবং হিশাম ইবন আব্দুল মালিক (রহ.) সমকামীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَتَبَ خَالَدُ بْنُ الْوَلِيْدِ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ الصِدّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلاً فِيْ بَعْضِ ضَوَاحِيْ الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الـمَرْأَةُ، فَجَمَعَ لِذَلِكَ أَبُوْ بَكْرٍ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ (صلعم) ، وَفِيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِب (رضى) ، فَقَالَ عَلِيٌّ (رضى) : إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أُمَّةٌ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً ، فَفَعَلَ اللهُ بِهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، أَرَى أَنْ تَحْرِقَهُ بِالنَّارِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ (صلعم) أَنْ يُّحْرَقَ بِالنَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يُّحْرَقَ بِالنَّارِ-

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) একদা আবু বকর (রা.) এর নিকট এমর্মে একটি চিঠি পাঠালেন যে, তিনি আরবের কোনো এক মহল্লায় এমন একব্যক্তিকে পেয়েছেন যাকে দিয়ে যৌন উত্তেজনা নিবারণ করা হয় যেমনিভাবে নিবারণ কারা হয় মহিলা দিয়ে। তখন আবু বকর (রা.) সাহাবীগণকে একত্রিত করে এব্যাপারে তাদের পরামর্শ চেয়েছেন। তাদের মধ্যে আলি (রা.)ও তখন উপস্থিত ছিলেন।

---

১১৭. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৪৬২
১১৮. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৬১০

তিনি বলেন, এটি এমন একটি গুনাহ যা বিশ্বে শুধুমাত্র একটি উম্মতই সংঘটন করেছে। আল্লাহ তা'আলা ওদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন। অতএব আমার মত হচ্ছে, তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। উপস্থিত সকল সাহাবারাও উক্ত মতের সমর্থন করেন। তখন আবুবকর (রা.) তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার ফরমান জারি করেন।[১১৯]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِيْ الْقَرْيَةِ ، فَيُرْمَى اللُّوْطِيُّ مِنْهَا مُنَكَّساً، ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ-

সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার উপর পাথর মারা হবে।[১২০]

সমকামীর জন্য পরকালে শাস্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِيْ الدُّبُرِ-

আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না। যে সমকামেলিপ্ত হয় অথবা কোনো মহিলার মল দ্বারে গমন করে।[১২১]

---

১১৯. আবু বকর আহমাদ ইবন হোসাইন ইবন আলী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুসা, *বায়হাক্বী*, অনু : মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল-২০১৩), হাদীস নং- ৫৩৮৯

১২০. *বায়হাক্বী*, প্রাগুপ্ত- ৮/২৩২

১২১. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১১৬৫

সমকামিতার চিকিৎসা

উক্তরোগ তথা সমকামের নেশা থেকে বাচাঁর উপায় অবশ্যই রয়েছে। তবে তা এ জাতীয় রোগীর পক্ষ থেকে সাদরে গ্রহণ করার অপেক্ষায় রয়েছে। আর তা হচ্ছে দুই প্রকার :

১. রোগাক্রান্ত হওয়ার আগের চিকিৎসা :

তা আবার দুই ধরনের :

ক. দৃষ্টি শক্তি হিফাযতের মাধ্যমে : কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত একটি তীর যা মানুষের আফসোসই বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং শ্মশ্রু বিহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে একেবারেই বিরত থাকতে হবে। তাহলেই সমকামের প্রতি অন্তরে আর উৎসাহ জন্ম নিবে না। এছাড়াও দৃষ্টি শক্তি নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো ফায়দা রয়েছে যা নিম্নরূপ :

১. তাতে আল্লাহ তাআলার আদেশ মানা হয়। যা ইবাদতেরই একাংশ এবং ইবাদতের মধ্যেই মানব কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

২. বিষাক্ত তীরের প্রভাব থেকে অন্তর বিমুক্ত থাকে। কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর।

৩. মন সর্বদা আল্লাহ অভিমুখী থাকে।

৪. মন সর্বদা সন্তুষ্ট ও শক্তিশালী থাকে।

৫. অন্তরে এক ধরেনের নূর তথা আলোর জন্ম নেয়। যার দরুন সে উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই ধাবিত হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ-

হে রাসূল! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থান হিফাযত করে।[১২২]

এর কয়েক আয়াত পরই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ-

আল্লাহ তা'আলাই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি (সত্যিকার ঈমানদারের অন্তরে) তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার। যার মধ্যে রেয়েছে একটি প্রদীপ।[১২৩]

---

১২২. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩০
১২৩. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩৫

৬. এরই মাধ্যমে হক্ক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিশেষ প্রভেদ জ্ঞান সৃষ্টি হয়। যার দরুন দৃষ্টি সংযত কারীর যেকোনো ধারণা অধিকাংশই সঠিক প্রমাণিত হয়। ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা লূত সম্প্রদায়ের সমকামীদেরকে অন্তর্দৃষ্টি শূন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَعَمۡرُكَ إِنَّهُمۡ لَفِي سَكۡرَتِهِمۡ يَعۡمَهُونَ-

আপনার জীবনের কসম! ওরাতো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে তথা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।[১২৪]

৭. এরই মাধ্যমে অন্তরে দৃঢ়তা, সাহসিকাতা ও শক্তি জন্ম নেয় এবং মানুষ তাকে সম্মান করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَعۡلَمُونَ-

সম্মান ও ক্ষমতাতো আল্লাহ তা'আলা, তদীয় রাসূলও (সত্যিকার) ঈমানদার দের জন্য; কিন্তু মুনাফিকরাতো তা জানে না।[১২৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيۡهِ يَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرۡفَعُهُۥ-

কেউ ইজ্জত ও সম্মান চাইলে সে যেন জেনে রাখে, সকল সম্মানই তো আল্লাহ তা'আলার। (অতএব, তাঁর কাছেই তা কামনা করতে হবে। অন্যের কাছে নয়। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ তথা যিকির ইত্যাদি আরোহণ করে এবং নেক আমল তিনিই উন্নীত করেন।[১২৬]

সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য, যিকির ও নেক আমলের মাধ্যমেই তাঁরই নিকট সম্মান কামনা করতে হবে।

৮. তাতে মানব অন্তরে শয়তান ঢুকার সুগম পথটি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, সেতো দৃষ্টি পথেই মানব অন্তরে প্রবেশ করে খালি স্থানে বাতাস প্রবেশের চাইতেও অতিদ্রুত গতিতে। অতঃপর সে দেখা বস্তুটির সুন্দর দৃশ্যটুকু দৃষ্টিক্ষেপণকারীর মানসপটে স্থাপন কারে। সে দৃষ্ট বস্তুটির মূর্তি এমনভাবে তৈরি কারে যে, অন্তর তখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত হতে বাধ্য হয়। এরপর সে অন্তরকে অনেক ধরনের আশা ও অঙ্গীকার দিতে থাকে। সে অন্তরে উত্তরোত্তর কুপ্রবৃত্তির তাড়না জাগিয়ে তোলে।

---

১২৪. *আল কুরআন*, ১৫ : ৭২
১২৫. *আল কুরআন*, ৬৩ : ৮
১২৬. *আল কুরআন*, ৩৫ : ১০

এমনকি সে মনের মাঝে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাতে বহু প্রকার গুনাহে জ্বালানি ব্যবহার কারে আরো উত্তপ্ত করতে থাকে। অতঃপর হৃদয়টি সেই উত্তপ্ত আগুনে লাগাতার পুরাতে থাকে। সে অন্তর্দাহ থেকেই বিরহের উত্তপ্ত ঊর্ধ্ব শ্বাসের সৃষ্টি।

৯. এরই মাধ্যমে অন্তর সর্বদা মঙ্গলজনক কর্মসম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পায়। অবৈধ দৃষ্টিক্ষেপণে মানুষ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্তর গাফিল হায়ে যায়। প্রবৃত্তি পুঁজায় ধাবিত হয়ে এবং সকল ব্যাপারে এক ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.) কে এ জাতীয় লোকদের আনুগত্য করতে নিষেধ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا-

যার অন্তনরকে আমরা আপনার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এমনকি যার কর্যকলাপ সীমা অতিক্রম করেছে আপনি তার অনুগত্য করবেন না।[১২৭]

১০. অন্তর ও দৃষ্টির মাঝে এমন এক সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, একটি খারাপ হলে অন্যটি খারাপ হতে বাধ্য। তেমনিভাবে একটি সুস্থ থাকলে অন্যটি সুস্থ থাকতে বাধ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার অন্তরও তারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

খ. তা থেকে দূরে রাখে এমন বস্তু নিয়ে ব্যস্ততার মাধ্যমে : আর তা হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে অধিক ভয় বা অধিক ভালোবাসা। অর্থাৎ অন্যকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা না পাওয়ার আশঙ্কা করা অথবা আল্লাহ তা'য়ালকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, তিনি ভিন্ন অন্যকে আর ভালোবাসার সুযোগ না পাওয়া যার ভালোবাসা আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসার অধীন নয়। কারণ, এ কথা একেবারেই সত্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা মানব অন্তরে জন্মগতভাবেই এমন একশূন্যতা রেখে দিয়েছেন যা একমাত্র তারই ভালোবাসা পরিপূর্ণ করতে পারে। তবে কারোর মাধ্যে নিম্নোক্ত দুটি গুণ থাকলেই সে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যা নিম্নরূপ :

১. বিশুদ্ধ অর্ন্তদৃষ্টি। যার মাধ্যমে সে প্রিয়-অপ্রিয়ের স্তরসমূহের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তখনই সে মূল্যবান বন্ধুকে পাওয়ার জন্য নিম্নমানের বন্ধুকে ছাড়তে পারবে এবং বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ছোট বিপদ মাথা পেতে মেনে নিতে পারবে।

---

১২৭. *আল কুরআন*, ১৮ : ২৮

২. ধৈর্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যার ওপর নির্ভর করে সে উক্ত কর্মসমূহ আঞ্জাম দিতে পারবে। কারণ, এমন লোকও আছে যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ রয়েছে। তবে সে তা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণটি না থাকার দরুন।

সুতরাং কারোর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা আল্লাহ তা'য়ালার অধীন নয় তার ভালোবাসা একত্র হতে পারে না। অন্যকথায়, যার মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা নেই সেই একমাত্র মহিলাদের অথবা ছেলেদের ভালোবাসায় মত্ত থাকতে পারে। দুনিয়ার কোনো মানুষ যখন তার ভালোবাসায় কারো অংশীদারি সহ্য করতে পারে না তখন আল্লাহ তা'য়ালা কেন তার ভালোবাসায় অংশীদারি সহ্য করবেন? আর এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা তার ভালোবাসায় শিরক কখনোই ক্ষমা করবেন না।

ভালোবাসার আবার কয়েকটি স্তর রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

১. সাধারণ সম্পর্ক জাতীয় ভালোবাসা যার দরুন একজনের মন অন্য জনের সঙ্গে লেগে যায়া। আরবি ভাষায় এ সম্পর্ককে আলাক্বাহ বলা হয়।

২. ভালোবাসায় মন উপচে পড়া। আরবি ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে স্বাবাবাহ বলা হয়।

৩.এমন ভালোবাসা যা মন থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে গারাম বলা হয়।

৪. নিয়ন্ত্রণহীন ভালোবাসা। আরবি ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে ইশক বলা হয়। এ জাতীয় ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার শানে প্রযোজ্য নয়।

৫. এমন ভালোবাসা যার দরুন প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়। আরবি ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসা কে শাওক বালা হয়। এমন ভালোবাসা আল্লাহর শানে অবশ্যই প্রযোজ্য।

উবাদহ ইবনে সামিত, আয়েশা, আবু হুরায়ারা ও আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ-

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ চায় আল্লাহ তা'আলা ও তার সাক্ষাৎ চাইবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ চায় না আল্লাহ তা'আলাও তাঁর সাক্ষৎ চাইবেন না।[১২৮]

১২৮. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬৫০৭, ৬৫০৮

৬. এমন ভালোবাসা যার দরুন কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকার একান্ত গোলাম হয়ে যায়। এ জাতীয় ভালোবাসাই শির্কের মূল। কারণ, ইবাদতের মূল কথাইতো হচ্ছে, প্রিয়ের একান্ত আনুগত্য ও অধীনতা। আর একারণেই আল্লাহ তা'আলার নিকট মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান জনক গুণ হচ্ছে তার আব্দ বা সত্যিকার গোলাম হওয়া তথা বিনয় ভালোবাসা নিয়েই আল্লাহ তা'আলার অধীনতা স্বীকার করা। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং যা ইসলামের মূল কথাও বটে। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (স.) কে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলোতে আব্দ শব্দে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা দাওয়াতী ক্ষেত্রে রাসূল (স.) কে আব্দ শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ ٱللَّهِ يَدۡعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيۡهِ لِبَدٗا-

আর যখন আল্লাহর বান্দা রাসূল (স.) তাঁকে (আল্লাহ তা'য়ালাকে) ডাকার (তাঁরই ইবাদত করার) জন্য দন্ডায়মান হলো তখন তারা (জিন্নরা) সবাই তাঁর নিকট ভিড় জমালো।[১২৯]

আল্লাহ তা'য়ালা নবুওয়াতের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রেও রাসূল (স.) কে আব্দ শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ-

আমরা আমাদের বান্দার [রাসূল (স.)] এর প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তোমরা যদি তাতে সন্দিহান হও তবে সেরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো।[১৩০]

আল্লাহ তা'য়ালা ইসরার ক্ষেত্রেও রাসূল (স.) কে আব্দ শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا-

পবিত্র সে সত্তা যিনি নিজ বান্দাকে রাত্রি বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত (বাইতুল মাকদিসে)।[১৩১]

---

১২৯. *আল কুরআন*, ৭২ : ১৯
১৩০. *আল কুরআন*, ২ : ২৩
১৩১. *আল কুরআন*, ১৭ : ১

সুপারিশের হাদীসের মধ্যেও রাসূল (স.) কে আব্দ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিয়ামতের দিবসে ঈসা (আ.) এর নিকট সুপারিশ চাওয়া হলে তিনি বলবেন,

اِئْتُوْا مُحَمَّدًا، عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ-

তোমরা মুহাম্মাদ (স.) এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার এমন এক বান্দা যার পূর্বাপর সকল গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১৩২]

উক্ত হাদীসে সুপারিশের উপযুক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে ক্ষমা প্রাপ্ত আল্লাহ তা'য়ালার খাঁটি বান্দা হওয়ার দরুন।

উক্ত নিরেট ভালোবাসা বান্দার নিকট আল্লাহ তা'য়ালার একান্ত প্রাপ্য হওয়ার দরুন আল্লাহ তা'য়ালা তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে বন্ধু বা সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ-

তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু এবং সুপারিশকারী নেই।[১৩৩]

তিনি আরো বলেন, ওদের (মুমিনদের) জন্য তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) ভিন্ন না আছে কোনো বন্ধু আর না আছে কোনো সুপারিশকারী।[১৩৪]

لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ-

তেমনিভাবে পরকালে তিনি ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু কারোর কোনো কাজেও আসবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْـًٔا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ-

তাদের ধন-সম্পদ এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধু সেদিন তাদের কোনো কাজেই আসবে না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[১৩৫]

মূলকথা, ভালোবাসায় আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গে কাউকে শরীক করে সত্যিকার ইবাদত করা যায় না। তবে আল্লাহ তা'য়ালার জন্য কাউকে ভালোবাসা এর বিপরীত নয়। বরং তা আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালোবাসার পরিপূরকও বটে।

১৩২. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৪৭৬
১৩৩. *আল কুরআন*, ৩২ : ৪
১৩৪. *আল কুরআন*, ৬ : ৫১
১৩৫. *আল কুরআন*, ৪৫ : ১০

আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ-

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসলো, আল্লাহর জন্য কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, আল্লাহর জন্য কাউকে দিলো এবং আল্লাহর জন্য কাউকে বঞ্চিত করলো সে যেনো নিজ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিলো।[১৩৬]

এমনকি রাসূল (স.) এর ভালোবাসাকে অন্য সবার ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য না দিলে সে ব্যক্তি কখনো পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না।

অতএব আল্লাহ তা'য়ালার জন্য কাউকে ভালোবাসা যতই কঠিন হবে ততই আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা কঠিন হবে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ভালোবাসা আবার চার প্রকার। যেগুলোর মাঝে ব্যবধান না জানার দরুনই অনেকে এক্ষেত্রে পথ ভ্রষ্ট হয়।

আর তা নিম্নরূপ :

ক. আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালোবাসা, তবে তা নিরেট ভালোবাসা না হলে কখনো তা কারোর উপকারে আসবে না।

খ. আল্লাহ তা'য়ালা যা ভালোবাসেন তাই ভালোবাসা। যে এ ভালোবাসায় যত আগ্রহী সে আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসায় তত আগ্রগামী।

গ. আল্লাহ তা'য়ালার জন্য ভালোবাসা। এ ভালোবাসা উক্ত ভালোবাসার পরিপূরক।

ঘ. আল্লাহ তা'য়ালার সাথে অন্য কাউকে তাঁর সমপর্যায়েই ভালোবাসা। আর এটিই হচ্ছে শির্ক। আরো এক প্রকারের ভালোবাসা রয়েছে যা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আর তা হচ্ছে স্বভাবগত ভালোবাসা। যেমন- স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসা।

৭. চূড়ান্ত ভালোবাসা। কাউকে এমন চরমভাবে ভালোবাসা যে, প্রেমিকের অন্তরে আর কাউকে ভালোবাসার কোনো জায়গাই থাকে না। আরবি ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে খুল্লাহ এবং এ জাতীয় প্রেমিককে খলীল বলা হয়। আর জাতীয় ভালোবাসা শুধুমাত্র দুজন নবীর জন্যই নির্দিষ্ট। যারা হচ্ছেন ইবরাহীম (আ.) এবং মুহাম্মাদ (স.)।

---

১৩৬. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৬৮১

জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে একথা বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَّكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً-

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার খলীল হোক এ ব্যাপার থেকে আমি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে নিজ খলীল হিসেবে চয়ন করেছেন যেমনিভাবে চয়ন করেছেন ইবরাহীম (আ.) কে। আমি যদি আমার উম্মত থেকে কাউকে খলীল বানাতাম তাহলে আবু বকর (রা.) কেই খলীল বানাতাম।[১৩৭]

খলীলের চাইতে হাবীবের মর্যাদা কখনোই উন্নত হতে পারে না। কারণ রাসূল (স.) কখনোই কাউকে নিজ খলীল বানাননি। তবে হযরত আয়েশা (রা.) তার হাবীবাহ ছিলেন এবং আবু বকর, উমার ও অন্যান্যরা তাঁর হাবীব ছিলেন।

একথা সবার জানা থাকা প্রয়োজন, ভালোবাসার পাত্র আবার দু'প্রকার। যা নিম্নরূপ :

ক. স্বকীয়ভাবে যাকে ভালোবাসতে হয়। অন্য কারোর জন্য তার ভালোবাসা নয়। আর তা এমন সত্তার ব্যাপারে হতে পারে যার গুণাবলি চূড়ান্ত পর্যায়ের ও চিরস্থায়ী এবং যা তার থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ মানুষ কাউকে দু'কারণেই ভালোবাসে। আর তা হচ্ছে মহত্ত্ব ও পরমসৌন্দর্য। উক্ত দু'টি গুণ আল্লাহ তা'য়ালার মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়েরই রয়েছে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব একান্ত স্বকীয়ভাবে তাঁকেই ভালোবাসতে হবে। তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে নয়।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সব কিছু দিচ্ছেন, সুস্থ রাখছেন, সীমাহীন করুণা করছেন, তাঁর শানে অনেক অনেক দোষ করার পরও তিনি তা লুকিয়ে রাখছেন এবং ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তিনি আমাদের দু'আ কবুল করছেন, আমাদের সকল বিপদাপদ কাটিয়ে দিচ্ছেন; অথচ আমাদের প্রতি তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই বরং তিনি বান্দাকে গুণাহ করার সুযোগ দিচ্ছেন, তাঁরই ছত্রছায়ায় বান্দা তার প্রবৃত্তির সকল চাহিদা মিটিয়ে নিচ্ছেন যদিও তা তাঁর বিধান বিরুদ্ধ।

সুতরাং আমরা তাঁকেই ভালো না বেসে আর কাকে ভালোবাসবো? বান্দার প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে শুধু কল্যাণই নেমে আসছে; অথচ তাঁর প্রতি বান্দার পক্ষ থেকে অধিকাংশ সময় খারাপ আমলই ওঠে যাচ্ছে, তিনি অগণিত নিয়ামত দিয়ে বান্দার প্রিয় হতে চান; অথচ তিনি তার মুখাপেক্ষী নন।

---

১৩৭. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫৩২

আর বান্দা গুণাহ এর মাধ্যমে তাঁর অপ্রিয় হতে চায়; অথচ সর্বদা সে তাঁর মুখাপেক্ষী। তারপরও আল্লাহর অনুগ্রহ কখনো বন্ধ হচ্ছে না। আর বান্দার গুণাহও কখনো কমছে না। দুনিয়ার কেউ কাউকে ভালোবেসে তার স্বার্থের জন্যই ভালোবাসে কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে ভালোবাসেন একমাত্র তারই কল্যাণে। তাতে আল্লাহ তা'য়ালার কোনো লাভ নেই।

দুনিয়ার কেউ কারোর সাথে কখনো লেনদেন করে লাভবান না হলে সে তার সাথে দ্বিতীয়বার আর লেনদেন করতে চায় না। লাভ ছাড়া সে সামনে এক কদমও বাড়াচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার সাথে লেনদেন করছেন একমাত্র তারই লাভের জন্য নেক আমল একে দশ, সাতশ পর্যন্ত। এমনকি আরো অনেক বেশি। আর গুণাহ একে এক এবং দ্রুত মার্জনীয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই জন্যে। আর দুনিয়া ও আখিরতের সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন একমাত্র বান্দার জন্যে। বান্দার সকল চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তাঁরই নিকচে। তিনিই সবচেয়ে বড় দাতা। বান্দাকে তিনি তাঁর নিকট চাওয়া ছাড়াই আশাতীত অনেক কিছু দিয়েছেন। তিনি বান্দার পক্ষ থেকে কম আমলে সন্তুষ্ট হয়েই তাঁর নিকট ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকেন এবং গুণাহগুলো ক্ষমা করে দেন। তিনি তাঁর নিকট বারবার কোনো কিছু চাইলে বিরক্ত হন না। বরং এর বিপরীতে তিনি তাতে প্রচুর সন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁর নিকট কেউ কিছু না চাইলে খুব রাগ করেন।

আমাদের সবার জানা থাকা উচিৎ যে, আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি -অসন্তুষ্টি রক্ষা করে চলার নামই বিলায়াত। যার মূলে রয়েছে তাঁর একান্ত ভালোবাসা। শুধু সালাত, সিয়াম কিংবা মুজাহাদার নামই বিলায়াত নয়। বান্দার খারাপ কাজে তিনি লজ্জা পান। কিন্তু বান্দা তাতে একটুও লজ্জা পায় না। তিনি বান্দার গুণাহমসূহ লুকিয়ে রাখেন; কিন্তু বান্দা তার গুণাহসমূহ লুকিয়ে রাখতে রাজি নয়। তিনি বান্দাকে অগণিত নিয়ামত দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি কামনার প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু বান্দা তা করতে অস্বীকার করে। তাই তিনি এ উদ্দেশ্যে যুগে যুগে রাসূল ও তাদের নিকট কিতাব পাঠান। এরপরও তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রতি শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলতে থাকেন; কে আছো আমার কাছে চাইবে আমি তাকে সবই দিবো। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। তিনি বান্দার প্রতি এতো মেহেরবান যে মাও তার সন্তানের প্রতি এতো মেহেরবানী করে না। বান্দার তাওবা দেখে তিনি এতো বেশি খুশী হন যতটুকু খুশি হয়না সে ব্যক্তিও যে ধুধু মরুভূমিতে খাদ্য-পানীয়সহ তার সওয়ারী হারিয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়ার পর আবার তা ফিরে পেয়েছে। তাঁর আলোকে দুনিয়া আলোকিত। তিনি সর্বদা জাগ্রত

কখনো ঘুম শোভা পায় না। তিনি সত্যিকার ইনসাফগার। তাঁর নিকট রাত্রের আমল উঠে যায় দিনের আমলের পূর্বে। দিনের আমল ওঠে যায় রাতের আমলের পূর্বে। নূরই তাঁর আচ্ছাদন। সে আচ্ছাদন সরিয়ে ফেললে তাঁর চেহারার আলোক রশ্মি তাঁর সৃষ্টির দূরত্ব পর্যন্ত তাঁর সকল সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ফেলবে। সুতরাং একমাত্র তাঁকেই ভালোবাসতে হবে।

জান্নাতের সর্ববৃহৎ নিয়ামত হবে সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালার সাক্ষাৎ লাভ। আর আত্মার সর্ব চূড়ান্ত স্বাদ তাতেই নিহিত রয়েছে। তা এখন থেকেই তাঁর ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে এবং তাঁর ভালোবাসার মধ্যেই দুনিয়াতে আত্মার সমূহ তৃপ্তি নিহিত। এটাই মুমিনের জন্য দুনিয়ার জান্নাত। একারণেই আলিমগণ বলে থাকেন; দুনিয়ার জান্নাত যে পেয়েছে আখিরাতের জান্নাত সেই পাবে। তাই আল্লাহ প্রেমিকদের কারো কারোর কখনো কখনো এমন ভাব বা মজা অনুভব হয় যার দরুন সে বলতে বাধ্য হয় যে, এমন মজা যদি জান্নাতীরা পেয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয় তাঁরা সুখে রয়েছেন।

খ. অন্যের জন্য যাকে ভালোবাসতে হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার কাউকে ভালোবাসতে হলে তা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই ভালোবাসতে হবে। স্বকীয়ভাবে নয়। তবে একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালার জন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসা কখনো মনের বিপরীতও হতে পারে। তবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই মেনে নিতে হবে যেমনিভাবে সুস্থতার জন্য অপছন্দ পথ্য খাওয়া মেনে নিতে হয়।

অতএব সর্বনিকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে ভালোবাসা। আর সর্বোৎকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে এককভাবে আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালোবাসা এবং তাঁর ভালোবাসার বস্তুকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া। ভালোবাসাই সকল কাজের মূল। চাই সেকাজ ভালোই হোক আর খারাপ হোক। কারণ কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসলেই তার মর্জি মাফিক কাজ করতে ইচ্ছা হয় এবং কোনো বস্তুকে ভালোবাসলেই তা পাওয়ার জন্য মানুষ কর্মোদ্যোগী হয়। সুতরাং সকল ধর্মীয় কাজের মূল হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালা ও তদীয় রাসূল (স.) এর ভালোবাসা যেমনিভাবে সকল ধর্মীয় কথার মূল হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালা ও তদীয় রাসূল (স.) এর ওপর বিশ্বাসের অপূর্ব স্বীকৃতি। কোনো ভালোবাসা কারোর জন্য লাভজনক প্রমাণিত হলে তার প্রভাব তথা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও তার জন্য লাভজনক হতে বাধ্য। আর কোনো ভালোবাসা কারোর জন্য ক্ষতিকর হলে তার প্রভাব তথা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও তার জন্য ক্ষতিকর হতে বাধ্য।

তাই আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালোবেসে তাঁকে পাওয়ার জন্য কান্না করলে বা তাঁকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ের ব্যথা অনুভূত হলে তা বান্দার কল্যাণেই আসবে। ঠিক এরই বিপরীতে কোনো সুন্দরী মেয়ে অথবা শ্মশ্রু বিহীন সুদর্শন কোনো ছেলেকে ভালোবাসলে তাঁকে পাওয়ার জন্য কান্না করলে বা তাঁকে পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা কখনোই বান্দার কল্যাণে আসবে না। বরং তা তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেই প্রমাণিত।

সুন্দরী কোনো নারীর অথবা শ্মশ্রু বিহীন সুদর্শন কোনো ছেলেকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, তার সন্তুষ্টিকে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, কখনো আল্লাহ তা'য়ালার অধিকার ও তার অধিকার পরস্পর সাংঘর্ষিক হলে তার অধিকারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, তার জন্য মূল্যবান সম্পদ ব্যয় করা হয়, অথচ আল্লাহ তা'য়ালার জন্য মূল্যহীন সম্পদ, তার জন্য মূল্যবান সময় ব্যয় করা হয় যা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য করা হয় না। সর্বদা তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়; অথচ আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য অর্জনের এতটুকুও চেষ্টা করা হয় না। এমন ভালোবাসা বড় শির্ক যা ব্যভিচার চাইতেও অত্যন্ত মারাত্মক।

২. রোগাক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা :

তাওহীদ বিরোধী উক্ত রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে সর্বপ্রথম একথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে শুধু মূর্খতা এবং গাফিলতির দরুনই। অতএব সর্বপ্রথম তাকে আল্লাহ তা'য়ালার তাওহীদ তথা একত্ববাদ, তাঁর সাধারণ নীতি-নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। অতঃপর তাকে এমন কিছু প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদত করতে হবে যার দরুন সে উক্ত মত্ত থেকে রক্ষা পেতে পারে। এরই পাশাপাশি সে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সবিনয়ে সর্বদা এ দু'আ করবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা যেন তাকে উক্ত রোগ থেকে ত্বরিত মুক্তি দেন। বিশেষ করে সম্ভাবনাময় স্থান, সময় ও অবস্থায় দু'আ করবে। যেমন : আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ, সাজদা এবং জুমু'আর দিনের শেষ বেলা ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্তাকারে প্রস্তাবিত চিকিৎসাসমূহ :

১. প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট উক্ত গুনাহ থেকে খাঁটি তাওবা করে নিন। কারণ কেউ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য অথবা তাঁরই কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাওবা করে নিলে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তা কবুল করবেন এবং তাকে সেভাবেই চলার তাওফীক দিবেন।

২. আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি দৃঢ় একনিষ্ঠবান হোন। আর এটিই হচ্ছে এর একান্ত মহৌষধ। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী ইউসুফ (আ.) কে এ একনিষ্ঠতার কারণেই ইশক্ব এবং প্রায় নিশ্চিত ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

كَذَٰلِكَ لِنَصۡرِفَ عَنۡهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ إِنَّهُۥ مِنۡ عِبَادِنَا ٱلۡمُخۡلَصِينَ-

তাকে ইউসুফ (আ.) কে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্যই এভাবে আমি আমার নিদর্শন দেখালাম। কারণ তিনিতো ছিলেন আমার একান্ত একনিষ্ঠ বান্দাহদের অন্যতম।[১৩৮]

৩. ধৈর্য ধরুন। কারণ কোনো অভ্যাসগত কঠিন পাপ ছাড়ার জন্য ধৈর্যের একান্তই প্রয়োজন। সুতরাং ধৈর্য ধারনের জন্য বারবার কসরত করতে হবে। এমনিভাবেই ধীরে ধীরে এক সময় ধৈর্য ধারণ অভ্যাসে পরিণত হবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ-

যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে এমন কিছু দেননি যা ধৈর্যের চাইতেও উত্তম এবং বিস্তর কল্যাণকর।[১৩৯]

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মনের কোনো চাহিদা পূরণ করা থেকে ধৈর্য ধারণ করা যে কারোর জন্য অবশ্যই অনেক সহজ তা পূরণ করার পর যে কষ্ট, শাস্তি, লজ্জা, আফসোস, লাঞ্ছনা, ভয়, চিন্তা, অস্থিরতা পেয়ে বসবে কা থেকে ধৈর্য ধারণ করার চাইতে। তাই একেবারে শুরুতেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

৪. মনের বিরোধিতা করতে শিখুন। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মনের বিরোধিতা করবে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

---

১৩৮. *আল কুরআন*, ১২ : ২৪
১৩৯. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৪৬৯, ৬৪৭০

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ-

যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের সাথেই রয়েছেন।[১৪০]

৫. আল্লাহ তা'য়ালা যে সর্বদা আপনার কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই আছেন তা অনুভব করতে শিখুন। সুতরাং উক্ত কাজ করার সময় মানুষ আপনাকে না দেখলেও আল্লাহ তা'য়ালাযে আপনার প্রতি দেখেই আছেন তা ভাবতে হবে। এরপরও যদি আপনি উক্ত কাজে লিপ্ত থাকেন তখন অবশ্যই একথা ভাবতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালার সম্মান ও মর্যাদা আপনার অন্তরেন নেই। তাই আল্লাহ তা'য়ালা আপনার উক্ত কর্ম দেখলেও আপনার এতটুকুও লজ্জা হয় না। আর যদি আপনি এমন বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার কর্মকান্ড দেখছেনই না তাহলেতো আপনি নিশ্চয় কাফির।

৬. জামা'আতে সালাত পড়ার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হোন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ-

নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[১৪১]

৭. বেশিবেশি নফল সাওম পালন করতে চেষ্টা করুন। কারণ সাওমের মধ্যে বিশেষ ফযিলতের পাশাপাশি উত্তেজনা প্রশমনেরও এক বাস্তবমুখী ব্যবস্থা রয়েছে। তেমনিভাবে সাওম আল্লাহভীরুতা শিক্ষা দেওয়ার জন্যও এক বিশেষ সহযোগী।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ-

হে যুবকরা! তোমাদের কেউ স্ত্রী সঙ্গমে সক্ষম হলে সে যেন দ্রুত বিবাহ করে নেয়। কারণ বিবাহ তার চোখকে নিম্নগামী করবে এবং তার লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে। আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন সাওম পাল করে। কারণ সাওম তার জন্য একান্ত যৌন উত্তেজনা প্রতিরোধক।[১৪২]

---

১৪০. *আল কুরআন*, ২৯ : ৬৯
১৪১. *আল কুরআন*, ২৯ : ৪৫
১৪২. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৯০৫, ৫০৬৬

৮. বেশিবেশি কুরআন তিলাওয়াত করুন। কারণ কুরআন হচ্ছে সর্বরোগের চিকিৎসা। তাতে নূর, হিদায়াত, মনের আনন্দ ও প্রশান্তি রয়েছে। সুতরাং উক্ত রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বেশিবেশি কুরআন তিলাওয়াত, মুখস্থ ও তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা অবশ্যই কর্তব্য যাতে তার অন্তর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যায়।

৯. বেশিবেশি আল্লাহর যিকির করুন। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার যিকিরে অন্তরের বিরাট একটা প্রশান্তি রয়েছে এবং যে অন্তর সর্বদা আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকে শয়তান সে অন্তর থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। সুতরাং এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য যিকির অত্যন্ত উপকারী।

১০. আল্লাহ তা'য়ালার সকল বিধি-বিধানের প্রতি যত্নবান হোন। তাহলে আল্লাহ তা'য়ালাও আপনার প্রতি যত্নবান হবেন। আপনাকে জিন ও মানব শয়তান এবং অন্তরের কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করবেন। আপনার ধার্মিকতা, সততা, মানবতা এবং সম্মানও রক্ষা করবেন।

১১. অতি তাড়াতাড়ি বিবাহ কার্য সম্পাদন করুন। তাহলে যৌন উত্তেজনা প্রশমনের জন্য সহজেই আপনি একটি হালাল ক্ষেত্র পেয়ে যাবেন।

১২. জান্নাতের হুরের কথা বেশিবেশি স্মরণ করুন। যাদের চোখ হবে বড়বড় এবং যারা হবে অতুলনীয় সুন্দরী লুক্কায়িত মুক্তার ন্যায়। নেককার পুরুষদের জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদেরকে পেতে হলে দুনিয়ার এ ক্ষণিকের অবৈধ স্বাদ পরিত্যাগ করতেই হবে।

১৩. শ্মশ্রু বিহীন সে প্রিয় ছেলেটি থেকে খুব দূরে থাকুন যাকে দেখলে আপনার অন্তরের সে লুক্কায়িত কামনা-বাসনা দ্রুত জাগ্রত হয়। এমন দূরে থাকবেন যে সে যেন কখনো আপনার চোখে না পড়ে এবং তার কথাও যেন আপনি কখনো শুনতে না পান। কারণ বাহ্যিক দূরত্ব অন্তরের দূরত্ব সৃষ্টি করতে অবশ্যই বাধ্য।

১৪. তেমনিভাবে উত্তেজনাকর সকল বস্তু থেকেও দূরে থাকুন যেগুলো আপনার লুক্কায়িত কামনা-বাসনাকে দ্রুত জাগ্রত করে। অতএব মহিলাও শ্মশ্রু বিহীন ছেলেদের সাথে মেলামেশা করবেন না। বিশ্রী ছবি ও অশ্লীল গান শুনবেন না। আপনার নিকট যে অডিও ভিডিও ও ক্যাসেট, ছবি ও চিঠি রয়েছে সবগুলো দ্রুত নস্যাৎ করে দিন। উত্তেজনাকর খাদ্যদ্রব্য আপাতত বন্ধ রাখুন। তা কিছুদিনের জন্য গ্রহণ করবেন না। ইতোপূর্বে যেখানে উক্ত কাজ সম্পাদিত হয়েছে সেখানে আর যাবেন না।

১৫. লাভজনক কাজে ব্যস্ত থাকুন। কখনো একা ও অবসর থাকতে চেষ্টা করবেন না। পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাত করতে পারেন। ইত্যবসরে ঘরের

প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে পারেন। কুরআন শরীফ মুখস্থ করতে পারেন অথবা অন্তত পক্ষে বেচাকেনা নিয়েও ব্যস্ত থাকতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৬. সর্বদা শয়তানের ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করুন। কোনো কুমন্ত্রনাকে এতটুকুর জন্যও অন্তরে স্থান দিবেন না।

১৭. নিজের মনকে দৃঢ় করুন। কখনো নিরাশ হবেন না। কারণ এ ব্যাধি এমন নয় যে তার কোনো চিকিৎসা নেই। সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন কেন?

১৮. উচ্চাকাঙ্খী হোন। উচ্চাভিলাসের চাহিদা হচ্ছে এই যে, আপনি সর্বদা উন্নত গুণে গুণান্বিত হতে চাইবেন। অরুচিকর অভ্যাস ছেড়ে দিবেন। লাঞ্ছনার স্থানসমূহে কখনো যাবেন না। সমাজের সম্মানী ব্যক্তিসেজে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব হাতে নিবেন।

১৯. অভিনব বিরল চিকিৎসাসমূহ থেকে দূরে থাকুন। যেমন : কেউ উক্ত কাজ ছাড়ার জন্য এভাবে মানত করলো যে, আমি যদি এমন কাজ আবারো করে ফেলি আল্লাহ তা'য়ালার জন্য ছয় মাস সিয়াম পালন করা অথবা দশ হাজার রিয়াল সাদাকা করা আমার ওপর বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। তেমনিভাবে এ বলে কসম খেলো যে আল্লাহর কসম! আমি আর এমন কাজ করবো না। শুরুতে কসমের কাফফারার ভয়ে অথবা মানত ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে উক্তকাজ করা থেকে বেঁচে থাকলেও পরবর্তীতে তা কাজে নাও আসতে পারে।

কখনো কখনো কেউ কেউ কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী কোনো কোনো ঔষধ সেবন করে। তা একেবারেই ঠিক নয়। কারণ তাতে হিতে বিপরীতও হতে পারে।

২০. নিজের মধ্যে প্রচুর লজ্জাবোধ জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ লজ্জাবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যা কল্যাণই কল্যাণ এবং তা ঈমানেরও একটি বিশেষ অঙ্গ বটে। লজ্জাবোধ মানুষকে ভালো কাজ করতে উৎসাহ যোগায় এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজ করলে যেকোনো ব্যক্তির মাঝে ধীরে ধীরে লজ্জাবোধ জন্ম নেয় :

১. বেশিবেশি রাসূল (স.) এর জীবনী পড়বেন।

২. সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ও প্রসিদ্ধ লজ্জাশীল সালফেসালেহীনদের জীবনী পড়বেন।

৩. লজ্জাশীলতার ফলাফল সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করবেন। বিশেষকরে লজ্জাহীনতার ভীষণ কুফল সম্পর্কেও সর্বদা ভাববেন।

৪. এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবেন যা বললে বা করলে লজ্জাবোধ কমে যায়।

৫. লজ্জাশীলদের সাথে বেশিবেশি উঠা বসা করবেন এবং লজ্জাহীনদের থেকে একবারেই দূরে থাকবেন।

৬. বারবার লজ্জাশীলতার কসরত করবেন। তাহলে একদা আপনি অবশ্যই লজ্জাশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে এমন গুণ থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। তখনই সে বড় হলে তা তার বিশেষ কাজে আসবে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন,

إِذَا كَانَ فِيْ الصَّبِيِّ خَصْلَتَانِ : الْـحَيَاءُ وَالرَّهْبَةُ رُجِيَ خَيْرُهُ-

কোনো বাচ্চার মধ্যে দুটি গুণ থাকলেই তার কল্যাণের আশা করা যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে লজ্জা আর অপরটি হচ্ছে ভয়-ভীতি। ইমাম আসমাঈ (রহ.) বলেন,

مَنْ كَسَاهُ الْـحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ-

লজ্জা যার ভূষণ হবে মানুষ তার দোষ দেখতে পাবে না।

২১. যারা অন্যজন কর্তৃক এ জাতীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন (বিশেষ করে উঠতি বয়সের ছেলেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) তাদের একান্তই কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা সতর খোলা থেকে সতর্ক থাকা। চাই তা খেলা ধুলার সময়হোক বা অন্য কোনো সময়। কারণ এরই মাধ্যমে সাধারণত অন্যজন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

২২. সাজ- সজ্জায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখবেন। উঠতি বয়সের ছেলেদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষভাবেই প্রযোজ্য। সুতরাং এদরে জন্য কখনো উচিৎ নয় যে, এরা কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করবে। ব্যতিক্রমধর্মী আঁটসাঁট পোশাক পরবে। সাজ-সজ্জার ব্যাপারে কাফির ও মহিলাদের অনুসরণ করবে। মাথা আঁচড়ানো বা চুলের ভাঁজের প্রতি গুরুত্ব দিবে। কারণ তা অন্যের ফিৎনার কারণ।

২৩. উঠতি বয়সের ছেলেদের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে তারা যে কারোর সঙ্গে মজা বা রঙ্গ-তামাশা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ অধিক কৌতুক মানুষের সম্মান বিনষ্ট করে দেয় এবং বোকাদেরকে তার ব্যাপারে অসভ্য আচরণ করতে সাহসী করে তোলে। তবে জায়েয কৌতুক একেবারেই নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তা নেককারদের সঙ্গেই হওয়া উচিৎ এবং তা ভদ্রতা ও মধ্যপন্থা বজায় রেখেই করতে হবে।

২৪. আত্মসমালোচনা করতে শিখবেন। সময় থাকতে এখনই নিজের মনের সঙ্গে ভালোভাবে বুঝা পড়া করে নিবেন। চাই আপনি ছোটই হোন অথবা বড়। সেই কর্মটি আপনি করে থাকুন অথবা তা আপনার সাথেই করা হোকনা কেন।

আপনি যদি বড় বা বয়স্ক হয়ে থাকেন তাহলে আপনি নিজ মনকে এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, এখনো আমি কিসের অপেক্ষায় রয়েছি? এরকম মারাত্মক কাজটি এখনো ছাড়ছি না কেন? আমি কি সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালার শাস্তি অপেক্ষা করছি? নাকি মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছি?

আর যদি আপনি অল্প বয়স্ক বা ছোট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি নিজ মনকে এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, আমি কি এব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমি অনেক দিন বাঁচবো। নাকি যেকোনো সময় আমার মৃত্যু আসতে পারে; অথচ আমি তখনো উক্ত গুণাহে লিপ্ত। আর যদি আমি বেঁচেই থাকি তাহলে এমন ঘৃণ্য কাজ নিয়েই কি বেঁচে থাকবো? আমার যৌবন কি একাজেই ব্যয় হতে থাকবে? আমি কি বিবাহ করবো না? তখন আমার স্ত্রীও সন্তানের কী পরিণতি হবে? আমি কি কোনো একদিন মানুষের কাছে লাঞ্ছিত হবো না? আমি কি কখনো কঠিন রোগ আক্রান্ত হবো না? আমার কারণেই কি এ পবিত্র সমাজ ধ্বংসের পথে এগুচ্ছে না? আমি কি আল্লাহ তা'য়ালার শাস্তি ও অভিশাপের কারণ হচ্ছি না? কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালার সামনে আমার অবস্থান কী হবে?

২৫. উক্ত কর্মের পরিণতি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করবেন। কারণ কিছুক্ষণের মজার পরই আসছে দীর্ঘ আফসোস, লজ্জা, অপমান ও শাস্তি।

২৬. মনে রাখবেন, এ জাতীয় মজার কোনো শেষ নেই। এ ব্যাধি হচ্ছে চুলকানির ন্যায়। যতই চুলকাবেন ততই চুলকানি বাড়বে। একটি শিকার মিললেই আরেকটি শিকারের ধান্ধায় থাকতে হবে। কখনোই আপনার এ চাহিদা মিটবে না।

২৭. নেককারদের সাথে ওঠা বসা করবেন ও বদকার থেকে দূরে থাকবেন। কারণ নেককারদের সাথে ওঠা বসা করলে অন্তর সজীব হয়, ব্রেইন আলোকিত হয়। আর বদকারদের থেকে দূরে থাকলে ধর্ম ও ইয্যত রক্ষা পায়।

২৮. বেশিবেশি রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করবেন। বারাবার মৃত ব্যক্তির লাশ দেখতে যাবেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করবেন ও তার কবর যিয়ারত করবেন। তেমনিভাবে মৃত্যু ও মৃত্যুও পরের অবস্থা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করবেন। কারণ তা যৌন উত্তেজনা প্রশমনের এক বিশেষ সহযোগী।

২৯. কারোর হুমকির সামনে কোনো ধরনের নতিস্বীকার করবেন না। বরং তা দ্রুত প্রশাসনকে জানাবেন। বিশেষ করে এ ব্যাপারটি ছোটদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। কারণ এ কথাটি আপনি বিশেষভাবেই জেনে রাখবেন যে, এ জাতীয় ব্যক্তিরা যতই কাউকে ভয় দেখাক না কেন তারা এ ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তির কঠিনতা বা সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা দেখলে অবশ্যই পিছপা হতে বাধ্য হবে।

কেউ এ ব্যাপারে নিজকে অক্ষম মনে করলে সে যেন দ্রুত তা নিজ পিতা, বড় ভাই, আস্থাভাজন শিক্ষক অথবা কোনো ধার্মিক ব্যক্তিকে জানায়, যাতে তাঁরা তাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে।

৩০. বেশিবেশি সাধুতা ও তাওবাকারীদের কাহিনী সম্ভার পড়বেন। কারণ তাতে বহু ধরণের শিক্ষা, আত্ম সম্মানের প্রতি উৎসাহ এবং বিশেষভাবে অসম্মানের প্রতি নিরুৎসাহ সৃষ্টি হবে।

৩১. বেশিবেশি করে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ক্যাসেটসমূহ বিশেষ মনযোগসহ শ্রবণ করবেন এবং গানের ক্যাসেটসমূহ শুনা থেকে একেবারেই বিরত থাকবেন।

৩২. সমাজের যে যে নেককার ব্যক্তিরা যুবকদের বিষয়সমূহ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন তাদের কারোর নিকট নিজের এ দুরাবস্থা বিস্তারিত জানাবেন যাতে তাঁরা আপনাকে এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকটও আপনার এ অবস্থার পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেন যাতে তিনি আপনাকে উপযুক্ত চিকিৎসা দিতে পারেন অথবা উত্তেজনা প্রশমনের কোনো পদ্ধতি বাতলিয়ে দিতে পারেন।

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষেরই এ কথা জানা উচিৎ যে, শরীয়ত ও বিবেককে আশ্রয় করেই কোনো মানুষ তার সার্বিক কল্যাণ ও তার পরিপূর্ণতা এবং সকল অঘটন অথবা অন্ততপক্ষে তার কিয়দংশ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে থাকে।

সুতরাং বিবেকবানের সামনে যখন এমন কোনো ব্যাপার এসে পড়ে যার মধ্যে ভালো ও খারাপ উভয় দিকই রয়েছে তখন তার ওপর দুটি কর্তব্য এস পড়ে। তন্মধ্যে একটির সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে এবং অপরটির সম্পর্ক কাজের সাথে। অর্থাৎ তাকে সর্ব প্রথম এ কথা জানতে হবে যে, উক্ত উভয় দিকের মধ্য থেকে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সে সেটিকেই প্রাধান্য দিবে। আর এ কথা সবারই জানা যে, কোনো মেয়ের বা শ্মশ্রু বিহীন ছেলের প্রেমে পড়ার মধ্যে দুনিয়াবী বা ধর্মীয় কোনো ফায়েদা নেই।

বরং তাতে দীন-দুনিয়ার অনেকগুলো গুরুতর ক্ষতি রয়েছে, যার কিয়দংশ নিম্নরূপ :

ক. আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা ও তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে তাঁর কোনো সৃষ্টির ভালোবাসা ও তাঁর স্মরণে নিমগ্ন হওয়া। কারণ উভয়টি একত্রে সমভাবে কারোর হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে না।

খ. তার অন্তর আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসার দরুন নিদারুণ কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হয়। কারণ প্রেমিক কখনো চিন্তামুক্ত হতে পারে না। বরং তাকে সর্বদাই চিন্তাযুক্ত থাকতে হয়। প্রিয় বা প্রিয়াকে না পেয়ে থাকলে তাকে পাওয়ার চিন্তা এবং পেয়ে থাকলে তাকে আবার কখনো হারানোর চিন্তা।

গ. প্রেমিকের অন্তর সর্বদা প্রিয় বা প্রিয়ার হাতেই থাকে। সে তাকে যেভাবেই চালাতে চায় সে সেভাবেই চলতে বাধ্য। তখন তার মধ্যে কোনো নিজস্ব ইচ্ছা অবশিষ্ট থাকে না। এর চাইতে আর বড় কোনো লাঞ্চনা আছে কি?

ঘ. দীন-দুনিয়ার সকল কণ্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হয়। কারণ ধর্মীয় কল্যাণের জন্যতো আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি অন্তরের উন্মুখতা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর তা প্রেমিকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অন্যদিকে দুনিয়াবী কল্যাণতো দীনি কল্যাণেরই অধীন। দীনি কল্যাণ যার হাত ছাড়া হয় দুনিয়ার কল্যাণ সুষ্ঠুভাবে কখনো তার হস্তগত হতে পারে না।

ঙ. দীন-দুনিয়ার সকল বিপদ তার প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। কারণ মানুষ যখন আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কারোর প্রেমে পড়ে যায় তখন তার অন্তর আল্লাহ বিমুখ হয়ে পড়ে। আর কারোর অন্তর আল্লাহ বিমুখ হলে শয়তান তার অন্তওে হাঁটু গেড়ে বসে। তখনই সকল বিপদাপদ তার দিকে দ্রুত ধাবমান হয়। কারণ শয়তানতো মানুষের আজন্ম শত্রু। আর কারোর কঠিন শত্রু যখন তার ওপর কাবু করতে পারে তখনি সে তার যথাসাধ্য ক্ষতি না করে এমনিতেই বসে থাকবে?

চ. শয়তান যখন প্রেমিকের অন্তরে অবস্থান নিয়ে নেয় তখন সে তাকে বিক্ষিপ্ত করে ছাড়ে এবং তাতে প্রচুর ওয়াসওয়াসা ঢেলে দেয়। কখনো কখনো এমন হয় যে, সে একান্ত বদ্ধ পাগলে পরিণত হয়। লাইলী প্রেমিক ঐতিহাসিক প্রেম পাগল মজনুর কথাতো আর কারোর অজানা নয়।

ছ. এমনকি প্রেমিক কখনো কখনো প্রেমের দরুন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নিজের সকল অথবা কিছু বাহ্যেন্দ্রিয় হারিয়ে বসে। প্রত্যক্ষতো এভাবে যে, প্রেমে পড়েতো অনেকে নিজ শরীরই হারিয়ে বসে। ধীরে ধীরে তার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তার কোনো ইন্দ্রিয়ই আর সুষ্ঠুভাবে বাহ্যিক কোনো কাজ সমাধা করতে পারে না।

একদা জনৈক যুবককে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর নিকট হাযির করা হলো। তখন তিনি আরাফা ময়দানে অবস্থানরত। যুবকটি একেবারেই দুর্বল হয়ে হাড্ডি সার হয়ে গেলো। তখন

ইবনে আব্বাস (রা.) উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন; যুবকটির কি হলো? লোকেরা বললো, সে প্রেমে পড়েছে। একথা শুনেই তিনি তখন থেকে পুরোদিন আল্লাহ তা'য়ালার নিকট প্রেম থেকে আশ্রয় কামনা করেন। পরোক্ষ বাহ্যেন্দ্রিয় লোপতো এভাবেই যে, প্রেমের দরুন তার অন্তর যখন বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তার বাহ্যেন্দ্রিয়গুলোও আর সঠিক কাজ করে না। তখন তার চোখ আর তার প্রিয়ার কোনো দোষ দেখে না। কান আর প্রিয়কে নিয়ে কোনো গাল শুনতে বিরক্তি বোধ করে না। মুখ আর প্রিয়ের অযথা প্রশংসা করতে লজ্জা পায় না।

জ. ইশকের পর্যায়ে যখন কেউ পৌঁছে যায় তখন তার প্রিয় পাত্রই তার চিন্তা-চেতনার একান্ত কেন্দ্র বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। তখন তার সকল শারীরিক ও মানসিক শক্তিসমূহ অচল হয়ে পড়ে। তখন সে এমন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যার চিকিৎসা একেবারেই দুষ্কর। এছাড়াও প্রেমের আরো অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন : কোনো প্রেমিক যখন লোক সমাজে তার প্রেমের কথা প্রকাশ করে দেয় তখন তার প্রিয়ার ওপর সর্বপ্রথম বিশেষভাবে যুলুম করা হয়। কারণ মানুষ তখন অনর্থকভাবে তাকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করতে থাকে। এমনকি তার ব্যাপারে কোনো মানুষ কোনো কথা বানিয়ে বললেও অন্যরা তা বিশ্বাস করতে একটুও দেরি করে না। এমনকি শুধু প্রিয়ার ওপরই যুলুম সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা তার সমস্ত পরিবারবর্গের ওপরও বার্তায়। কারণ এতে করে তাদেরও প্রচুর মানহানি হয়। অন্যদেরকেও মিথ্যারোপের গুণাহে নিমজ্জিত করা হয়। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য অন্যেও সহযোগিতা নেওয়া হয় তখন তারাও গুণাহগার হয়। এ পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে তাদের অনেককে কখনো হত্যাও করা হয়।

কতোকতো গভীর সম্পর্ক যে এ কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কতো প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের অধিকার যে এক্ষেত্রে বিনষ্ট হয় তার কোনো হিসাব নেই। আর যদি এক্ষেত্রে যাদুর সহযোগিতা নেওয়া হয় তাহলে একেতো শির্ক আবার এর ওপর কুফুরী। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া মিলেই যায় তখন একে অপরকে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যেও ওপর যুলুম করতে সহযোগিতা করে এবং একে অপরের সন্তুষ্টির জন্য কতো মানুষের কতো মাল যে হরণ করে তার কোনো হিসাব নেই। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া অত্যন্ত চতুর হয়ে থাকে তখন সে প্রেমিককে আশা দিয়ে দিয়ে তার সকল সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়। কখনো সে এমনকান্ড একই সঙ্গে অনেকের সাথেই করে বেড়ায়। তখন প্রেমিক রাগ করে কখনো তাকে হত্যা বা মারাত্মকভাবে আহত করে। আরো কতো কি? সুতরাং কোনো বুদ্ধিমান এতো কিছু জানার পরও এ জাতীয় প্রেমে কখনো আবদ্ধ হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে এ জাতীয় অবৈধ সম্পর্ক থেকে দূরে রাখুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পর্দা

ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর মর্যাদা, সম্মান ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি, রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের ওপর আরোপ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান। মূলত হিজাব বা পর্দা নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও ইয্যত-আবরুর রক্ষাকবচ। নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়।

এ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, এ বিধান তোমোদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[১৪৩]

ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি। বরং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার্থেই তাদের ওপর এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহতো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।[১৪৪]

এজন্য পর্দা-বিধান ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজ-ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের নারীদের জন্য অনেক বড় ইহসান। এ বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলিল।

মানবসমাজকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দা বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারী জাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দা-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ এখন সময়ের দাবি।

---

১৪৩. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৩
১৪৪. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৩

পর্দার শাব্দিক পরিচয় :

'পর্দা' শব্দটি মূলত ফার্সি। যার আরবি প্রতিশব্দ 'হিজাব'। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ-আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, অন্তরায়, আচ্ছাদন, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেয়া, গোপন করা ইত্যাদি।

পর্দার পারিভাষিক পরিচয় :

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলে।

আবার কেউ কেউ বলেন, নারী তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে তাকে পর্দা বলা হয়।

মূলত হিজাব বা পর্দা অর্থ শুধু পোশাকের আবরণই নয়, বরং সামগ্রিক একটি ব্যবস্থা, যাতে নারী-পুরুষের মধ্যে অপবিত্র ও অবৈধ সম্পর্ক এবং নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারী আচরণ রোধের উপায় রয়েছে।

পর্দার বিধান

পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলির মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান।

আল্লাহ তা'য়ালাই এ বিধানের প্রবর্তক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[১৪৫]

এ বিধানের প্রতি পুর্ণ সমর্পিত থাকাই ঈমানের দাবি। এ বিধানকে হালকা মনে করা কিংবা এ বিধানকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী শওীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা কোনো মুমিন নারীর জন্য সে বিষয় অমান্য করার কোনো অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট।[১৪৬]

---

১৪৫. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৩
১৪৬. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৬

পর্দার গুরুত্ব

পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৪৭]

এ আয়াতে পর্দার সঙ্গে চলাফেরা করার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে যে, পর্দার সহিত চলাফেরা করলে সবাই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে পর্দানশীল নারীদেরকে কেউ উত্যক্ত করার সাহস করবে না।

প্রকৃতপক্ষে যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে অধিকাংশ সময় তারাই ইভটিজিং ও ধর্ষণসহ নানা রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং রাস্তাঘাটে তারাই বেশি ঝামেলার শিকার হয়। তাই নারীর সতীত্ব ও ইয্যত-আবরুর রক্ষার্থে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীসেও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (স.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।[১৪৮]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট ছিলেন। তখন নবী (স.) সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? তারা চুপ হয়ে গেলেন।(কেউ বলতে পারলেন না।)

অতঃপর আমি ফিরে এসে ফাতেমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? তিনি বললেন, কোনো পর পুরুষ তাকে দেখবে না (অর্থাৎ নারী পর্দাবৃত থাকবে)। তারপর আমি ঐ বিষয়টি নবী (স.) এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয় ফাতেমা আমার অংশ, সে সত্য বলেছে। এতে পর্দার গুরুত্ব প্রস্ফুটিত হয়। আর পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় বিবেকের দাবীও তাই। এছাড়াও পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে।

---

১৪৭. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯
১৪৮. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১১৭৩

কেননা হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা পর্দানশীলদের ভালোবাসেন। আর কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।'[১৪৯]

প্রকৃত অর্থে তাকওয়া সম্পন্ন বা মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নির্দেশসমূহ মেনে চলে। আর সর্বসম্মতিক্রমে পর্দা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। যেহেতু পর্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য অবশ্য পালনীয় সেহেতু পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে।

এছাড়াও পর্দা-বিধান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা উপলদ্ধি করতে পারি যে, এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত হয়। পারিবারিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়। কারণ পর্দা পালনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরকিয়াবিহীণ পবিত্র জীবন গঠিত হয় এবং চরিত্রহীণতা ও অবিশ্বাস তাদের থেকে বিদায় নেয়। তাই মুসলিম উম্মাহ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য যে, দুনিয়া ও আখিরাতে পর্দার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পর্দাহীনতার পরিণতি :

মূলত পর্দাহীনতার কারণে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট পাপের সূচনা হয়। যার কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌন সন্ত্রাস মারাত্মক আকার ধারণ করে। ফলে নানা অঘটনসহ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। যার বাস্তব চিত্র নিত্যদিনের সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে।

এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে পরকিয়া ও চরিত্রহীনতার মতো ঘৃণিত কর্মের সূত্রপাত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ওঠে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে। যার বাস্তবতা আজ আমাদের নখদর্পনে। মূলত পর্দাহীন নারীরা হচ্ছে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী। তাদের ব্যাপারে বিশ্বনবী (স.) বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।[১৫০]

---

১৪৯. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১৩
১৫০. *বায়হাক্বী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস- ১৩২৫৬

তাই আমরা বলতে পারি যে, সুসভ্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এমনকি অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- রাসূল (স.) তাদেরকে লা'নত দিয়েছেন।
এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (স.) লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন সেসব নারীদেরকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। অর্থাৎ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।[১৫১]

এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করা হয়। আর এ অবাধ্যতার কারণে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী (স.) বলেন, দুই শ্রেণির জাহান্নামীদেরকে আমি দেখিনি (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে তাদের দেখা যাবে)।

এক. এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, আর সে চাবুক দিয়ে তারা (অন্যায়ভাবে) মানুষকে প্রহার করবে।

দুই. এমন নারী, যারা পোশাক পরিধান করা সত্ত্বেও নগ্ন। তারা অন্যদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়।[১৫২]

এ হাদীসে মূলত পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, তার জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

এ হাদীস থেকে পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই জান্নাত প্রত্যাশী কোনো নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, যেসব পুরুষ তাদের অধীনস্ত নারীদের পর্দায় রাখার চেষ্টা করে না, তাদের জন্যও রয়েছে অনুরূপ পরিণতি।

---

১৫১. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস- নং ৪০৯৭
১৫২. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫৪৪৫

যেভাবে পর্দা পালন করতে হবে :

একজন নারীর পর্দা পালনের তিনটি পর্যায় রয়েছে। যথা : গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা, বাইরে গমনকালীন পর্দা এবং বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা। কুরাআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পর্যায়ে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। সামনে পর্দার তিনটি পর্যায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হলো।

গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা :

নারীর প্রধান আবাসস্থল হলো তার গৃহ। সাধারণত গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা নারীর জন্য শোভনীয়। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নারীদেরকে তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না।[১৫৩]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নারীর প্রকৃত অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। নারী প্রয়োজন ব্যতীত গৃহের বাইরে যাবে না বরং গৃহেই অবস্থান করবে।[১৫৪]

মূলত নারী নিজেকে যত সংযত ও আবৃত রাখে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সে ততোই প্রিয় হয়ে ওঠে। ইসলামের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ততোই উচ্চতর অবস্থায় ওঠে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যখন তোমরা তাদের (নবী পত্নীদের) কাছে কিছু চাইবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[১৫৫]

এ আয়াত বিশেষভাবে নবী-পত্নীদের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এ বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেওয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না, বরং পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিবে।

এ নির্দেশনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তেও গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষ, নিকটাত্মীয় হোক বা দূরাত্মীয় সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। তবে প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলবে। আর পরপুরুষরাও পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলতে হবে। এতে পর্দার অপরিহার্যতা প্রস্ফুটিত হয়।

---

১৫৩. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৩

১৫৪. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর (রহ.), *তাফসীরে ইবন কাসীর*, অনু : অধ্যাপক মাওলানা আক্তার ফারূক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৩), ৬/৪০৯

১৫৫. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৩

আয়াতের শেষাংশে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পর্দার এ বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রনা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূল (স.) এর পুণ্যাত্মা পত্নীদেরকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূল (স.) এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে। কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রনা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে।

(তাহলে বলুনতো) আজ এমন ব্যক্তি কে যে, তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী পত্নীদের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোনো অনিষ্টের কারণ হবে না।[১৫৬]

বহু বিশুদ্ধ হাদীস থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, উম্মাহাতুল মুমিনীন বা নবীপত্নীরা সাধারণত তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দা পালন করতেন। আল্লাহ তা'য়ালা মুমনি নারীদেরকেও অনুরূপভাবে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, (হে নবী!) মুমনি নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যা সাধারণত (অনিচ্ছা সত্বে) প্রকাশিত হয়ে যায় তা ভিন্ন। তারা যেন ওড়না দিয়ে তাদের বক্ষকে আবৃত করে রাখে।

আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণ না করে। হে মুমনিগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।[১৫৭]

---

১৫৬. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুপ্ত, ৭/১৯৫
১৫৭. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ এমন পুরুষ যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ। তারা ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সমানে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। এতে পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.) বলেন, তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাকো। তখন আনসার সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য।[১৫৮]

আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত 'হামউ' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বামীর নিকটাত্মীয়। শব্দটির উদ্দেশ্য ব্যাপক। শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর যেকোনো দিকের ভাই, চাচা, মামা, খালু, ফুফা এবং তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে সন্তান। যেমন : দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, তাদের প্রত্যেকের ছেলে সন্তান উত্যাদি।

ইমাম তিরমিযী, লাইস ইবনু সা'দ, আল্লামা কাযী ইয়ায ও তাবারীসহ বহু আলেম অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ নারীর জন্য তার দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর ও তাদের ছেলেদের সমানে নিজেকে প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে যেভাবে মৃত্যু থেকে দূরে থাকতে চায়।

আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে মাহরাম নয় এমন সকল পুরুষ থেকে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলবে। অর্থাৎ নারীরা এমনভাবে গৃহে অবস্থান করবে যাতে নিকটাত্মীয় বা দূরাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা বেগানা পুরুষের নযরে সে না পড়ে। গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে এভাবে পর্দারত থাকা নারীর জন্য অপরিহার্য।

বাইরে গমনকালীন পর্দা :

বলা বাহুল্য যে, নারীদের জন্য গৃহের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল (স.) তার স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।[১৫৯]

১৫৮. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫২৩২
১৫৯. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৭৯৫

মূলত ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই মানব প্রয়োজনের সকল দিকই ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পর্দাবৃত হয়েই বাইরে বের হতে হবে। কিছুতেই পর্দাহীনভাবে বের হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (স.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু, যখনই সে পর্দাহীনভাবে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকায়।[১৬০]

আর পবিত্র কুরআনে নারীদেরকে বাইরে গমনকালীন মুহূর্তে পূর্ণ পর্দা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশ, হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন (প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়) তাদের (পরিহিত) জিলবাবের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে বলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৬১]

এ আয়াতে নারীদেরকে বাইরে গমনের সময় তাদের পরিহিত জিলবাবের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, জিলবাব হলো নারীর এমন পোশাক যা দিয়ে তারা পুরো দেহ ঢেকে রাখে। অর্থাৎ বাইরে গমনের সময় দেহের সাধারণ পোশাক-জামা, পাজামা, ওড়না, ইত্যাদির ওপর আলাদা যে পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নারীর আপাদমস্তক আবৃত করা যায় তাকে জিলবাব বলা হয়। আমাদের দেশে যা বোরকা নামে পরিচিত।

এ থেকে বুঝা যায় যে, বাইরে গমনের সময় বোরকা পরিধান করে আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়া আবশ্যক। আর আয়াতে জিলবাবের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাথা ও মুখমন্ডল ঢেকে নেওয়া। যা সাহাবী, তাবেয়ী ও নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা (এ আয়াতে) মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে তারা যখন বাইরে যাবে তখন তারা যেন জিলবাব দিয়ে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) তাদের মাথার ওপর দিক থেকে তাদের মুখমন্ডলও আবৃত করে নেয়। তবে তারা (চলাফেরার সুবিধার্থে) একটি চোখ খোলা রাখবে।[১৬২]

---

১৬০. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১১৭৩
১৬১. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯
১৬২. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুপ্ত, ৬/৪৮২

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, আমি আবীদাহ সালামানীহকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি তার মাথা ও মুখমন্ডল ঢেকে নিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন যে, এ আয়াতে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) মাথা ও মুখমন্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৬৩]

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের পরবর্তী মুফাসসিরদের ব্যাখ্যার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাসীর, বায়যাবী, বাগভী, নাসাফী, সুয়ূতি, আবু বকর জাসসাস, মুফতি মুহাম্মাদ শফিসহ সব তাফসীরকারগণ এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। অর্থাৎ সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতে নারীদেরকে তাদের চেহারাসহ আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে বাইরে গমনকালীন পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, কোনো প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যেতে হলে তখন তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে চেহারাসহ গোটা দেহ আবৃত করে পূর্ণ পর্দাও সঙ্গে বের হওয়া। যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। এ ক্ষেত্রে জিলবাব বা বোরকা পরিধানের মাধ্যমে আপাদমস্তক আবৃত করে নিবে। প্রয়োজনে চেহারা বা মুখমন্ডলের জন্য আলাদা নিকাব ব্যবহার করবে। আর হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালীর জন্য মোজা পরিধান করবে। তবে চলাফেরার সুবিধার্থে রাস্তা-ঘাট দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখবে।

বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা :

বয়স্ক নারীদের জন্য পর্দা পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, অতিশয় বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তাদের অতিরিক্ত বস্ত্র খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১৬৪]

আয়াতের নির্দেশনা হলো, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয় তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। গায়রে মাহরাম ব্যক্তিও তার কাছে মাহরামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়। বৃদ্ধা নারীদের জন্য গায়রে মাহরাম পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত করা জরুরী নয়।[১৬৫]

---

১৬৩. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুপ্ত-৬/৪৮২
১৬৪. *আল কুরআন*, ২৪ : ৬০
১৬৫. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুপ্ত, ৬/৪৩৯

এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, চরম বার্ধক্যে পৌঁছার কারণে যেসকল নারী বিবাহের উপযুক্ত নয় এবং যাদের প্রতি কারো আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীর জন্যই এ বিধান। তাদেরকে এ সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়।

এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষদের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হলো, তারা তাদের সামনে সেজেগুঁজে যেতে পারবে না। এর সঙ্গে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধানের এ শিথিলতা কেবলই জায়েয পর্যায়ের। সুতরাং তারা যদি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য নারীদের মতো তারাও পরপুরুষদের সামনে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলে তবে সেটাই তাদের জন্য উত্তম।[১৬৬]

এ বিধানের ব্যাপারে সারকথা হলো, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সর্বসম্মতিক্রমে হিজাব বা পর্দা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নারী জাতির জন্য এক ফরয বিধান। সর্বাবস্থায় এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকা অপরিহার্য। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক শিথিলতা গ্রহণের অবকাশও অবশ্যই রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা যথাযথভাবে এ বিধান পালন করার তাওফীক দান করুক।

পবিত্র কুরআন এর আলোকে পর্দার অপরিহার্যতা ও বিধি বিধান :

প্রথম প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

১৬৬. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, অনু : মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ প্রকাশনী, প্রকাশকাল-তা.বি.) ২/৪৬৮

আর মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই-ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনাকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য করার জন্য সজোরে পদচারণ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।[১৬৭]

উদ্ধৃত এই আয়াত থেকে নারীর জন্য পর্দার অপরিহার্যতা নিম্নে বর্ণিত প্রণালীতে প্রতীয়মাণ হয়।

এক. আল্লাহ তা'য়ালা নারীদেরকে অবৈধ ও হারাম পন্থায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং ঐ সমস্ত ভুমিকা থেকে দূরে থেকে সতীত্ব সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন, যা পরিণতিতে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার সহায়ক হয়। সর্ব শ্রেণির লোকই জানে যে, নারীর জন্য চেহারা ঢাকা তার সতীত্ব সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম। কারণ নারীর চেহারা অনাবৃত রাখা হলে, পরপুরুষেরা তার দিকে কামুক দৃষ্টিতে তাকায় এবং তার অঙ্গশ্রী দেখে চোখের দ্বারা যৌনানন্দ উপভোগ করার সুযোগ পায়। পরিণামে সেই নারীর সাথে বাক্যালাপ, পত্রালাপ ও সাক্ষাত ইত্যাদি অবৈধ পন্থা অবলম্বনের কারণ হয়ে দাড়ায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স.) বলেন,

العينان تزنيان و زناهما النظر (মানুষের) চক্ষু দুটিও যেনা করে, আর চক্ষুদ্বয়ের যেনা হলো দৃষ্টিপাত করা।(আল হাদীস) নবী (স.) পরিশেষে বলেছেন, যেনার সকল স্তর পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করার সর্বশেষ গুপ্তাঙ্গ যেনার অতিক্রান্ত স্তরসমূহকে সত্যায়ন করে। অর্থাৎ যৌন মিলনের মাধ্যমে যেনার পরিসমাপ্তি ঘটে। অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অর্থাৎ গুপ্তাঙ্গের যেনা সংঘটিত হয় না। সুতরাং যখন মুখমন্ডল আবৃত রাখা যৌনাঙ্গ হিফাযতের মাধমে সাব্যস্ত হলো, তখন প্রতীয়মান হয় যে, মুখশন্ডল আবৃত রাখা শরীয়তের নির্দেশিত। কেননা উদ্দেশ্যের যা হুকুম মাধ্যমেরও সে হুকুম।

১৬৭. আল কুরআন, ২৪ : ৩১

দুই. আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ "তারা যেন বক্ষদেশে নিজদের ওড়না ফেলে রাখে।"[১৬৮]

পবিত্র কুরআনের আয়াতে উল্লেখিত আরবি 'খুমুরুন' শব্দটি খিমার শব্দের বহুবচন।"খিমার" ঐ কাপড়কে বলা হয় যা নারীরা মাথায় ব্যবহার করে এবং তাদ্বারা গলা ও বক্ষ পানি ভরা কুপের মতো আবৃত হয়ে যায়।

সুতরাং গলা আবৃত করার নির্দেশের দ্বারা চেহারা আবৃত করার নির্দেশ প্রমাণিত হয়। কেননা যখন গলা ও বক্ষ পর্দার আওতাধীন তাহলে মুখমন্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অধিক যুক্তিযোগ্য। কারণ নারীর মুখমন্ডল তার যাবতীয় রূপ ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস ও আকর্ষণ। এ কারণেই একজন নারীর সমগ্র দেহ অপেক্ষা তার মুখমন্ডল দেখলে নৈতিক বিপর্যয় ঘটার আশংকা বেশি থাকে। তাছাড়া লোক সমাজে নারীর সৌন্দর্য তার চেহারার সৌন্দর্যের ওপরেই নির্ভর করে, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি মানুষ তেমন খেয়াল করে না। আলোচনার সময় যদি কেউ বলে, অমুক মহিলা রূপবতী-সুন্দরী তখন শ্রোতা বিনা দ্বিধায় সে মহিলার চেহারার সৌন্দর্যই বুঝে নেয়।

এতে প্রমাণিত হয় যে, পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় নারীর চেহারার সৌন্দর্যই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এরপর একটু চিন্তা করলে উপলব্ধি করা যাবে যে, প্রজ্ঞা ভিত্তিক ইসলামী শরীয়ত গলা ও বক্ষদেশকে পর্দার অন্তর্ভুক্ত করে মুখমন্ডলের মতো ফিৎনা ও বিপর্যয়ের উৎসকে কেমন করে পর্দা বহির্ভুত করে খোলা রাখার অনুমতি দিতে পারে? (না তা কখনো হতে পারে না বরং মুখমন্ডল খোলা রেখে পুরোপুরি পর্দা পালন হতেই পারে না।)

তিন. আল্লাহ তা'য়ালা সৌন্দর্য প্রকাশ করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেন, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا এবং তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য ততটুকু ভিন্ন যতটুকু স্বভাবতই প্রকাশ হয়ে পড়ে।[১৬৯]

অর্থাৎ নারীর কোনো সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য যে সব সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য আপনা আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন। যেমন : বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদি। এগুলো প্রকাশ করাতে গুণাহ নেই। এ জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন, ততটুকু ভিন্ন যতটুকু স্বভাবতই প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি বলেননি যতটুকু তারা প্রকাশ করে। আবার এ

১৬৮. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১
১৬৯. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১

আয়াতেই আল্লাহ তা'য়ালা সৌন্দর্য প্রদর্শন করার নিষিদ্ধতা ঘোষণা করেছেন এবং তারা যেন তাদের স্বামী (আয়াতে উল্লেখিত মোট বারোজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকদের) ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।

উক্ত আয়াতে দুই জায়গায় যীনাত শব্দ ব্যবহার করে ব্যতিক্রম ব্যক্তিদের বিধান বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যীনাত (সাজ- পোশাক) দুই প্রকার। দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যথা-

প্রথম : যীনাত যা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে এমনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। যেমন- উপরের কাপড়, বোরকা ইত্যাদি ওগুলো ঢেকে রাখা অসম্ভব (তাই তা দেখা ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত)

দ্বিতীয় : যা অপ্রকাশমান (গোপনীয়) অর্থাৎ যে সাজের মাধ্যমে নারী নিজেকে সুসজ্জিত করে, যা অনিচ্ছাকৃতভাবে-স্বভাবতই প্রকাশ পায় না।

এ দ্বিতীয় প্রকার যীনাত দর্শন করা সকলের জন্য না। নারীর আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য এমনসব পুরুষদের কাছে প্রদর্শন করার অনুমতি প্রদান করে ইরশাদ করেন,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ-

আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।[১৭০]

আল্লাহ তা'য়ালা নারীর আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য এমনসব পুরুষদের কাছে প্রদর্শন করার অনুমতি প্রদান করেন, যারা নির্বোধ যাদের প্রবৃত্তিগত কোনো আগ্রহ ও উৎসুক্যেই নেই। আর তারা হলো দাস, কাম প্রবণতাহীণ বৃদ্ধ এবং এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, এখনও সাবালকত্বে পৌঁছেনি এবং নারীদের গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দুটি মাসআলা জানা যায়।

---

১৭০. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১

(ক) রমণীর আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা উল্লেখিত দুই প্রকারের (দাস ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক) পুরুষ ব্যতীত কারো সামনে প্রকাশ করা জায়েয নয়।

(খ) পুরুষ পরনারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে ফিৎনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকায় পর্দা সম্পর্কিত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, নারীর মুখমন্ডল যাবতীয় সৌন্দর্যের প্রতীক এবং ফিৎনা ও ফাসাদের উৎস। তাই মুখমন্ডল ঢাকা ওয়াজিব, যাতে কোনো পুরুষ তার প্রতি তাকিয়ে আসক্ত হয়ে ফেতনায় লিপ্ত না হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ- নারীরা যেন সজোরে পদচারণ না করে যার ফলে অলংকারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা (পুরুষের কাছে) প্রকাশ হয়ে পড়ে।[১৭১]

অত্র আয়াতে নারীকে সজোরে পদচারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে তাদের পায়ের অলংকার, বেড়ী, ঝুমুর ইত্যাদি সম্বন্ধে বেগানা পুরুষ অবহিত হতে না পারে। সুতরাং ফেৎনা সংঘটিত হওয়ার আশংকায় মহিলাকে যখন এভাবে চলাফেরা না করতে বলা হয়েছে তখন চেহারার মতো বিপদ সংকুলস্থান খোলা রাখা কীভাবে জায়েয হতে পারে? লক্ষণীয় যে, এ দুটির মধ্যে কোনটি অধিক ফেৎনা সৃষ্টিকারী ও ধ্বংসাত্মক। রমণীর পায়ের অলংকারের শব্দ। যদ্বারা রমণী যুবতী না বৃদ্ধ, সুশ্রী না কুশ্রী কিছুই অনুভব করা যায় না, নাকি তার সৌন্দর্যের প্রতীক উম্মুক্ত চেহারা? বিবেক-বুদ্ধি ও অনুভুতি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের অজানা নয় যে, এ দুটির কোনটি ফেৎনা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং কোনটি খোলা না রেখে সম্পূর্ণ আবৃত রাখার অগ্রাধিকার রাখে। নিঃসন্দেহ বলা যায় এটি হবে চেহারা। কারণ উক্ত আয়াতে পায়ের সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। নারীর চেহারা প্রদর্শন করানোতো আরও কঠোর এবং সন্দেহাতীতভাবে হারাম হবে।

---

১৭১. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-

বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে, তাদের জন্য দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।[১৭২]

আলোচ্য আয়াতে পর্দার অপরিহার্যতা এভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ বলেন বৃদ্ধনারী (বার্ধক্যের কারণে) যার প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না, তারা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখতে পারবে। এখানে বস্ত্র খুলে রাখা মানে উলঙ্গ বা নিরাবরণ হওয়া নয় বরং যেসব বস্ত্র দ্বারা হাত, মুখমন্ডল ইত্যাদি আবৃত রাখা হয়। যথা- চাদর, বোরকা ইত্যাদি।

এ আয়াতে বস্ত্র খুলে রাখার অনুমতি শুধুমাত্র বৃদ্ধা নারীদের জন্যই নির্দিষ্ট। যুবতী নারীর মুখমন্ডল বিপদ সংকুলস্থান হওয়ায় তা ঢেকে রাখা জরুরী। যদি বস্ত্র খুলে রাখার হুকুম (নির্দেশ) বৃদ্ধা, যুবতী, তরুণী সকলের জন্য অভিন্ন হতো, তাহলে বৃদ্ধাকে যুবতী থেকে পৃথক করে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই আয়াতে বলা হয়েছে- غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।[১৭৩]

অর্থাৎ যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, বস্ত্র খুলে রাখে, তবে তাদের কোনো দোষ নেই। কিন্তু যুবতী ও তরুণী নিজ নিজ লাবণ্যময় মুখমন্ডল প্রদর্শন করে পুরুষের সামনে নেচে বেড়ানোর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পরপুরুষকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করাই হয়ে থাকে। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা কদাচিত হয়ে থাকে যার ওপর কোনো হুকুম হয় না। এতে প্রমাণিত হলো যে, বিবাহের যোগ্য যুবতী তরুণীর জন্য মুখমন্ডল সহকারে পরিপূর্ণ পর্দা করা অপরিহার্য।

---

১৭২. *আল কুরআন*, ২৪ : ৬০
১৭৩. *আল কুরআন*, ২৪ : ৬০

আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا-

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারদিরকে বলো, তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৭৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের মহিলাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে যেন জিলবাব তথা চাদর দ্বারা মাথার ওপর দিক থেকে নিজেদের মুখমন্ডল ঢেকে বের হয়। তবে একটি চোখ খোলা রাখবে। সাহাবীর তাফসীর নিঃসন্দেহে শরয়ী দলীল। এমনকি কোনো কোনো আলেম সাহাবীর তাফসীরকে হাদীসে মারফু (উচ্চ ও ত্রুটিমুক্ত হাদীস) সমতুল্য মনে করেন। সাহাবীর তাফসীরে রাস্তা দেখার জন্যই একটি চোখ খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নিষ্প্রয়োজনে চক্ষু উম্মুক্ত রাখা বৈধ হবে না। আরবি পরিভাষায় জিলবাব বলতে বড় চাদরকে বুঝানো হয়। যা ওড়নার ওপর বোরকার পরিবর্তে পরিধান করা হয়।

নবী পত্নী উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে আনসারি মহিলাগণ (মদীনা শরীফের স্থায়ী অধিবাসিনী) কালো চাদর পরে অতি ধীরস্থিরতার সাথে ঘর হতে বের হতেন। মনে হতো যেন তাদের মাথার ওপর কাক বসে আছে। সাহাবী আলী (রা.) এর শিষ্য আবু উবাইদাহ আস সালমানী, কতাদাহ প্রমুখ বলেন, মুমিন লোকদের স্ত্রীগণ মাথার ওপর থেকে চাদর এভাবে পরিদান করতো, চলার পথে রাস্তা দেখার জন্য চক্ষু ব্যতীত শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পেত না। এই ছিলো সোনালী যুগের বান্দীদের পর্দা পালনের অবস্থা। আর আজ আমরা প্রকৃত পর্দাতো মানছিই না পর্দার নামে আবিষ্কার ঘটাচ্ছি নিত্য নতুন কৌশলী পর্দা। অন্তরে প্রকৃত খবর একমাত্র আল্লাহ মহানই ভালো জানেন।

---

১৭৪. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন,

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا-

নবীর স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতাদের, তাদের পুত্রদের, তাদের ভাইদের, তাদের ছেলেদের, তাদের বোনের ছেলেদের, তাদের নারীদের ও তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের বেলায় (হিজাব না করায়) কোনো অপরাধ নেই। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।[১৭৫]

ইবন কাসীর (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা মহিলাদেরকে গায়রে মাহরাম (ইসলামী শরীয়তে যাদের সাথে বিবাহ অনুমোদিত) এর সাথে পর্দা করার নির্দেশ দানের ওপর এটিও বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, আত্মীয় মাহরামদের সাথে পর্দা করা ওয়াজিব নয়।

যেমন : সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে বর্ণিত আছে, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ তারা যেন তাদের স্বামী ছাড়া অন্যের সামনে সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে। পরপুরুষের সামনে পর্দার অপরিহার্যতার ওপর পবিত্র কুরআন থেকে এই দলীল পেশ করা হলো। শুধুমাত্র প্রথম আয়াতেই এ বিষয়ের ওপর পাঁচটি পয়েন্টে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।

---

১৭৫. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৫

শরয়ী পর্দায় কি মুখ ঢাকা জরুরী?

আমাদের কাছে দলীল আরব রাষ্ট্র নয়। দলীল কুরআন ও সুন্নাহ এবং কুরআন সুন্নাহ থেকে ইজতিহাদকৃত ফুকাহায়ে কিরামের রচিত ফিকহ। সুতরাং কোন দেশের মানুষ কি আমল করে? কি করছে না? সেটি কোনো মুসলিমের কাছে বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। বিবেচ্য হলো কুরআন- সুন্নাহ থেকে নির্গত ফিকহে ইসলামী।

ইসলামী পর্দা কুরআনে কারীমের সাত আয়াত এবং হাদীসের প্রায় ৭০টি বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, ইসলামী শরীয়তে মূল মাকসাদ এমন পর্দা, যার দ্বারা মহিলাদের চলাফেরা, তার পোশাক, তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যেও কিছুই বেগানা পুরুষের দৃষিটগোচর হবে না।

এমন পর্দা পর্দাবৃত বাড়ি। এটাই মহিলাদের আসল স্থান। এটিই পর্দার প্রথম স্তর। যা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى-

আর তোমরা অবস্থান করো তোমার বসবাসের গৃহে। নিজেদের মুর্খতার যুগের মহিলাদের মতো প্রকাশ করো না।[১৭৬]

এ আয়াত কি প্রকাশ করেছে? শুধু কাপড় চোপড় দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না, বরং এমনভাবে পর্দা করবে যে, শরীরসহ কাপড়ও যেন পরপুরুষের সামনে প্রকাশিত না হয়। যেন কোনো পরপুরুষের নযরই নারীর ওপর নিবদ্ধ না হতে পারে। তবে প্রয়োজনের বিষয়টি ভিন্ন। তখন প্রয়োজনে বাহিরে যেতে পারবে।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ-

অর্থ : আর তোমরা তাঁর (রাসূল স.) এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[১৭৭]

বিখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম কুরতুবী (রহ.) উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (স.) এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছেন। সাধারণ নারীরাও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।[১৭৮]

---

১৭৬. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৩
১৭৭. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৩
১৭৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবু বকর আল আনসারি আল কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী*, অনু : জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের (ঢাকা : ইসলাম হাউস ডট কম প্রকাশনী, প্রকাশকাল-তা.বি.), ১৪/১৪৬

নবী (স.) এর স্ত্রীগণ হলেন সকল মুমিনের মা। অথচ তাঁদের সাথেই লেনদেন বা কথা-বার্তা বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকে করতে বলা হয়েছে। তাহলে অন্যান্য সাধারণ বেগানা নারীদের ক্ষেত্রে হুকুমটি কত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত তাতো সহজেই অনুমেয়।

লক্ষ্য করুন! প্রথম আয়াতের মাঝে মহিলাদের ঘর থেকে বের হতেই নিষেধ করা হয়েছে প্রয়োজন ছাড়া। আর দ্বিতীয় আয়াতে যদি কোনো পরপুরুষের কাছে কোনো চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ হলো পর্দা বিষয়ক প্রথম নির্দেশনামূলক আয়াত।

দ্বিতীয় নির্দেশনামূলক আয়াত ও হুকুম প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে পর্দার সাথে। সে পর্দার পরিমাণ কতটুকু? ঘরে যেভাবে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিক সেভাবেই বাহিরে বের হতে চেষ্টা করবে এমন নির্দেশনা থাকাই কি যৌক্তিক নয়? যেখানে ঘর থেকে বের হতেই নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে বাহিরে চেহারার সৌন্দর্য প্রকাশ করে বের হওয়ার অনুমতি কীভাবে দেওয়া হতে পারে?

এ কারণেই নির্দেশনা এসেছে যে, এমন বড় কাপড় সারা শরীরে আবৃত করে বের হবে যে, শরীরের কোনো অংশ বাহিরে প্রকাশিত না হয়। চেহারা, হাত, পা, মোটকথা শরীরের কোনো অংশও সাজগোজের সরঞ্জাম প্রকাশিত যেন না হয়। রাস্তা দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখবে। চোখের সামনে নেট লাগিয়ে নিবে। যাতে করে রাস্তা দেখা যায়। এটাই শরয়ী পর্দা।

পর্দার প্রথম স্তরের মতোই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও সকল বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয় স্তরের নির্দেশনা সম্বলিত আয়াত-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا-

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। (মাথার দিক থেকে) এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১৭৯]

১৭৯. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯

এ আয়াতে মহিলাদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার পদ্ধতি শিখানো হযেছে। কোনো প্রয়োজনীয় কারণে ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও পর্দাহীন হবে না। বরং সে সময়ও চেহারার ওপর পর্দা টেনে নিবে। যাতে করে চেহারা কারো দৃষ্টিগোচর না হয়।

কুরআনে এমন স্পষ্ট শব্দে চেহারার ওপর চাদর টেনে নেওয়ার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন বক্তব্য দেয়ার কি সুযোগ আছে? যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, চেহারার ওপর চাদর টেনে নিবে। যাতে করে কেউ তার চেহারা দেখতে না পারে। সেখানে মুখ খুলে রাখার সুযোগ থাকার কথা কীভাবে বলার যায়? এটি কি কুরআনের আয়াতের সরাসরি খেলাফ হচ্ছে না?

উক্ত আয়াতের কারণেই মুখ ঢেকে রাখা মুসলিম নারীদের ওপর ফরয হয়েছে। এর বিপরীত করা জায়েয নয়। এ পর্দাই ইসলামের শুরু যুগ থেকে নিয়ে আজো পর্যন্ত দ্বীনদার মুসলিমদের মাঝে জারি আছে। কয়েকটি হাদীস দেখা যেতে পারে-

عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ، تَسْأَلُ عَنِ ابْنِهَا، وَهُوَ مَقْتُولٌ، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ؟ فَقَالَتْ: إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي-

হযরত আব্দুল খায়ের ইবন সাবেত ইবন কায়েস বিন শাম্মাস তার পিতা, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা এক মহিলা রাসূল (স.) এর কাছে এলেন। যাকে উম্মে খাল্লাদ বলা হয়। তিনি এমতাবস্থায় এলেন যে, তার চেহারা পর্দাবৃত ছিলো। সে এসে তার নিহত সন্তানের ব্যাপারে অভিযোগ জানায়। তখন কতিপয় সাহাবী তাকে বলেন, তুমি তোমার ছেলের ব্যাপারে অভিযোগ দাখিল করতে এসেছো, তারপরও তুমি পর্দাবৃত হয়ে এলে? তখন উম্মে খাল্লাদ বলেন, যদিও আমার ছেলের ওপর বিপদ এসেছে, এর মানেতো আমার লজ্জা শরমেরও বিপদ আসেনি।[১৮০]

১৮০. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৪৮৮

আরেক বর্ণনায় এসেছে-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: " لَمَّا نَزَلَتْ: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ، خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأَكْسِيَةِ-

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, যখন কুরআনের এ আয়াত-يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ তথা তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। (মাথার দিক থেকে)।[১৮১]

এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন আনসারী মহিলারা স্বীয় ঘর থেকে এমনভাবে বের হতো যেন তাদের মাথায় কাক বসে আছে।[১৮২]

হযরত মুফতী শফী (রহ.) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে লিখেন যে,

فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبيين-

এ আয়াত একথা বুঝাচ্ছে যে, যুবতী মেয়েরা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এমনভাবে বের হবে যেন তাদের চেহারা পরপুরুষের সামনে প্রকাশিত না হয়।[১৮৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, নারী জাতি হলো আপাদমস্তক সতর। যখনি সে বের হয় তখনি শয়তান তাকে চমৎকার করে তোলে।[১৮৪]

অন্য বর্ণনায় এসছে-

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةً-

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন পর্দাবৃত অবস্থায়।[১৮৫]

---

১৮১. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯
১৮২. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪১০১
১৮৩. ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহমাদ ইবন আলী আর রাযী আল যাসসাস আল হানাফী (রহ.) *আহকামুল কুরআন*, অনু : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (রহ.) (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০১), ৩/১৪৫৮
১৮৪. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১১৭৩
১৮৫. আব্দুর রাজ্জাক ইবন হাম্মান ইবন নাফি আল সানানি, *মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক* (লেবানান, বৈরুত, প্রকাশকাল-২০০৫), হাদীস নং-৮৮৫৯

পর্দা পরপুরুষের সাথে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সৌন্দর্যমন্ডিত বস্তুও লুকানো ফরয। কুরআন মাজীদে নির্দেশ এসেছে-

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ-

ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।[১৮৬]

এ আয়াতে স্পষ্টভাষায় সৌন্দর্যকে লুকাতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেটা হলো পর্দা করার মূল হাকীকত। কিন্তু যা সাধারণতঃ প্রকাশমান বলে চেহারা ও হাত উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। যা তীব্র প্রয়োজনের সময় যেমন প্রচন্ড ভীর, আদালতে সাক্ষ্য প্রদান ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা জায়েয আছে।

এ দুটো বিষয়কে পৃথক করা হয়েছে সতর থেকে। পর্দা থেকে নয়। অর্থাৎ এ দুটি অংশ সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু পর্দার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই নামাযরত অবস্থায় হাত ও মুখ এবং পা ঢাকতে হয় না। এসব খোলা রেখেই নামায হয়ে যায়। কারণ এসব সতর নয়। আর নামাযে সতর ঢাকা ফরয। কিন্তু বাহিরে বের হওয়ার সময় যেহেতু সাথে সাথে পর্দা রক্ষা করাও ফরয, এসব ঢেকে রাখা ফরয।

মোটকথা হলো এই যে, মহিলাদের জন্য এটি কিছুতেই জায়েয নয় যে, খোলা বাজারে তারা মুখ খুলে ঘুরে বেড়াবে। নিজের সৌন্দর্য মানুষকে দেখিয়ে বেড়াবে। যেহেতু সৌন্দর্যের মূলই হলো চেহারা। চেহারা দেখেই মূলত সৌন্দর্যের মাপকাঠি নির্ধারণ হয়ে থাকে। সুতরাং এটি প্রদর্শন কীভাবে জায়েয হতে পারে? এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত যিনার দরজা বন্ধ করার জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলাকে হারাম সাব্যস্ত করেছে।

---

১৮৬. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) আয়াতাংশের অধীনে লেখেন-

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَيْ: لَا يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ لِلْأَجَانِبِ، إِلَّا مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ-.

যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। মানে হলো, পরপুরুষের সামনে সৌন্দর্যের কোনো কিছুই প্রকাশ করবে না, তবে যা লুকানো সম্ভব হয় না তা ভিন্ন।[১৮৭]

উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, মহিলাদের পর্দার যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তাতে চেহারাও দাখিল। শুধু তাই নয়, মূলত আসল হুকুম চেহারা ঢাকার ওপরই। কারণ চেহারাই সৌন্দর্যতার মূল। সে সাথে মহিলাদের উত্তম পোশাক, পরিহিত সাজ সরঞ্জামও দাখিল।

আর চেহারা ও পোশাক-আশাকের পর্দা রক্ষা প্রচলিত বোরকা বা এ জাতীয় কাপড় দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। এ কারণে মুসলিম নারীদের জন্য পর্দার ফরযিয়্যাত আদায় করার জন্য বোরকা বা এ জাতীয় শরীর ঢেকে থাকে এমন পর্দাযুক্ত কাপড় পরিধান করা জরুরী।

এ কারণেই পবিত্র কুরআনে প্রথমে মহিলাদের ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কোনো প্রয়োজনে বের হয়ও, তাহলে বোরকা বা এ জাতীয় কাপড় দিয়ে নিজেকে আবৃত করে নিতে বলা হয়েছে।

তবে ৩টি সূরত এ নিদের্শনা থেকে পৃথক। যথা :

১. এমন প্রয়োজন যাতে করে চেহারা ঢাকলে নিজের ক্ষতি হবে। যেমন- ভীরের মাঝে চলার সময়।

২. এমন প্রয়োজন যাতে চেহারা ঢাকা থাকলে অন্যেও ক্ষতি হবে। যেমন- সাক্ষ্য প্রদান করার সময়।

৩. কাজ করা বা কর্মক্ষেত্রে ডিউটি করার সময় অনিচ্ছায় চেহারা খুলে গেলে। এতে গোনাহ হবে না।

তবে এ তিন সূরতের ক্ষেত্রেই পুরুষদের জন্য বিধান হলো, তারা নিজেদের চোখকে নিচু করে রাখবে। মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকবে না। মহিলাকে দেখা তার জন্য হারাম।

চেহারা ঢেকে রাখার বিধানটি যুবতী নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নতুবা বৃদ্ধ নারীদের জন্য চেহারা বা হাত খোলার সুযোগ অন্য আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে।

---

১৮৭. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুপ্ত, ৬/৪১

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা আশা করি একথা স্পষ্ট হয়েগেছে যে, মহিলাদের জন্য পরপুরুষের সামনে মুখ, হাত খোলা রাখা আমভাবে জায়েয বলা শরীয়ত সম্মত নয়। বরং চেহারা ও হাত খোলার সুযোগ নির্দিষ্ট কিছু সূরতের সাথে খাস। সেসব বিশেষ সূরত ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে হাত, মুখ খোলা কিছুতেই জায়েয নয়। ব্যক্তি বা এলাকার আমল পালনীয় নয়। পালনীয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর নিদের্শনা।

সুতরাং যারা কুরআনে স্পষ্ট এ নিদের্শনার অপব্যাখ্যা করেছে তাদের জন্য হেদায়াতের দু'আ। এসব অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা উচিত। এক হলো দ্বীন না মানা, আরেক হলো দ্বীনের বিধানটিই অস্বীকার করা। দুটি দুই জিনিস।

দ্বীন না মানার গোনাহ থেকে দ্বীনী বিষয়কে অস্বীকার করা মারাত্মক গোনাহ। ক্ষেত্র বিশেষ তা কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাই এসব অপপ্রচারের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত সকল মুসলিমের।

মাহরাম

যাদের সাথে পর্দা নেই মাহরাম পুরুষের সাথে নারীর পর্দা নেই। মাহরাম পুরুষ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন পুরুষ আত্মীয় যার সাথে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কোনো অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয়। যেমন- পিতা, ভাই ইত্যাদি।

আর যে পুরুষের সাথে বর্তমান কিংবা ভবিষ্যতে সাময়িক প্রতিবন্ধকতা (যেমন- নারীর বোন বা এমন নারীর বিবাহে থাকা, যাদের দুজনকে বিবাহসূত্রে একত্র করা জায়েয নয়) দূর হওয়ার পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয সে হলো গায়রে মাহরাম। তার সাথে পর্দা করা ফরয। পুরুষের জন্য মাহরাম ও গায়রে মাহরাম নারী একজন পুরুষের মাহরাম নারী হলো এমন নারী, যার সাথে তার বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কোনো অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয়। যেমন- মা, মেয়ে ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে যে নারীর সাথে তার বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে সাময়িক প্রতিবন্ধকতা (যেমন- নারীর অন্য পুরুষের বিবাহ থাকা) দূর হওয়ার পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয সে হলো গায়রে মাহরাম।

মাহরাম শব্দের শাব্দিক অর্থ : হারাম, যা হালাল এর বিপরীত।

মাহরাম শব্দের পারিভাষিক অর্থ : মাহরাম বলা হয় যাদেরকে আত্মীয়তা বা দুধপান করানো, অথবা শ্বশুরালয়ের সম্পর্কের কারণে বিবাহ করা জায়েয নয়।

১৪ জন ছাড়া বাকী সবাই "গায়রে মাহরাম" একথার অর্থ হল যে, তাদের বিবাহ করা জায়েয। এবং তাদের সাথে সর্বক্ষেত্রে শরয়ী পর্দার বিধান মেনে চলতে হয়।

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগ্নীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস কওেয়, সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই।

মাহরামের প্রকারভেদ :

সাধারণত তিন ধরনের সম্পর্ককে শরীয়ত মাহরাম হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছে। যথা :
ক. বংশীয় বা ঔরসজাত সম্পর্ক **খ.** দুধ সম্পর্ক **গ.** বৈবাহিক সম্পর্ক

বংশগত সম্পর্কের কারণে মাহরাম নারীর বংশ সম্পর্কিত মাহরাম পুরুষগণ হলেন- ১. পিতা, দাদা-নানা ও তদোর্ধ্ব পুরুষ ২. পুত্র, পৌত্র ও তদস্তন পুরুষ ৩. ভাই-সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ৪. ভ্রাতুষ্পুত্র ও তদস্তন পুরুষ ৫. ভাগ্নে (সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে ৬. চাচা ৭. মামা

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী-

ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابآئهن او ابآء بعولتهن او ابنآئهن او ابنآء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخوتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التبعين غير اولى الاربة من الرجال او الطفط الذين لم يظهروا على عورت النساء-

অর্থ : তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট।[১৮৮]

---

১৮৮. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১

পুরুষের বংশ সম্পর্কিত মাহরাম নারীগণ হলেন-

১. মা ২. কন্যা ৩. ভগ্নী ৪. ফুফু ৫. খালা ৬. ভ্রাতুষ্পুত্রী ৭. ভাগ্নী

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

حرمت عليكم امهتكم وبنتكم واخوتكم وعمتكم وخلتكم وبنت الاخ وبنت الاخت-

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নী।[১৮৯]

দুগ্ধপানের কারণেও মাহরাম সাব্যস্ত হয়ে থাকে। দুধ মা, দুধ কন্যা, দুধ বোন ইত্যাদি নারীগণ পুরুষের মাহরাম পরিগণিত হবেন। অনুরূপভাবে দুধ পিতা, দাদা ও তদোর্ধ্ব পুরুষ, দুধ পুত্র তদস্তন পুরুষ, দুধ ভাই ইত্যাদি পুরুষ মাহরাম হিসেবে গণ্য হবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

حرمت عليكم امهتكم ... وامهتكم التى ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة-

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা --- দুধ মা, দুধ বোন।[১৯০]

বিখ্যাত মুফাসসির আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ কুরতুবী (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

একজন নারী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করায় তাহলে সে দুগ্ধ পানকারীর জন্য হারাম হয়ে যায়। কারণ সে তার দুধ মা। তেমনি দুধমার মেয়ে, বোন হওয়ার কারণে; দুধমার বোন, খালা হওয়ার কারণে; দুধমার মা, নানী হওয়ার কারণে; দুধমার স্বামীর অন্য পক্ষের কন্যা, বোন হওয়ার কারণে; স্বামীর বোন, ফুফু হওয়ার কারণে; স্বামীর মা, দাদী হওয়ার কারণে ঐ শিশুর জন্য হারাম হয়ে যায়। তেমনি দুধমার ছেলে-মেয়ের সন্তানাদিও হারাম হয়ে যায়। কারণ তারা তার ভাই-বোনের সন্তানাদি।[১৯১]

---

১৮৯. *আল কুরআন*, ৪ : ২৩
১৯০. *আল কুরআন*, ৪ : ২৩
১৯১. *তাফসীরে কুরতুবী*, প্রাগুপ্ত, ৫/৭২

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, আবুল কুয়াইসের ভাই আফরাহ (যিনি আয়েশা রা. এর দুধ চাচা) একবার আমার নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। এরপর রাসূল (স.) ঘরে আসার পর তাঁকে ঘটনাটি জানালাম। তিনি আমাকে অনুমতি প্রদানের আদেশ করলেন।

মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী রাসূল (স.) বললেন, তুমি তার সাথে পর্দা করো না। কেননা বংশীয় সম্পর্কের দ্বারা যা হারাম হয়, দুধ সম্পর্ক দ্বারাও তা হারাম হয়।[১৯২]

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে মাহরাম :

মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো বিবাহ। বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারাও নারী-পুরুষ একে অপরকে মাহরাম সাব্যস্ত হয়। নারীর বিবাহ সম্পর্কীয় মাহরাম পুরুষ হলো স্বামীর পিতা (শ্বশুর), স্বামীর অন্য পক্ষের পুত্র ইত্যাদি। তেমনিভাবে নিজের শাশুড়ি, স্ত্রীর গর্ভজাত অন্য পক্ষের কন্যা ইত্যাদি নারীও পুরুষের জন্য মাহরাম গণ্য হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন-

وحرمت عليكم امهتكم ... وامهت نسائكم وربآئبكم التى فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن-

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা,--- শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে সংগত হয়েছো তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।[১৯৩]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ কুরতুবী (রহ.) বলেন- বিবাহ সম্পর্কীয় মাহরাম নারী চার প্রকার। যথা-

১. স্ত্রীর মা (শ্বাশুড়ি) ২. স্ত্রীর কন্যা ৩. পিতার স্ত্রী (সহোদও মা, সৎ মা) ৪. পুত্রবধু।[১৯৪]

উল্লেখ্য, শাশুড়ি বলতে স্ত্রীর মা, দাদী-নানী এভাবে উপরের দিকের সকলকে বোঝাবে। তবে স্ত্রীর খালা, ফুফু অর্থাৎ খালা শাশুড়ি, ফুফু-শাশুড়ি মাহরাম নয়। এদরে সাথে পর্দা আছে। একই কথা নারীর ক্ষেত্রে। স্বামীর পিতা, দাদা ও নানার সাথে পর্দা নেই। তবে স্বামীর চাচা, মামা, অর্থাৎ চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুরের সাথে পর্দা আছে।

---

১৯২. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৮/৩৯২
১৯৩. *আল কুরআন*, ৪ : ২৩
১৯৪. তাফসীরে কুরতুবী, প্রাগুপ্ত, ২/৭৪

উপরের আলোচনা থেকে পর্দার বিধান পালন সম্পর্কে আমরা যা পেয়েছি তা হচ্ছে-

এক. পর্দার বিধান পালন করার অর্থ আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ পালন করা, যা মুমিনের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তা'য়ালার ইরশাদ হচ্ছে-

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا-

অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হবে।[১৯৫]

দুই. পর্দার বিধান মেনে চলা হচ্ছে ঈমানের দাবি। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা পর্দা-বিধানের ক্ষেত্রে শুধু ঈমানদার নারী পুরুষকেই সম্বোধন করেছেন।

এক নববধুকে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) এর নিকট আনা হলো, যার পরনে ছিলো রঙ্গিন কিবতী চাদর। তখন উম্মুল মুমিনীন বললেন, যে নারী এ রকম পোশাক পরিধান করে তারতো সূরা নূরের প্রতি ঈমান নেই।[১৯৬]

তিন. পর্দা পালন হল সতর।

রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন-নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক লাজুক ও পর্দাশীল। তিনি লজ্জা ও পর্দাকে পছন্দ করেন।[১৯৭]

আল্লাহ তা'য়ালা পিতা আদম ও হাওয়া (আ.) এর প্রতি পর্দার নেয়ামতকে বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন-

ان لك الا تجوع فيها ولاتعرى-

অর্থ : তোমার জন্য এ রইলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না এবং নগ্নও হবে না।[১৯৮]
অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন-

يبنى ءادم قد انزلنا عليكم لباسا يورى سوءتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير-

অর্থ : হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ এটাই সর্বোৎকৃষ্ট।[১৯৯]

---

১৯৫. *আল কুরআন*, ৩৩ : ২৬
১৯৬. *তাফসীরে কুরতুবী*, প্রাগুপ্ত, ১৪/২৪৪
১৯৭. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪০১২, ৪০১৩
১৯৮. *আল কুরআন*, ২০ : ১১৮
১৯৯. *আল কুরআন*, ৭ : ২৬

চার. পর্দা হলো নারী-পুরুষ উভয়ের হৃদয়ের পবিত্রতার উপায়।

পাঁচ. পর্দা হলো ইফফাত তথা চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উপায়। এ ইফফাত ছিলো রাসূল (স.) এর দু'আর অংশ। তিনি দু'আ করতেন-

أسألك الهدى والتقى والعفة-

অন্য রেওয়ায়েতে

إني أسألك الهدى والتقى والعفاف-

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি হেদায়েত, তাকওয়া ও ইফফাত (চারিত্রিক পবিত্রতা)।[২০০]

এ পবিত্রতা হচ্ছে জান্নাতী নারীদের একটি গুণ। আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন আয়াতে এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অসাধারণ রূপের বর্ণনা দেওয়ার সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, তারা নির্ধারিত গৃহে অবস্থান করবে এবং নিজ স্বামী ছাড়া অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। তো তাদের সৌন্দর্যের পাশাপাশি তাদের পবিত্রতারও প্রশংসা করেছেন। সুতরাং রূপ- সৌন্দর্যের সাথে যদি ইফফাত ও সতীত্ব থাকে তবে এরচেয়ে উত্তম কী হতে পারে? আর পর্দাই হলো সতীত্ব রক্ষার উপায়।

২০০. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪১৬, ৪৩৬

মুসলিমের পোশাক : কিছু মূলনীতি

পোশাক-পরিচ্ছদ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, পোশাক যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা ও সৌন্দর্যের উপকরণ, তেমনি শরীয়তের দিক নির্দেশনা মেনে তা ব্যবহার আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে কুরআন হাদীসে অন্যান্য বিষয়াদির মতো লেবাস পোশাক বিষয়েও হুকুম আহকাম দেওয়া হয়েছে। রাসূল (স.) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পোশাক সম্পর্কিত দ্বীনী হেদায়াত ও শরীয়তের বিধি বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের তরবিয়ত করেছেন। আর সাহাবায়ে কিরামও নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মতো স্ত্রী-কন্যা ও সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত করেছেন। কারণ পোশাক-পরিচ্ছদের ভালো মন্দ মানুষের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, চরিত্র ও নৈতিকতা তথা মানবিক জীবনের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং অন্তর ও মন মানসিকতায় গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই পোশাকের বিষয়টি এ রকম সাধারণ কোনো বিষয় নয় যে, একটি কাপড় কিনলাম এবং তা পরে নিলাম। বরং এক্ষেত্রে শরীয়তের দিক নির্দেশনা মেনে চলা জরুরী।

পোশাক যে অনেক বড় নেয়ামত তা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন-

يبنى ءادم قد انزلنا عليكم لباسا يورى سوءتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير-.

হে আদমের সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, তোমাদের দেহের যে অংশ প্রকাশ করা দূষণীয় তা ঢাকার জন্য এবং তা সৌন্দর্যেরও উপকরণ। বস্তুত তাকওয়ার যে পোশাক সেটাই উত্তম। এসব আল্লাহর নিদের্শনাবলির অন্যতম। এর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে উপদেশ গ্রহণ করে।

পোশাকের কিছু মৌলিক নীতিমালা :

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান অত্যন্ত যৌক্তিক ও উপকারী। শরীয়ত বিশেষ কোনো পোশাক সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইন বা আকৃতিও বলে দেয়নি যে, এ ধরনের পোশাকই তোমাদের পরতে হবে; বরং বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, আবহাওয়া ও মৌসুমভেদে পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে কিছু মৌলিক নীতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, এ ধরনের পোশাক গ্রহণীয় ও এ ধরনের পোশাক বর্জনীয়। সুতরাং মুসলিম নারী-পুরুষের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এসব নীতিমালা ও সীমারেখা মেনে চলা জরুরী।

যে পোশাক এ নীতিমালা ও সীমারেখা অনুযায়ী হবে সেটাই শরীয়তসম্মত পোশাক বলে গণ্য হবে।

এক. পোশাক এমন আঁটসাঁট ও ছোট মাপের হতে পারবে না, যা পরলে শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে এবং দৈহিক গঠন ও বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।

আবু ইয়াযিদ মুযানী (রহ.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) মহিলাদেরকে কাবাতী (মিসরে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের সাদা কাপড়) পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা বললো, এ কাপড়তো ত্বক দেখা যায় না। তিনি বললেন, ত্বক দেখা না গেলেও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে।[২০১]

দুই. পোশাক এমন পাতলা ও মিহি হতে পারবে না যাতে শরীর দেখা যায় এবং সতর প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন পাতলা সুতির কাপড়, নেটের কাপড় ইত্যাদি। অবশ্য পাতলা কাপড়ের নিচে সেমিজ জাতীয় কিছু ব্যবহার করলে তা জায়েয হবে।

হযরত আলকামা ইবন আবু আলকামা তার মা থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান তার ফুফু উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) এর নিকট এলো। তখন তার পরনে ছিলো একটি পাতলা ওড়না। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।[২০২]

তিন. পোশাকের ক্ষেত্রে কাফির-মুশরিক ও ফাসেক লোকদের অনুসরণ-অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করা যাবে না। বিশেষত সেসব পোশাকের ক্ষেত্রে যা অমুসলিমদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, নবী (স.) আমাকে উসফুর ছোট লাল বর্ণের ফুল গাছ) দ্বারা রাঙানো দুটি কাপড় পরতে দেখে বললেন, এগুলো হচ্ছে কাফিরদের পোশাক। অতএব তুমি তা পরিধান করো না।[২০৩]

তাছাড়া অন্য হাদীসে রাসূল (স.) বর্ণনা করেন- যে ব্যক্তি অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।[২০৪]

---

২০১. ইমাম আবু বকর ইবন আবি শাইবা (রহ.), *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, অনু : মুফতি ইলিয়াস খান (ঢাকা : পথিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল-তা.বি.), হাদীস নং- ২৫২৮৮

২০২. ইমাম মালেক (রা.), *মুয়াত্তা*, অনু : মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০২), ২/৯১৩

২০৩. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২০৭৭

২০৪. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪০২৭

চার. পোশাকের মাধ্যমে অহংকার ও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুখ্যাতি ও প্রদর্শনীর পোশাক পরবে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্চনার পোশাক পরাবেন।[২০৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত মাটিতে কাপড় টেনে টেনে চলে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।[২০৬]

পাঁচ. পুরুষদের জন্য মেয়েলী পোশাক এবং নারীদের জন্য পুরুষের পোশাক পরা এবং একে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করা নিষেধ। হযরত আব্দুল্লাহ আবন আব্বাস (রা.) হত বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) সে সব পুরুষের ওপর লা'নত করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে (তাদের মতো আকৃতি, তাদের পোশাক ও তাদের চাল-চলন গ্রহণ করে)। আর সে সব নারীর ওপরও লা'নত করেছেন যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।[২০৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারিনী নারীকে রাসূল (স.) লা'নত করেছেন।

ছয় . পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় করা, বিলাসিতা করার জন্য বা শখের বশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক ক্রয় করা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উচ্চমূল্যের পোশাক ক্রয় করা নিষেধ।

হযরত আমর ইবন শুয়াইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন, তোমরা খাও, পান করো অন্যদের দান করো এবং কাপড় পরিধান করো যে পর্যন্ত অপচয় ও অহংকার করা না হয়।[২০৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যা মনে চায় খাও, যা মনে চায় পরিধান করো যে পর্যন্ত দুটি বিষয় না থাকে ; অপচয় ও অহংকার।[২০৯]

---

২০৫. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪০২৫
২০৬. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫৭৮৮
২০৭. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৩৮৮৫
২০৮. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্তা, হাদীস নং- ৪০৯২
২০৯. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, প্রাগুপ্তা, হাদীস নং- ৩১০৫

সাত. গায়রে মাহরাম ও পরপুরুষের সামনে অলংকার ও পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না, যাতে তারা সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها-

তারা যেন নিজেদের ভূষণ প্রকাশ না করে। উক্ত আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পরপুরষের সামনে নিজেদের পুরো শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা আবৃত করে রাখে। যাতে তারা সাজ-সজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়।

ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন, যে সব কর্ম নারীর ওপর লা'নত করে তা হলো অলংকার ও আকর্ষণীয় পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ করা। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার।

وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى-

নিজ গৃহে অবস্থান করো সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না। যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হতো।

প্রাচীন জাহেলী যুগে নারীরা নির্লজ্জ সাজ-সজ্জার সাথে নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াত। আজকের নব্য জাহেলিয়াতের এতটাই উগ্র যে, তার সামনে প্রাচীন জাহেলিয়াত ম্লান হয়ে গেছে।

আট. পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় নিষেধ এবং তা কবীরা গুনাহ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বর্ণনা করেছেন, কাপড়ের যে অংশ টাখনুর নীচে যাবে তা (টাখনুর নীচের অংশ) জাহান্নামে জ্বলবে।[২১০]

হযরত আবু হুবাইব ইবন মুগাফফাল গিফারী (রা.) মুহাম্মাদ কুশারীকে লুঙ্গি টেনে চলতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, যে অহংকারবশত পায়ের নীচে কাপড় ফেলে চলবে সে জাহান্নামে গিয়ে এভাবে চলবে।[২১১]

আল্লাহ তা'য়ালা মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা নিজগৃহে অবস্থান করো। এ আয়াতে একটি মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, নারীর আসল জায়গা ও কর্মস্থল তার ঘর। গৃহকর্ম ও খান্দান গড়ে তোলাই তার দায়িত্ব। যেসব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায় তা নারীজীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর হতে বের হওয়া তার জন্য একদম জায়েয নয়। অতি প্রয়োজনে ঘর হতে বের হওয়া জায়েয। তবে কিছু আদব ও নিয়মাবলি মেনে চলতে হবে।

---

২১০. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১০/১৫২
২১১. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং ৫৭৮৭

১. পুরো শরীর বড় এবং মোটা চাদর দ্বারা অথবা সমগ্র শরীর ঢাকা যায় এমন বোরকা দ্বারা আবৃত করে ফেলবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের কোনো অংশ খোলা রাখা যাবে না। চেহারা, উভয় হাত কব্জিসহ এবং উভয় পা টাখনুসহ আবৃত করবে। পথ-ঘাট দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখা যাবে। প্রয়োজনে হাত ও পায়ের মোজা এবং চেহারার জন্য আলাদা নেকাব ব্যবহার করবে।

আল্লাহ তা'য়ারা বলেন, হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, আপনার কন্যাদের এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের মুখের ওপড় তাদের চাদও নামিয়ে দেয়।[২১২]

অন্য আয়াতে মুমিন নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, তোমরা সাজ-সজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হতো।[২১৩]

মনে রাখতে হবে, টাখনু পর্যন্ত কদম, কব্জি পর্যন্ত হাতের পাতা এবং চেহারা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, ফলে তা নামাযের সময় খোলা রাখা যাবে। কিন্তু এসব অঙ্গ পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ফলে গায়ও মাহরাম ও পরপুরুষের সামনে তা খোলা রাখা যাবে না।

২. ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় মেক-আপ, সাজসজ্জা গ্রহণ করবে না এবং কোনো ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, এক হাদীসে রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মহিলা সুগন্ধি মেখে ঘর থেকে বের হয় এবং লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাতে তারা তার খুশবু গ্রহণ করে, তবে সে ব্যভিচারিনী।[২১৪]

৩. স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণ করবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে নারী স্বামীর ঘর হতে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বের হয়ে যায় সে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত অথবা স্বামী সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন।

৪. দূরের সফর হলে একা যাবে না; বরং কোনো মাহরাম পুরুষের সাথে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে ভাষণে বলতে শুনেছি, কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া নির্জনে অবস্থান করা যাবে না। এবং কোনো নারী মাহরাম ছাড়া সফর করবে না।[২১৫]

---

২১২. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯
২১৩. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৩
২১৪. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪১৭৪-৭৫
২১৫. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৩০২৬

৫. এমনভাবে চলবে না যে, অলংকারের শব্দ মাহরাম নয় এমন কেউ শুনতে পায়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, মুসলিম নারীদের উচিত মাটিতে এমনভাবে পা না ফেলা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজসজ্জা জানা হয়ে যায়।[২১৬]

৬. গায়রে মাহরাম তথা বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে নবী! মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে।[২১৭] হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে করণীয় কী? জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে আদেশ করলেন।[২১৮]

৭. মাহরাম নয় এমন পুরুষের সাথে অতি প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না। একান্ত যদি বলতেই হয় তবে নরম ও কোমল ভাষায় বলবে না, যাতে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। যার অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো সঙ্গত কথা।[২১৯]

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত দ্বীন। জীবনের এমন কোনো অঙ্গ নেই, যেখানে ইসলামের বিধান ও শিক্ষা নেই। সে শিক্ষা ও বিধান যখন আমরা ভুলে যাই তখনই আমাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসে। আখিরাতের ভয়াবহ শাস্তিতো আছেই, দুনিয়ার জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সম্প্রতি নারীনির্যাতন খুব বেড়ে গেছে। বিশেষত উঠতি বয়েসী মেয়েরা চরম নিরাপত্তহীনতার শিকার। এটা এ সমাজের চরম ব্যর্থতা যে, নিজেদের মা- বোনকেও নিরাপত্তা দিতে পারছে না। এ অবস্থায় মা - বোনদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হবে নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে।

অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন প্রয়োজন অনেক বেশি সতর্কতা ও সচেতনতার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য এ যে, বিপর্যয়ের সাথে পাল্লা দিয়েই যেন বেড়ে চলেছে আমাদের অবহেলা ও অসচেতনতা। বর্তমান নিবন্ধে চলমান সমাজচিত্রের কিছু অংশ ও আমাদের অবহেলার কিছু দিক পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই।

২১৬. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১
২১৭. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১
২১৮. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২১৫৯
২১৯. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩২

এক. আমার প্রতিবেশী একজন শিক্ষক। তার কাছে পড়তে আসে অনেক ছেলেমেয়ে। ছোট ছোট মেয়েরা যেমন আসে তেমনি উঠতি বয়সের কিশোরীরাও। ওদের অনেকেরই পোশাক এমন যে, আমি বিষন্ন বোধ করি। আমি ভাবি ওদের মায়েদের কথা। তারা কীভাবে তাদের মেয়েদেরকে পুরুষ শিক্ষকের কাছে পাঠান, উপরন্তু এমন পোশাকে? তাদের যদি আখিরাতের ভয় না থাকে, দুর্ঘটনার ভয় কি নেই? এইতো কদিন আগে ভিকারুন্নিসা নুন স্কুলের ঘটনাটি নিয়ে পত্রপত্রিকায় তোলপাড় হলো। এর আগেও এরকম ঘটনা পত্রিকার পাতায় এসেছে। অনেক পিতামাতাই হয়তো উদ্বিগ্ন, কিন্তু সম্ভবত তারা ভাবছেন, এছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই। তাই সর্বোচ্চ ঝুঁকির মুখেও মেয়েদেরকে এ শিক্ষাটাই দিচ্ছেনে এবং এই পদ্ধতিতেই দিচ্ছেন। কিন্তু সত্যিই কি উপায় নেই? সত্যিই কি এর বিকল্প নেই? সে উপায় ও বিকল্প খুঁজে বের করাই এখন সময়ের দাবি।

দুই. আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে বলেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً- وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِؕ- اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

হে ঈমানদাররা! ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণভাবে আর অনুসরণ করো না শয়তানের পদাঙ্ক; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।[২২০]

কুরআন শরীফের এ আয়াতটি মনে পড়েছে আমার একজন আত্মীয়াকে দেখে। নিজের মহলে তিনি যথেষ্ট দ্বীনদার। নামায-রোযা ও দান-খয়রাতে তার সুনাম আছে। এলাকার অনেক মেয়েকে তিনি বোরকা দিয়েছেন এবং তার পর্দা মেনে চলতে শুরু করেছে। নিজের মেয়েদেরকেও বোরকায় অভ্যস্ত করেছেন, তবে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত দ্বীনদারের মতো তাদের পড়িয়েছেন কলেজ-ভার্সিটিতে। তিনি হয়তো চিন্তাও করেন নি যে, মেয়ের কারণে তার নিজের দ্বীনদারীও আক্রান্ত হতে পারে।

সহশিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশে অনেক ক্ষেত্রেই যা হয় তার সন্তাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। একটি দ্বীনহীন পরিবারের ছেলের সাথে মেয়েটির সম্পর্ক হয়েছে। তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের অবস্থা যা শুনেছি তা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলি, ঐ অনুষ্ঠানেই তাকে শুনতে হয়েছে পর্দা ও বোরকা সম্পর্কে বেয়াই-বেয়াইনের অনেক বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা।

২২০. *আল কুরআন*, ২ : ২০৮

এখানে সম্ভবত পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার একটি দিকস্পষ্ট হয়েছে। আমি নামায পড়ি, রোযা রাখি, কিন্তু জাহেলিয়াতের মোহ ত্যাগ করতে পারি না। সন্তান-সন্ততিকে বানাতে চাই প্রগতিশীল মুসলিম তাহলে আমি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ঢুকিনি। আমি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তখনই হতে পারবো যখন বিশ্বাস করবো ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বলে এবং শিক্ষা-দীক্ষায়, রুচি ও জীবনাচারে ইসলাম যা দিয়েছে তাকেই গ্রহণ করতে পারবো সর্বোত্তম বলে।

তিন. গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে নারীর পর্দা আছে। সাধারণত গায়রে মাহরামের অর্থ করা হয় বেগানা বা পরপুরুষ। এই তরজমা সূক্ষ্ম ও কঠিন নয়। কারণ অনেক আত্মীয়ও এমন আছে যারা গায়রে মাহরাম অর্থাৎ তাদের সাথে পর্দা করা জরুরী। অনেক অনাত্মীয়দের সাথে পর্দা করলেও গায়রে মাহরাম আত্মীয়দের সাথে পর্দা করেন না। অথচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আত্মীয়দের মাধ্যমেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি থাকে। কিছু দিন আগে ভাসুরের হাতে ভ্রাতৃবধুর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিলো। আমাদের নবী (স.) তো অনেক আগেই বলে গেছেন আলহামভু আল মাওতু। অর্থাৎ স্বামী পক্ষীয় আত্মীয় তো মৃত্যু। এ কথাটি তিনি বলেছিলেন গায়রে মাহরাম আত্মীয়ের সাথে পর্দার অপরিহার্যতা বর্ণনা করে।

ভাসুর, দেবর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, ভাসুরের ছেলে, দেবরের ছেলে, ননদের ছেলে, স্বামীর খালু-ফুফা, খালাতো, মামাতো, চাচাতো, ফুফাতো ভাই, এদের সবার সাথে পর্দা আছে। তেমনি নিজের খালু, ফুফা, খালাতো, ফুফাতো, মামাতো, চাচাতো ভাইয়ের সাথেও পর্দা আছে। একজন পর্দানশীল নারীকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়া অপরিহার্য। স্বামীর কর্তব্য এ বিষয়ে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা। কারণ স্ত্রী অজ্ঞ বা অসচেতন হলে তাকে সচেতন করা এবং পর্দায় অভ্যস্থ করা হলো স্বামীর কর্তব্য; তো স্ত্রী যখন স্বেচ্ছায় পর্দা করতে আগ্রহী তখন একে আল্লাহর মহা নেয়ামত মনে করা উচিত। বস্তুত এমন স্ত্রী হচ্ছেন নবীজীর আলমারআতুস সালিহা বা নেককার রমণী, যাকে তিনি খাইরু মাতায়িদ দুনিয়া বা জগতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মাহরাম পুরুষের মাঝেও স্তরভেদ আছে। সকল মাহরাম এক পর্যায়ের নয়। উপরন্তু কোনো মাহরাম যদি ফাসিক হয় কিংবা তার আচার-আচরণ মার্জিত ও শোভন না হয় তখনতো অনেক বেশি সতর্কতার প্রয়োজন। আল্লাহ পাক মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি শরীয়ত দান করেছেন। মানুষ যা জানে না তিনি তা জানেন, মানুষ যা বোঝে না তিনি তা বোঝেন। নামায রোযার মতো হজ্বও একটি ফরয ইবাদত। কিন্তু শরীয়তের বিধান হলো ফাসিক মাহরামের সাথে

নারী হজ্বে যেতে পারবে না। সুতরাং মাহরাম হলেই আর কোনো সতর্কতার প্রয়োজন নেই এমন নয়। এখনতো অনেক পরিবারে আল্লাহ হিফাযত করুন শ্বশুরের মাধ্যমেও পুত্রবধুদের নির্যাতিত হওয়ার কথা শোনা যায়। তেমনি কিছুদিন আগে পত্রিকায় এসেছিলো শাশুড়ি-জামাই বিয়ে এবং এ নিয়ে সালিশ দরবারের একটি সংবাদ। এসব কথা লিখতে খারাপ লাগছে, কিন্তু এগুলোই এখন বাস্তবতার অংশ। সুতরাং সচেতন না হয়ে উপায় নেই।

চার. পর্দানশীল নারীকেও কখনো কখনো পুরুষ চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। চিকিৎসকরা হচ্ছেন আমাদের সমাজের অভিজাত শ্রেণি। তাদের মধ্যে যেমন বিনয়ী ও চরিত্রবান ব্যক্তি আছেন, তেমনি কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যার দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পত্রিকার পাতায় দেখা যায়।
আমরা মুসলিম পর্দানশীল নারী। প্রথমেই আমরা খুঁজবো একজন নারী চিকিৎসক। পুরোপুরি পর্দানশীল চিকিৎসক পাওয়াতো মুশকিল, তবে পর্দানশীল নারীদের শ্রদ্ধা করেন, অন্তত ভদ্রতা ও সৌজন্যতা রক্ষা করেন এমন নারী চিকিৎসক এখনও আছেন। তবে কষ্ট করে তাদের খুঁজে নিতে হয়।

এককজন পুরুষ দাঁতের চিকিৎসার জন্য অন্য একজন পুরুষ চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখেছেন যে, সেখানে সিরিয়াল নিয়ে বেশ কয়েকজন বোরকাপরা নারীও বসে আছেন। অথচ দাঁতের ভালো চিকিৎসা করেন এমন নারী চিকিৎসক দুর্লভ নন।
দাঁতের চিকিৎসায় রোগীকে দীর্ঘ সময় চিকিৎসকের নিকট সান্নিধ্যে থাকতে হয়। এসময় রোগিনীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক, বিশেষত তরুনী ও যুবতী রোগিনীর ক্ষেত্রে এটা আরও সত্য।

মধ্য প্রাচ্যের একটি দেশের একজন দাঁতের চিকিৎসকের কথা সেখানকার পত্র-পত্রিকায় এসেছিলো, যিনি প্রায় প্রতিটি রোগিনীর সাথেই অশোভন আচরণ করেছেন। এমনকি সে সব দৃশ্য গোপন ক্যামেরায় ধারণ করে তাদের অনেককে অবৈধ সম্পর্কেও বাধ্য করেছেন।

আমাদের দেশেও কি এ ধরণের ঘটনা ঘটছে না? তো আমরা যারা পর্দা মেনে চলি তাদের সাবধান থাকা প্রয়োজন। একান্ত অপারগ অবস্থায় যদি পুরুষ চিকিৎসকের কাছে যেতেই হয় তাহলেও মাহরাম পুরুষকে সাথে নিয়ে চিকিৎসকের সামনে যাওয়া উচিত। কোনো অবস্থাতেই একা যাওয়া উচিত নয়। হাদীস শরীফে কি বেগানা নারী-পুরুষের একান্ত সাক্ষাতকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়নি?

পাঁচ. মোবাইল ফোন এখন আমাদের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। একটি মোবাইল নেই এমন মানুষ এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। মোবাইল ফোনের কারণে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়া ও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। এটা মোবাইলের সুফল।

অন্যদিকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান মেনে না চলার কারণে মোবাইলের মাধ্যমে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। আমাদের জানাশোনার মধ্যে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো এক ভদ্র পরিবারের পুত্রবধু যার স্বামী মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে কর্মরত। স্বামীর সাথে কথা বলার জন্য তার কাছে একটি ফোন ছিলো। সে ফোনেই মিসডকলের মাধ্যমে এক ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় হলো। একপর্যায়ে স্বামীর সংসার ও নিজের তিনটি সন্তান রেখে মহিলাটি উধাও হয়ে গেলো। এমন ঘটনাতো নতুন নয় তবে পরিবারটি যেহেতু ভদ্র ও মোটামুটি ধার্মিক হিসেবে পরিচিত ছিলো। তাই গ্রামে তোলপাড় শুরু হলো এবং পঞ্চায়েত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো যে, এ গ্রামের কোনো নারীর কাছে মোবাইল ফোন থাকতে পারবে না। যদি কারো কাছে মোবাইল ফোন পাওয়া যায় তাহলে তাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোবাইল ফোন ব্যবহার করার বিষয়ে আমরা কিছু সতর্কতা রক্ষা করতে পারি। পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের নাম্বার সংরক্ষণ করে রাখতে পারি এবং অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন এলে স্বামী বা অন্য কারো মাধ্যমে রিসিভ করাতে পারি। মহিলার কণ্ঠ শুনলেই অনেকে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা শুরু করে দেয় সেগুলোর জবাব না দিয়ে চুপচাপ মোবাইল বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আর প্রয়োজনে গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে কুরআনের বিধান অনুযায়ী অনাকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলা উচিত।

ছয়. আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত পীরভক্ত। ভক্তি শ্রদ্ধা যদি সঠিক মাত্রায় হয় এবং সঠিক পাত্রে হয় তাহলে দোষের কিছু নেই। হক্কানী পীর মাশায়েখ মানুষকে তাকওয়া পরহেযগারী শিক্ষা দেন এবং আত্মশুদ্ধির দীক্ষা দেন, সর্বোপরি তারা মানুষকে কুরআন সুন্নাহর পথে পরিচালিত করেন।

তাই আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে ইসলাহ ও সংশোধনের সম্পর্ক রাখা ফায়েদাজনক। তবে চকচকে সবকিছুই যেমন সোনা নয় তেমনি পীর নামধারী ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহওয়ালা নয়। সবকিছুর মতো এখানেও ভেজাল আছে। কিছু প্রতারক আছে, যারা নিজেদেরকে পীর নামে পরিচয় দেয় এবং নারী পুরুষের সকল সমস্যার সমাধানের গ্যারান্টি দেয়। বলাবাহুল্য, এরা পীর নয়।

এদের একটি বড় পরিচয় এরা পর্দা করে না। সকল বয়সের নারী অবাধে এদের কাছে যায় আর ওরাও নানরকম তেলেসমাতি দেখিয়ে মেয়েদেরকে ফাঁদে ফেলে। বন্ধাত্ব থেকে শুরু করে কতশত রোগের যে তারা সমাধান দেয় তার ইয়ত্তা নেই।

এ পর্দাহীনতার সপক্ষে তারা নানা রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। যেমন- কেউ বলে পীর হচ্ছে রূহানী পিতা, সুতরাং তার সাথে পর্দা কেন? কেউ বলে ভিতরের পর্দাই বড় পর্দা, বাইরের পর্দার প্রয়োজন কী? কিন্তু মনে রাখতে হবে, সকল পীরের বড় পীড় কুরআন মাজীদ; সকল মুরশিদের বড় মুরশিদ নবীর সুন্নাহ। সুতরাং কুরআন সুন্নাহর বিপরীতে কোনো পীরের পীরালি গ্রহণযোগ্য নয়।

তো যারা নিজেদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষায় আগ্রহী তাদেরকে এ সকল ভন্ড প্রতারকদের কাছ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। পর্দা হচ্ছে কুরআনের অকাট্য বিধান। এ বিধান লঙ্ঘনকারী সে যে পরিচয়ই ধারণ করুক কোনোভাবেই আল্লাহর খাস বান্দা হতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইফকের ঘটনা

আয়েশা (রা.) এর ওপর অপবাদের ঘটনা নিয়ে ইসলাম বিরোধী আপত্তি ও তার জবাব :

মেয়েদের দেখে সবচেয়ে বেশী চোখ হেফাযতকারী ছেলের ওপরেই মাঝে মাঝে চরিত্রহীনতার অভিযোগ আসে। অশ্লীলতা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকা মেয়েটার ওপরেই আসে চূড়ান্ত অশ্লীলতার অভিযোগ। নির্দোষ মানুষের পৃথিবীটা তখন খুব সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। জীবনটা মেঘে আঁধার হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন। তাই আল্লাহ স্বয়ং তাদের ইয্যতের হেফাযত করেন। যেমনটা করেছিলেন মরিয়ম (আ.) এর ক্ষেত্রে। করেছিলেন আমাদের মা আয়েশা (রা.) এর ক্ষেত্রে। চারপাশের সকল মেঘ দূরীভূত হয়ে ঝকঝকে সূর্য ওঠে। কিন্তু যাদের হৃদয়কে বক্রতা জেকে বসে, তারা কপটতা করবেই। সেকালেও করেছে, একালেও করবেই। আজকের গল্প তেমন এক ঘটনাকে নিয়ে।

ঘটনা সীরাতের পাতায় ইফকের ঘটনা নামে পরিচিত। ঘটনাটি ঘটে পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে। বনু মুসতালিকের যুদ্ধে। এ যুদ্ধে আগে থেকেই বুঝা যাচ্ছিলো যে, তেমন কোনো রক্তপাত ঘটবে না। মুসলিমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জিতবে। তাই মদিনার বিপুল সংখ্যক মুনাফিক এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। ইবন সা'দ বর্ণনা করেন- এ অভিযানে অসংখ্য মুনাফিক অংশগ্রহণ করে যা অন্য কোনো অভিযানে আগে দেখা যায়নি।

রাসূল (স.) যখন কোনো সফরে বের হতেন, তখন স্ত্রী নির্বাচনের জন্য লটারী করতেন বনু মুসতালিকের যুদ্ধে সফরসঙ্গী হিসাবে লটারীতে আয়েশা (রা.) এর নাম আসে। আয়েশা (রা.) যাত্রাকালে প্রিয় ভগ্নি আসমা (রা.) এর একটি হার ধার নেন। হারটির আংটা এতা দুর্বল ছিলো যে বারবার খুলে যাচ্ছিলো। সফরে আয়েশা (রা.) নিজ হাওদাতে আরোহণ করতেন। এরপর হাওদার দায়িত্বে থাকা সাহাবীগণ হাওদা ওঠের পিঠে ওঠতেন। তখন আয়েশা (রা.) বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। তিনি এতো হালকা গড়নের ছিলেন যে, হাওদা-বাহক সাহাবীগণ বুঝতে পারতেন না যে, ভিতরে কেউ আছে কি নেই।

সফরকালে রাতের বেলায় এক অপরিচিত জায়গায় যাত্রাবিরতী হয়। আয়েশা (রা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দূরে চলে গেলেন। ফেরার সময় গলায় হাত দিয়ে দেখলেন ধার করা হারটি নেই।

তিনি প্রচন্ড ঘাবড়ে গেলেন। প্রথমত, তার বয়স ছিলো কম আর তার ওপরে হারটি ছিলো ধার করা। হতভম্ব হয়ে তিনি হারটি খুঁজতে লাগলেন। বয়স কম হওয়ার কারণে তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিলো না। তিনি ভেবেছিলেন যাত্রা আবার শুরু হবার আগে তিনি হারটি খুঁজে পাবেন আর সময়মতো হাওদাতে পৌঁছে যাবেন। তিনি কাউকে ঘটনাটি জানালেন না।

খুঁজতে খুঁজতে তিনি হারটি পেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর। কিন্তু ততক্ষণে কাফেলা রওনা হয়ে গেছে। হাওদা বহনকারীগণ তারা ভেবেছিলেন, আয়েশা (রা.) হাওদার মধ্যেই রয়েছেন। এদিকে আয়েশা (রা.) কাফেলার স্থানে এসে কাউকে পেলেন না। তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানেই পড়ে রইলেন। ভাবলেন যখন কাফেলা বুঝতে পারবে তখন আবার এখোনে ফিরে আসবে। সে সফরে সাকাহ হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন সাফওয়ান (রা.)। সাকাহ বলতে কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের বুঝানো হয়। তাদের কাজ ছিলো কাফেলাকে কিছু দূর থেকে অনুসরণ করা। কেউ পিছিয়ে পড়লে কিংবা কোনো কিছু হারিয়ে গেলে তা কাফেলাকে পৌছে দেয়া। সাফওয়ান (রা.) ছিলেন বড় মাপের সাহাবী। তিনি পথ চলতে চলতে অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পেয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। আর চাদর মুড়ি দেয়া অবস্থাতেও আয়েশা (রা.) কে চিনতে পারলেন। আয়েশা (রা.) তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাকে সজাগ করার জন্য সাফওয়ান (রা.) জোরে ইন্নালিল্লাহ বলে আওয়াজ দিলেন। বললেন এ যে রাসূলের সহধর্মিণী আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। কি করে আপনি পিছে রয়ে গেলেন।

আয়েশা (রা.) কোনো জবাব দিলেন না। সফওয়ান (রা.) একটি উট এনে তাতে আয়েশা (রা.) কে আরোহণ করতে বলে দূরে সড়ে দাঁড়ান। আয়েশা (রা.) উটের পিঠে আরোহণ করলে তিনি উটের লাগাম ধরে সামনে পথ চলতে থাকেন। অনেক চেষ্টা করেও তারা ভোরের আগে কাফেলাকে ধরতে পারলেন না।

ঘটনাটি এতোটুকুই এবং যেকোনো সফরে এমন ঘটা একদম স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে তারা ঘটনাটিকে লুফে নিলো। কুৎসা রটাতে লাগলো। তবে যাদের হৃদয় পবিত্র তারা এসব শোনামাত্রই কানে আঙুল দিয়ে বলতেন : আল্লাহ মহাপবিত্র এটা সুস্পষ্ট অপবাদ ছাড়া কিছুই না।

আবু আইয়ুব (রা.) তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে আইয়ুব! ঐদিন তোমার ব্যাপারে কেউ এমন মন্তব্য করতো, তুমি কি মেনে নিতে? তার স্ত্রী জবাব দিলেন, আল্লাহ মাফ করুন, কোনো অভিজাত নারীই তা মেনে নিতে পরে না। তখন আবু আইয়ুব বললেন আয়েশা (রা.) তোমার চেয়ে অনেক অনেক অভিজাত। তা হলে তার পক্ষে এটা কীভাবে মেনে নেয়া সম্ভব?

এ ঘটনা সব জায়গায় ছড়ানোর মূল হোতা ছিলো আব্দুল্লাহ ইবন উবাই। আমিরুল মুনাফিকুন, মুনাফিকদের সর্দার। ঘটনাক্রমে আরো তিনজন সম্মানিত সাহাবী এ কুচক্রে জড়িয়ে পড়েন। হাসসান ইবন সাবিত (রা.), হামনা বিনতে জাহশ (রা.) আর মিসতাহ ইবন আসাসাহ (রা.)।
এদিকে আয়েশা (রা.) মদিনায় পৌঁছানোর পর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে জানতেন না। রাসূল (স.) আবু বকর (রা.) কে কিছুই জানালেন না। আয়েশা (রা.) আর রাসূল (স.) এর মধ্যে খুব উষ্ণ সম্পর্ক ছিলো সবসময়। রাসূল (স.) আয়েশা (রা.) কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন।

এক সাথে দৌড় খেলতেন, ইচ্ছা করে হেরে যেতেন। আয়েশা (রা.) পাত্রের যে দিক দিয়ে পান করতেন, রাসূল (স.) সেদিক দিয়ে পানি পান করতেন। আয়েশা (রা.) অসুস্থ হলে তিনি দয়া আর কোমলতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু এবারের অসুস্থতায় আগের মতো কোমলতা প্রদর্শন করলেন না। আয়েশা (রা.) লক্ষ্য করলেন রাসূল (সা.) আর আগের মতো তার সাথে প্রাণ খুলে কথা বলেন না। পুরো ব্যাপারটায় তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তাই রাসূল (স.) এর অনুমতি নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। তখনো তিনি আসল ঘটনাটি জানতেন না। পরবর্তীতে, একদিন রাতের বেলা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে বের হলে মিসতাহ (রা.) এর মা তাকে পুরো ঘটনাটি জানান। নিজের ছেলেকে মা হয়ে অভিশাপ দেন। আয়েশা (রা.) এর কাছে তখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তিনি রাত-দিন অবিরত কাঁদতে থাকলেন।

এদিকে তার বিরুদ্ধে অপবাদকারীরা আরো জোরে শোরে তাদের কুৎসা রটাতে থাকে। প্রায় ১ মাস হয়ে যায়। কোনো মীমাংসা হয় না। মুনাফিক আর গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া সবাই বিশ্বাস করতো আয়েশা (রা.) নির্দোষ ছিলেন। তারপরেও স্বচ্ছতার স্বার্থে রাসূল (স.) ঘটনার তদন্ত করলেন। তিনি উসামা (রা.) আর আলী (রা.) এর সাথে পরামর্শ করলেন। উসামা (রা.) বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা ভালো ভিন্ন আর কিছুই জানি না।”

আলী (রা.) ঘটনার আরো সুষ্ঠু তদন্তের জন্য রাসূল (স.) কে ঘরের দাসীদের জিজ্ঞেস করতে বললেন। দাসীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বললো, তার মধ্যে আমি দোষের কিছুই দেখি না। কেবল এতোটুকুই যে, তিনি যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়েন, আর বকরী এসে সব সাবাড় করে নিয়ে যায়। রাসূল (সা.) বুকভরা কষ্ট নিয়ে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বললেন, "লোকসকল! মানুষের কি হয়েছে? তারা আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তারা মিথ্যা বলছে আমার পরিবারের বিরুদ্ধে।

রাসূল (স.) এরপর আবু বকর (রা.) এর গৃহে আগমন করেন। আয়েশা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে আয়েশা! লোকেরা কি বলাবলি করছে তা তো তোমার জানা হয়ে গেছে। তুমি আল্লাহকে ভয় করো। আর লোকেরা যেসব বলাবলি করছে তাতে লিপ্ত হয়ে থাকলে তুমি আল্লাহর নিকট তাওবা করো। আল্লাহতো বান্দার তাওবা কবুল করে থাকেন।

আয়েশা (রা.) সে কষ্টের অভিজ্ঞতার কথা সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে লক্ষ্য করে একথাগুলো বলার পর আমার চোখের অশ্রু সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। আমার সম্পর্কে কুর'আন নাযিল হবে! আমার নিজেকে নিজের কাছে তার চাইতে তুচ্ছ মনে হয়েছে। তখন আমি বললাম- আমার সম্পর্কে যেসব কথা বলা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি কখনোই তাওবা করবো না। আমি যদি তা স্বীকার করি তবে আল্লাহ জানেন যে আমি নির্দোষ আর যা ঘটেনি তা স্বীকার করা হয়ে যাবে। আমি ইয়াকুব (আ.) আর নাম স্মরণ করতে চাইলাম। কিন্তু মনে করতে পারলাম না। তাই আমি বললাম- ইউসুফ (আ.) এর পিতা যা বলেছিলেন, তেমন কথাই আমি উচ্চারণ করবো সুন্দর সবরই (উত্তম) আর তোমরা যা বলছো সে ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।[২২১]

এ পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলো আয়েশা (রা.) সম্পর্কে- "যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি। যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।"[২২২]

২২১. *আল কুরআন*, ১২ : ১৮
২২২. *আল কুরআন*, ২৪ : ১১, ১৯

আয়াত নাযিলের পর আয়েশা (রা.) এর মা প্রচণ্ড খুশী হন। মেয়েকে বলেন, যাও মা! আল্লাহর রাসূলের শুকরিয়া আদায় করো। আয়েশা (রা.) তখন এক বুক অভিমান নিয়ে বললেন, আমি কখনোই তার শুকরিয়া আদায় করবো না। বরং যে আল্লাহ তা'য়ালা আমার নিষ্কুলষতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমি কেবল তারই শুকরিয়া আদায় করবো।

বর্তমান সময়ের ইসলাম-বিদ্বেষীরা প্রশ্ন তোলে যে," যেহেতু আয়াত নাযিল হতে এক মাসের বেশী সময় লাগে, এতে কি বোঝা যায় না যে, মুহাম্মদ আসলে কনফিউজড ছিলেন যে তিনি কি ধরনের আয়াত উপস্থাপন করবেন? তিনি আসলে মাসিকের অবস্থা দেখে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন, আয়েশা নির্দোষ কি না! তা না হলে এক মাস অপেক্ষা কেনো?"

একেবারে কট্টর ইসলাম-বিদ্বেষী লেখকদের লেখা না পড়লে এ ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব। সত্যি বলতে, আমি যখন পুরো ঘটনাটি পড়েছি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে, তখন আমার ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি।

লেখকরা যখন কোনো কিছু লিখেন তখন তাদের লেখায় তাদের জীবনের ছাপ ফুটে ওঠে। এটা ফুটে ওঠতে বাধ্য। এ ব্যাপারটা মানবীয়। যদি কুর'আন সত্যিই রাসূল (স.) এর নিজের আবিষ্কার হতো, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে আয়াত রচনা করতেন। কারণ, পৃথিবীতে তিনি তখন আয়েশা (রা.) কেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। এক মাস অপেক্ষা করে জল-ঘোলা করার সুযোগ দিতেন না। এক মাসের বেশী বিলম্ব করাটাই প্রমাণ করে, কুর'আন তার নিজের লেখা নয়।

আর কতোটা কুৎসিত মানসিকতার হলে, পুরো ব্যাপারটিকে মাসিকের দিকে টানা যায়? তারা বুঝাতে চান যে, রাসূল (স.) আসলে মাসিকের অবস্থা দেখে বুঝতে চেয়েছিলেন যে, সত্যিই আয়েশা (রা.) এ গুনাহের কাজ করেছিলেন কিনা! এটা একটা হাস্যকর যুক্তি। কারণ-

প্রথমত, আয়েশা (রা.) থেকে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে। কিন্তু তিনি কখনো মা হতে পারেননি। তাই অবশ্যই এভাবে রাসূল (স.) তাকে বিচার করবেন না।

দ্বিতীয়ত, আয়েশা (রা.) তখন রাসূল (স.) এর নিকটে ছিলেন না। তিনি পিতৃগৃহে চলে গিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, ওহী নাযিলের ঠিক আগেও রাসূল (স.) গুনাহ করে থাকলে আয়েশা (রা.) কে তাওবা করতে বলেছিলেন। যার অর্থ, ওহী নাযিলের আগে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত দেননি এ ব্যাপারে।

স্যার উইলিয়াম মেইবার তার "লাইফ অফ মুহাম্মদ" গ্রন্থে ইফক নিয়ে ভয়াবহ সব কথা লিখেছেন। যার কোনো ভিত্তি নেই। তিনি নিজে থেকে গল্প ফেঁদেছেন। বর্তমান কালের ইসলাম বিদ্বেষীরা ধর্ম-গ্রন্থের মতোই এসব বানোয়াট কথাকে আঁকড়ে ধরেছে। তিনি আয়েশা (রা.) কে চরিত্রহীন প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যেমন : একবার হাসসান (রা.) অনুতপ্ত হয়ে আয়েশা (রা.) কে কবিতা শোনান-"তিনি পবিত্র, ধৈর্যশীলা, নিষ্কলঙ্ক-নির্দোষ। তিনি সরলা নারীর গোশত খান না।"

স্যার উইলিয়াম মেইবার এই কবিতা নিয়ে লিখেন- "হাসসান অতি চমৎকার কবিতা রচনা করলেন। তাতে আয়েশা এর পবিত্রতা, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা আর নিখুঁত কমনীয় দেহের বর্ণনা ছিলো। তোষামদে ভরা এ স্তুতিকাব্য আয়েশা ও হাসানের মনোমালিন্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখলো।"

এ ধরনের মন্তব্য খুব হাস্যকর। কারণ, হাসসান (রা.) যখন এ কবিতাটি পাঠ করেন তখন আয়েশা (রা.) এর বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি। তখন তার দেহ কমনীয় কি করে হয়? যখন আমরা জানি, পনের-ষোল বছর বয়সেই তার দেহ ভারী হয়ে গিয়েছিলো। তিনি লিখেছেন- যেহেতু নিখুঁত কমনীয় দেহের প্রতি আয়েশার ভীষণ গর্ব ছিলো, তাই লাইনটি শুনে তিনি অতি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে পড়েন। উৎসাহের আতিশায্যে কবিকে থামিয়ে বলেন- কিন্তু তুমি তো এমন নও।

আসলে লেখকের গোলমাল পাকিয়েছে এ লাইনে- "তিনি সরলা নারীর গোশত খান না।" সম্ভবত তিনি জানেন না, আরবি ব্যাকরণে "কারো গোশত ভক্ষণ করা" বলতে গীবতকে বোঝানো হয়। এ লাইন দ্বারা হাসসান (রা.) বুঝিয়েছিলেন, আয়েশা (রা.) কখনো কোনো নারীর গীবত করেন না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা.) এর ইফকের ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিলো। হাসসান (রা.) নিজেই তার ওপর অপবাদ আরোপ করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, হে হাসসান! তুমি তো এমন নও। তুমি তো ঠিকই আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিলে। তিনি মোটেই এ কথা বোঝাননি যে, তিনি দেখতে খুব সুন্দর আর হাসসান (রা.) কুশ্রী। অনেক কুযুক্তি দেয়ার পরেও

শেষে স্যার উইলিয়াম মেইবার অবশ্য কিছুটা হতাশ হয়ে লিখতে বাধ্য হন- "আয়েশার আগের জীবন আমাদের আশ্বস্ত করে যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন।"

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) মদীনায় আগমন করলেন। আমি তাঁর থেকে পূর্বে যে নিবিড় ভালোবাসা পেয়েছি তা আর পেলাম না। মানুষেরা ইফকের ঘটনা বলাবলি করছিল অথচ আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। একমাস পর্যন্ত আমি খুব কষ্ট পেলাম। তাঁর দ্বারা এর পূর্বে আমি কখনও এমন কষ্ট পাইনি।

(একদিন) রাসূল (স.) আমার কাছে এসে কুশালাদি জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর ফিরে গেলেন। আমি আরো বেদনাহত হলাম। আমি ব্যাপরটি তখনও উপলব্ধি করতে পারিনি। অবশেষে বিষয়টি জানতে চেষ্টা করলাম। একদিন আমি উম্মে মিসতাহের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম মাঠের দিকে প্রাকৃতিক জরুরত সারতে। আমরা আমাদের ঘরের পাশেই বিচরণ করতাম। আমি এবং উম্মে মিসতাহ রাতে ছাড়া বের হতাম না। উম্মে মিসতাহ ছিল, আবু রিহাম ইবন মুত্তালিব ইবন আবদে মানাফের মেয়ে আর আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খালা। তার ছেলে হল মিছতাহ ইবন উছাছা ইবন উব্বাদ ইবন মুত্তালিব।

প্রাকৃতিক হাজত পূর্ণ করার পর আমি এবং উম্মে মিসতাহ আগমন করছিলাম। কিন্তু দ্রুত হাটার কারণে উম্মে মিসতাহ হোচট খেয়ে পড়ে যান। তখন উম্মে মিসতাহ তার ছেলেকে বদদোয়া দিলেন। আমি বললাম, আপনি তাকে বদদোয়া দিচ্ছেন অথচ তিনি বদরী সাহাবী। উম্মে মিসতাহ বললেন, আপনি কি জানেন, সে আপনার সম্পর্কে কী বলে? আমি বললাম, সে কী বলে? অতঃপর তিনি ইফকের ঘটনাটি আমাকে বললেন। বললেন, নিশ্চয়ই আপনি মুমিনাহ এবং অনবগতশীলদের মধ্যে। এরপর আমার বেদনা আরো বেড়ে গেল। এরপর আমি বাড়িতে ফিরলাম। রাসূল (স.) আমার কাছে আসলেন। আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, আমাকে কি একটু আমার পিতা মাতার কাছে যেতে দিবেন? আমার ইচ্ছা ছিল তাঁদের কাছ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া। রাসূল (স.) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার পিতা মাতার কাছে আসলাম। আমি আমার আম্মাকে বললাম, মা! লোকেরা এসব কী বলে? আম্মা আমাকে সান্তনা দিলেন। আমিও আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করলাম।

আমি ঐ রাত সকাল পর্যন্ত কেঁদে কাঁটিয়েছি। আমার চোখের পানি সামান্য সময়ের জন্যও বন্ধ হয়নি। ইত্যবসরে আমার আব্বা আমার কাছে আসলেন। আমি তখনও কাঁদছিলাম। আমার আব্বা আম্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কাঁদে কেন? আম্মাজান বললেন, আপনি কি জানেন না, তাঁর সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে? আমি শুধু কাঁদতেই ছিলাম।

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উছামা ইবনে যায়েদ (রা.) কে ডাকলেন। তখনও এ বিষয়ে ওহী নাযিল হয়নি। তিনি ওহীর অপেক্ষায় ছিলেন। আর রাসূল (স.) তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করবেন কিনা সে বিষয়ে এ দু'জনের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। হযরত উছামা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো আপনার পরিবার। আমরা তাঁকে ভালোই জানি। হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহ আপনাকে সংকীর্ণ করবেন না। তিনি ব্যতীত আরো মহিলা আছে। আপনি বাদিকে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনাকে তাঁর ব্যাপারে সত্যায়ন করবেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ বারিরাহকে (বাদি) ডাকলেন। তিনি তাকে বললেন, তোমার এ বেদনাদায়ক বিষয় সম্পর্কে অভিমত কী? তিনি বললেন, ঐ সত্তার ক্বছম যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি তার বিষয়ে আপত্তিকর কোনো কিছু দেখিনি, শুধু এতটুকু যে, সে অল্প বয়স্কা একটি বালিকা, রুটির খামির করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর গৃহপালিত পশু এসে খেয়ে ফেলে (এমন সরলমনা ছোট্ট একটি মেয়ের ব্যাপারে কী ধারণা করা যেতে পারে?

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ মিম্বারে দাঁড়ালেন এবং খোতবা দিলেন। তিনি বললেন, হে মুসলমানদের জামায়াত! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার ওযর আপত্তি শুনবে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর ক্বছম, আমি আমার পরিবারকে ভালোই জানি। আমি অনেক লোকের সঙ্গেই আলোচনা করেছি। তারা ভালো জানে।

অতঃপর হযরত সা'আদ ইবন মুয়াজ (যিনি বনু আশহালের ভাই) দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমি, ইয়া রসুলাল্লাহ! কৈফিয়াত তলব করব। যদি ঐ ব্যক্তি (যে ব্যক্তি অপবাদ দিয়ে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে) আউছ গোত্রের হয় তবে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। আর যদি সে খাজরাজ গোত্রের হয় তবে তাদের ব্যাপারে আপনি যা বলবেন আমরা তাই করব। এরপর হযরত সা'আদ ইবন উবাদা দণ্ডয়মান হলেন। তিনি ছিলেন খাজরাজ গোত্রের বড় নেককার মানুষ কিন্তু স্বজাতীর টান তাকে ক্রোধোদ্দীপ্ত করে তুলল। তিনি সা'আদ ইবন মুআযকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর ক্বছম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।

এরপর উছাইদ ইবন হুজাইর দাঁড়ালেন। তিনি সা'আদ ইবন মুআযের চাচা। অতঃপর সা'আদ ইবন উবাদা বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর ক্বছম, আমরা তাকে হত্যা করব। তুমি একজন মুনাফিক অপর মুনাফিকের পক্ষ হয়ে ঝগড়া করছ।

এভাবে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আউছ ও খাজরাজ হত্যাযজ্ঞের জন্য পরস্পর মুখোমুখি হল। হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) তখনও মেম্বরে বসে আছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে প্রশমিত করলেন। তারা চুপ হল।

আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রা.) বলেন, আমি সারা দিন আর সারা রাত কাঁদলাম। আমার চোখের পানি বন্ধ হচ্ছিল না। ঘুমও দূর হয়ে গিয়েছিল। সকালে আমার পিতা আমার কাছে আসলেন। আমি দুই দিন একরাত শুধু কেঁদেই কাটিয়েছি। আমি ধারণা করছিলাম কান্নার কারণে আমার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমার পিতা মাতা আমার নিকট বসে আছেন এমন সময় আনসারী একজন মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইল। আমি অনুমতি দিলাম। সে আমার পাশে বসে কাঁদছিল। আমরা সবাই এমন অবস্থায় ছিলাম হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ (স.) প্রবেশ করলেন এবং আমাদেরকে ছালাম দিলেন। এরপর তিনি বসলেন।

আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রা.) বলেন, অথচ আমার ব্যাপারে এ ক্লেদপূর্ণ কথা চলাকালিন সময়ের মধ্যে তিনি কখনও আমার পাশে বসেননি। এক মাসের মত অতিবাহিত হয়ে গেল, এর মধ্যে এ সংক্রান্ত কোন ওহীও নাযিল হয়নি। এরপর তিনি আমার পাশে বসে তাশাহুদ পড়লেন এবং বললেন, আম্মাবাদ, হে আয়িশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এমন এমন কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি এ দোষ হতে মুক্ত হও তবে অচিরেই আল্লাহ তোমার দোষমুক্তির ঘোষণা দিবেন।

আর যদি তুমি দোষি হও তবে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও ও তাঁর কাছে ফিরে এসো। কেননা বান্দা যখন গোনাহের কথা স্বীকার করে এরপর তাওবা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন তার কথা শেষ করলেন তখন আমার চোখের পানি নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি এক ফোঁটাও আর অনুভব করলাম না। আমি আমার আব্বাকে বললাম, আব্বা! আমার পক্ষ থেকে আপনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে উত্তর দিয়ে দিন।

আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর ক্বছম! আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ (স.) কে কী বলব? এরপর আমি আমার আম্মাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (স.) কে উত্তর দিয়ে দিন। আমার মা বললেন, আল্লাহর ক্বছম! আমি জানি না। রাসূলুল্লাহ (স.) কে কী বলব? অতঃপর আমিই বললাম, আমি অল্প বয়স্কা একটি মেয়ে, আমি বেশি কুরআন পড়তেও পারি না।

আল্লাহর কৃছম! আমি জানি, আপনারা এ যে কথা শুনেছেন, এ কথা আপনাদের মনে বসে গেছে এবং এটাকে সত্য মনে করছেন। কাজেই আমি যদি আপনাদের বলি যে, আমি পবিত্রা (নির্দোষ) তবে আপনারা আমাকে সত্যায়ন করবেন না।

আর যদি আমি আপনাদের নিকট কোনো কিছু স্বীকার করি অথচ আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, আমি সে ব্যাপারে পবিত্রা ও নির্দোষ তখন আপনারা আমাকে সত্যায়ন করবেন। কাজেই আল্লাহর কৃছম! আমি আমার নিজের ও আপনাদের উপমা হযরত ইউছুফ (আ.) এর পিতার মতই দেখছি! তিনি বলেছিলেন, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অর্থাৎ এখন ছবর করাই আমার জন্য শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।[২২৩]

এরপর আমি অন্যদিকে ফিরলাম ও বিছানার উপর শুয়ে পড়লাম। আল্লাহই জানেন আর আমিও জানি যে, আমি নির্দোষ। আল্লাহ নিঃসন্দেহে আমার নির্দোষ ঘোষণা করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহর কৃছম! আমি ধারণাও করতে পারিনি যে, আল্লাহ আমার শানে ওহী নাযিল করবেন। আমার ব্যাপারে তো আমার ধারণা ছিল যে, আমার বিষয়ে আল্লাহ কথা বলবেন!–আমিতো একটা নিকৃষ্ট (আমিতো এর উপযুক্ত নই) বরং আমি আশা করতাম, আমার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (স.) কে কোনো স্বপ্নের মাধ্যমে আমার পবিত্রতা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহর কৃছম! রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর মজলিস থেকে তখনও ওঠেননি, ঘরের লোকেরা কেউ ঘর হতে বের হয়ে যাননি, ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীর ওপর ওহী নাযিল করলেন। ওহীর কারণে রাসূলুল্লাহ (স.) এর কষ্ট হচ্ছিল। এমনকি ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর এ ঘাম শীতের দিনের শিশিরের (মুক্তার) মত মনে হচ্ছিল।

আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দীকাহ (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) হতে কষ্টের রেখা কেটে গেল। তিনি হাসছিলেন। তিনি প্রথমেই বললেন, হে আয়িশা! শুনে রাখো, আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আমার আম্মা আমাকে বললেন, তাঁর নিকট যাও। আমি বললাম, আমি তাঁর নিকট যাবো না। কেননা আমি শুধু আল্লাহরই প্রশংসা করব।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, আমি এখন থেকে আর কখনও মিসতাহকে সাহায্য করব না। হযরত আবু বকর (রা.) তার আত্মীয়তা ও দারিদ্রের কারণে তার জন্য অনেক খরচ করতেন।

---

২২৩. *আল কুরআন*, ১২ : ১৮

তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কৃছম! আমি আল্লাহর ক্ষমাকে পছন্দ করি। এরপর তিনি মিসতাহের ওপর আবার খরচ করতে লাগলেন এবং বললেন, আমি কখনও তার জন্য খরচ করা বন্ধ করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) ঘটনা আলোচনা করলেন এবং কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন।

ইফকের ঘটনার শিক্ষা :

ইসলাম বিদ্বেষীরা যেখানে কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না, সেখানেও আল্লাহ মুসলিমদের জন্য চমৎকার কিছু শিক্ষা রেখে দিয়েছেন। আমরা শিখতে পেরেছি, একজন সতী নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হলে তার কি করা উচিত? উন্নত দেশে যেখানে ধর্ষণের শাস্তি হয় না, সেখানে কুর'আন সতী নারীদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ কারীদের জন্য কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে।

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান।[২২৪]

মিসতাহ (রা.) ভুলক্রমে এ কুৎসায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। অথচ তার ভরণ-পোষণ করতেন আবু বকর (রা.)। নিজের মেয়েকে এ অপবাদ দিতে দেখে, আবু বকর (রা.), মিসতাহ (রা.) কে আর সাহায্য করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। "তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"[২২৫]

এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, কুরআন রাসূল (স.) এর কোনো ব্যক্তিগত বই ছিলো না। তা না হলে নিজ স্ত্রীকে নিয়ে বাজে মন্তব্যকারীর সাহায্য বন্ধ হতে দেখে উনার খুশী হওয়া উচিত ছিলো। এটাই স্বাভাবিক এবং মানবীয়। এ ঘটনা প্রমাণ করে, এ কুরআন মানুষের তৈরি কোনো বই না। বরং এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে। কেবল তাঁর কাছে নিজেকে বিনীত করেই প্রকৃত "মুক্তমনা" হওয়া সম্ভব।

---

২২৪. *আল কুরআন*, ২৪ : ৪
২২৫. *আল কুরআন*, ২৪ : ২২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্যের গৃহে প্রবেশে ইসলামের বিধান

মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ ও মুক্তির জন্য ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যা কিছু মানুষের জন্য সর্বোত্তম ও শিষ্টতাপূর্ণ এবং কল্যাণজনক, তাই বিধিবদ্ধ করেছে ইসলাম। ইসলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোন্নত এবং সর্বাধিক মানবতা পরায়ণ ও জীবনঘনিষ্ঠ ধর্ম। জীবন ও জগতের খুঁটিনাটি থেকে বৃহৎ- সব বিষয়ের যাবতীয় নিয়মাবলি ও দিকনির্দেশনা এবং সুষ্ঠু সমাধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিয়েছে ইসলাম। তাই জীবনাচারের প্রতিটি বিষয় ইসলাম গুরুত্বের সঙ্গে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। যেন জীবনযাপনে ও ধর্ম পালনে মানুষজন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়।

রাসূল (স.) এর শিক্ষা পেয়ে সাহাবিরা পুরোপুরি সার্থকভাবে এ উত্তম শিষ্টাচারের অনুশীলন ও চর্চা করেছেন। অন্যের ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং তাদের সালাম না জানিয়ে প্রবেশ করো না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[২২৬]

নারী-পুরুষ, পিতা-মাতা, ছোট-বড়, মাহরাম-গায়রে মাহরাম যে কারও ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। অবশ্য আপন স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়। তারপরও স্ত্রীর কাছে প্রবেশের আগে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা ঝেড়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

হযরত উমর (রা.) সহ আরও অনেক সাহাবি অনুমতি চাওয়ার সময় নিজের নামও বলতেন। একবার হযরত উমর (রা.) রাসূল (স.) এর ঘরের দরজায় এসে বললেন, 'উমর কি ঘরে প্রবেশ করতে পারে?' অনুমতি প্রার্থনাকালে যদি নাম উল্লেখ করা না হয় এবং ঘরের বাসিন্দারা অনুমতি প্রার্থীর নাম-পরিচয় জিজ্ঞেস করে, তবে স্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করতে হবে। যাতে ঘরের বাসিন্দারা নিশ্চিত হয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া কিংবা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

---

২২৬. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৭

প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়ার অনেক তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. মানুষ নিজ ঘরে স্বাধীনভাবে কাজ করে। অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। উপরন্তু কষ্টের কারণ হয়;

২. বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ অন্যের কাছে যায়। অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে ঘরের লোকেরা সাক্ষাৎপ্রার্থীর প্রতি সদয় ও বিনম্র হয়। ফলে সাক্ষাৎপ্রার্থীর লক্ষ্য পূরণ অনেকটা সহজ হয়;

৩. বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে হয়তো এমন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত হতে পারে, যা দ্বারা অন্তরে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ফলে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার পথ খুলে যায়;

৪. সবার অগোচরে মানুষ নিজের ঘরে অনেক কিছু করে, যা কারও কাছে প্রকাশ পাওয়া সে পছন্দ করে না। বিনা অনুমতিতে কারও ঘরে প্রবেশ করলে তার গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা তার কষ্টের কারণ হতে পারে। ফলে বিনা অনুমতিতে প্রবেশকারী মুসলমানকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে।

সব সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ইসলাম প্রবেশাধিকারের জন্য অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব ও শর্ত করে দিয়েছে। যাতে মানুষের স্বাধীনতা-স্বকীয়তা, গোপনীয়তা ও স্বার্থ রক্ষা হয় এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে।

অন্যের গৃহে প্রবেশের নিয়ম কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা :

ইসলাম অসৎবৃত্তির উৎপত্তি ও অসত প্রবণতা রোধে অশ্লীলতা দমন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন বিধান জারি করেছে, তন্মধ্যে অন্যতম বিধান হলো ঘরে প্রবেশ করার বিধান। জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা (সুপ্রভাত, শুভসন্ধ্যা) বলতে বলতে নিঃসঙ্কোচে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ করে যেত, অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহমালিক ও তার বাড়ির মহিলাদের বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলত, আল্লাহ তা'আলা এ প্রথা সংশোধনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির, যেখানে সে অবস্থান করে, সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করার অন্য কারো অধিকার নেই। তাই কারো গৃহে প্রবেশ করার আগে অনুমতি নেয়া ও সালাম দেয়ার বিধান ইসলাম জারি করেছে।

কুরআনের আলোকে অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান :

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ- فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ-

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশে করো না যে পর্যন্ত পরিচয় প্রদান না কর এবং (প্রবেশের অনুমতি চেয়ে) গৃহবাসীদেরকে সালাম না দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবু অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা রয়েছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা তা ভালোভাবে জানেন।"[২২৭]

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, দু'টি কাজ না করা পর্যন্ত কারো গৃহে প্রবেশ করো না :

(১) পরিচয় দান করে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া এবং

(২) সালাম প্রদান। অর্থাৎ প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে অতঃপর প্রবেশের অনুমতি চেয়ে সালাম প্রদান করতে হবে। নিম্নে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

প্রথম বিষয় : পরিচয় প্রদান ও প্রবেশের অনুমতি চাওয়া :

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا শব্দের অর্থ যেন পরস্পর পরিচয় লাভ করতে পারো। এখানে এ শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রবেশের পূর্বে পরিচয় বিনিময়ের দ্বারা গৃহবাসীগণ আশ্বস্ত হন, তারা আতঙ্কিত হন না।

আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যা পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত বচন। কিন্তু নারীরাও এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, পবিত্র কুরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্বেও মহিলারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

---

২২৭. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৭

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে পরিচয় ও সালাম বিনিময় করায় পুরুষ-নারী, মাহরাম ও গাইরে মাহরাম সবাই শামিল রয়েছে। সুতরাং কোনো নারী অপর নারীর কাছে অথবা কোনো পুরুষ অপর কোনো পুরুষের কাছে যেতেও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনি করে সবার জন্যই এ বিধান। এমনকি কেউ যদি স্বীয় মা, বোন বা মাহরাম নারীর কাছে যায়, তাহলেও প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালেক (রহ.) মুয়াত্তা গ্রন্থে ইব ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, “ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মায়ের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব?” রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, “হ্যাঁ, চাইবে।” সাহাবী বললেন, “আমি তো সর্বদা মায়ের গৃহেই বসবাস করি।” উত্তরে নবীজী (স.) বললেন, “তবুও অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করো না।” সাহাবী আবার বললেন, “আমি তো সর্বদাই তার কাছে থাকি।”

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে কেউ অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করতে চাইলে, পূর্বেই সালাম দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। এ হুকুম নারী ও পুরুষ এবং মাহরাম ও গাইরে মাহরাম সবার জন্যই সমান। অপর রিওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবন জুরাইজ (রহ.) হযরত আতা (রহ.) কে জিজ্ঞেস করেন, নিজ স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়েও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী? তিনি বললেন, না। আল্লামা ইবন কাসীর (রহ.) এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করে বলেন, তা ওয়াজিব নয়, তবে মুস্তাহাব ও উত্তম।

আজকাল যান্ত্রিক যুগে শহরে-বন্দরে যেসব বাসা-বাড়ী রয়েছে, সেগুলোতে অবশ্য কলিংবেল থাকে। এগুলো দ্বারা সংকেত দেয়ার মাধ্যমে সাধারণত অনুমতি চাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু বাসায় ঢোকার সালাম দেয়ার হুকুম বলবৎ থাকবে এবং অনুমতি পাওয়ার পর বাড়ীতে প্রবেশ করে এক রুম থেকে অন্য রুমে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা গ্রাম বাংলায় এখনো অনেক খোলামেলা ঘর-বাড়ী রয়েছে, সেগুলোর বেলায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের উপর্যুক্ত হুকুম পুনঃ প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সেগুলোতে প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে।

অনুমতি গ্রহণের উপকারিতা :

প্রথম উপকারিতা : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা করে দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া হোক। তার গৃহআবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরামের সাথে অবস্থান। পবিত্র কুরআনে অমূল্য নিয়ামত রাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন।"

গৃহের এই শান্তি ও আরাম তখন অক্ষুন্ন থাকতে পারে, যখন সে নিজ ঘরে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে। তাই অনধিকার প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন ঘটানো গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পন্ড করে দেয়ার নামান্তর। যা কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। এ জন্য তার নিকট প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়াকে ওয়াজিব করে ইসলামে তার শান্তিতে বসবাসকে নির্বিঘ্ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উপকারিতা : আকস্মিক কেউ কারো গৃহে প্রবেশ করলে সে অজানা আতঙ্কে ভীত হয়ে পড়তে পারে। আর কোনো মুসলমানকে এভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে কষ্ট দেয়া গুনাহর কাজ। তাই অনুমতি গ্রহণের মাধ্যমে পরিচয় ও কুশল বিনিময়ের দ্বারা সে আতঙ্কাবস্থা দূর করা হয়েছে।

তৃতীয় উপকারিতা : এতে লজ্জাভাব বজায় থাকে এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার পথ রুদ্ধ হয়। কারণ, বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করলে, মাহরাম নয়, এমন নারীর ওপর দৃষ্টি পড়তে পারে। অথচ তা হারাম। তদুপরি তা সংকোচ ও লজ্জার ভাব দূর করে বেপর্দেগীর মাধ্যমে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা সৃষ্টি করবে। তাই যখন অনুমতি চাওয়া হবে, তখন তারা সতর্ক হয়ে পর্দা করবে। এতে হায়া-সম্ভ্রম বজায় থাকবে।

চতুর্থ উপকারিতা : মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহে এমন কিছু কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। এমতাবস্থায় যদি কেউ অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়ে, তাহলে সে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। এভাবে তাকে বিব্রত করাও ইসলামে নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় বিষয় : সালাম প্রদান :

উপর্যুক্ত আয়াতে দ্বিতীয় আদব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا অর্থাৎ গৃহবাসীদেরকে সালাম দিবে।

বলা বাহুল্য, আয়াতে যে সালামের কথা বলা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। সুতরাং অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এ সালাম দিতে হবে। যাতে ভেতরের লোক এদিকে মনোনিবেশ করেন এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শুনেন। এরপর গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম প্রদান করতে হবে। সেটা ভিন্ন সুন্নাত, যা পরস্পর মুলাকাতের সময় করা হয়। সুতরাং এভাবে বলবেন, "আসসালামু আলাইকুম, আমি অমুক বলছি, আমি কি প্রবেশ করতে পারি?"

এখানে প্রথমে সালাম এবং পরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। তবে আয়াতে পরিচয় প্রদানের গুরুত্বের কারণে তাকে আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে আরো বলা হয়েছে, وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا "যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তখন (হৃষ্টচিত্তে) ফিরে যাবে।" জনৈক বুযুর্গ বলেন, আমি সারাজীবন এ আশায় ছিলাম, আমি কারো কাছে গিয়ে অনুমতি চাইবো আর তিনি আমাকে জাওয়াবে ফিরে যেতে বলবেন, তখন আমি কুরআনের এ আদেশ পালনের সাওয়াব হাসিল করবো। কিন্তু হায় আফসোস! এ নিয়ামত কখনো আমার ভাগ্যে জুটলো না।

অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণ :

অন্ন-বস্ত্রের মত বাসস্থানও মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজন এবং আল্লাহ তা'আলার এক অমূল্য নিয়ামত। এর আসল উদ্দেশ্য হল বিশ্রাম, শান্তি ও বসবাস।

প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে তার একান্ত জীবনটি যাপন করে। এই জীবন যাপন যাতে নির্বিঘ্ন ও নিরুপদ্রব হয় সেজন্য ইসলাম কিছু নীতি ও বিধান দান করেছে, যার চর্চা ও অনুশীলন একটি সভ্য সমাজের জন্য অতি প্রয়োজন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, যা সরাসরি কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে, এ লেখায় শিরোনাম করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া। বিধানটি যে সভ্যতা ও শান্তির এক বড় অনুষঙ্গ তা সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায়।

একে অপরের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে বহু রকমের বিব্রতকর ও বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। যথা-ঘরে কখনো একান্ত ব্যক্তিগত কাজ করা হয় যা অন্য কারো দৃষ্টিগোচর হওয়া ঘরের বাসিন্দার অপছন্দ।

কখনো একান্ত জরুরি কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় খুলে রাখা হয় (বা খুলে যায়)। এ অবস্থায় বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করে ফেললে সে বিব্রত বোধ করে।

আবার কখনো কোনো বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করা হয়। এক্ষেত্রে অকস্মাৎ কেউ এসে পড়লে সে চমকে উঠে; দিল-দেমাগের ওপর চোট পড়ার আশংকা থাকে। এ সমস্যাগুলো কারো একান্ত কক্ষে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের দ্বারা ঘটতে পারে।
তাছাড়া ঘরে-বাড়িতে হঠাৎ কেউ ঢুকে গেলে মাহরাম নয় এমন কোনো পুরুষ বা মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে।

আরেকটি বিষয় হল কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে তো সাক্ষাতদানের জন্য অন্তত মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। আর সাক্ষাতের বাইরে অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে তো কথাই নেই।

মোটকথা অনুমতি ছাড়া কারো বাড়িতে বা ব্যক্তিগত কক্ষে প্রবেশ হতে পারে পর্দা নষ্টের কারণ কিংবা বিরক্তি ও কষ্টের কারণ। তাই অন্যের ঘরে বা কক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নাজায়েয এবং সাধারণ ভদ্রতা ও সুরুচিরও পরিপন্থী।

অনুমতির বিষয়টি কী গুরুত্বপূর্ণ তা এ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিধান দেওয়া হয়েছে এবং রাসূল (স.) সাহাবায়ে কেরামকে তা শুধু মৌখিক ও আমলগতভাবেই শিক্ষা দেননি; বরং এক্ষেত্রে কারো ভুল হলে তৎক্ষণাৎ তাকে সতর্ক করেছেন। এখানে সেসব শিক্ষা-নির্দেশনার মধ্য থেকে জরুরি কিছু বিষয় আলোচনা করা হল, যেগুলো যথাযথ চর্চা ও অনুসরণ করা হলে আমাদের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ হবে আনন্দপূর্ণ ও কল্যাণকর।

অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

“হে মুমিনগণ! নিজ ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না অনুমতি নাও এবং তার অধিবাসীদের সালাম দাও। এ পন্থাই তোমাদের জন্য উত্তম। হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে”।[২২৮]

২২৮. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৭

এখানে দুটো কাজ করা ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। একটি হল ঘরের বাসিন্দার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া আর দ্বিতীয়টি সালাম দেওয়া। হাদীস ও খাইরুল কুরূনের আমল থেকে জানা যায়, উত্তম হল আগন্তুক বাইরে দাঁড়িয়ে আগে সালাম দিবে; তারপর প্রবেশের অনুমতি চাইবে।

কালাদা ইবন হাম্বল (রা.) থেকে বর্ণিত, সাফওয়ান ইবনে উমায়্যাহ (রা.) তাকে দুধ, হরিণের বাচ্চা ও দুগবূস (একপ্রকার শস্য) দিয়ে রাসূল (স.) এর কাছে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু সালাম দেইনি এবং অনুমতিও নেইনি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি বেরিয়ে সালাম দাও; তারপর বল, আমি কি প্রবেশ করব?[২২৯]

অপর এক হাদীসে আছে, আমের গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূল (স.) এর কাছে অনুমতি চাইতে গিয়ে বলল,'আ-আলিজু'। (এ শব্দটি আরবিতে কোনো সংকীর্ণ স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়)। রাসূল (স.) খাদেমকে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দাও। তাকে বল, তুমি সালাম দিয়ে বলবে, 'আ-আদখুলু'- আমি কি প্রবেশ করব? লোকটি বাইরে থেকে তা শুনে সালাম দিয়ে বলল, 'আ-আদখুলু'। তখন রাসূল (স.) তাকে অনুমতি দেন। তারপর সে প্রবেশ করে।[২৩০]

কলিংবেল দেওয়া ও দরজায় নক করা :

যদি মনে হয় সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ ভেতর থেকে শুনবে না, তাহলে কলিংবেল থাকলে সেটা চাপবে অথবা দরজায় নক করবে। তারপর কেউ সামনে এলে সালাম দিয়ে অনুমতি চাইবে।

কলিংবেল দেয়া, দরজায় নক করা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অনেকের মাত্রাজ্ঞানের অভাব থাকে। বারবার বেল চাপতে থাকে বা খুব জোরে দরজায় আওয়াজ করে, যা অনেক সময় ঘরের লোকদের চমকে ওঠার কারণ হয়। বেল চাপার পর অপেক্ষা করা উচিত, তেমনি দরজায় নক করার ক্ষেত্রে এটুকুই যথেষ্ট, যার দ্বারা যথাস্থানে আওয়াজ পৌঁছে।

---

২২৯. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৭১০
২৩০. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫১৭৭

বিশেষত আলেম-বুযুর্গ ও বড়দের কাছে গেলে এ বিষয়ে খেয়াল রাখা খুব জরুরি। দেখুন, রাসূল (স.) এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আদব কেমন ছিল। নবীজীর খাদেম আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) এর দরজায় নখ দ্বারা আওয়াজ করা হত।[২৩১]

এ বস্তুত রাসূল (স.) এর প্রতি তাঁদের উচ্চতর আদব, সম্মান ও মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ।

নাম-পরিচয় উল্লেখ :

কখনো তো সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ থেকেই ঘরের বাসিন্দা অনুমতিপ্রার্থীকে চিনে ফেলে। কিন্তু সবসময় তা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ভেতর থেকে নাম-পরিচয় জানতে চাইলে তা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। কারণ নাম-পরিচয় জানতে চাওয়ার অর্থই হল সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ থেকে আগন্তুককে চেনা যায়নি। আর না চিনলে অনুমতি দিতেও দ্বিধা হয়। এজন্য উত্তম হল সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার সাথেই নাম-পরিচয় বলে দেওয়া।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর (রা.) রাসূল (স.) এর কাছে এসে সালাম দিয়ে বললেন, উমর কি প্রবেশ করবে?[২৩২]

একদিন প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু মূসা আশআরী (রা.) উমর (রা.) এর কাছে এসে সালাম দিয়ে বললেন, এ (আগন্তুক) আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস। জবাব না আসায় দ্বিতীয়বার সালাম দিয়ে বললেন, এ আবু মূসা। এবারও জবাব না আসায় তৃতীয়বার সালাম দিয়ে বললেন, এ আশআরী।[২৩৩]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথমবার তিনি শুধু নাম বলেছেন। কিন্তু জবাব না আসায় এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, ভেতর থেকে হয়তো চিনেনি। তাই দ্বিতীয়বার যে নামে বেশি প্রসিদ্ধ সেটা বললেন- আবু মূসা (উপনাম)। এবারও জবাব না আসায় আরো পরিচয় দেন- আশআরী।

---

২৩১. *আল আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১০৮০
২৩২. ইমাদ আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ আহমাদ*, অনু : অনুবাদকমন্ডলী কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৮), হাদীস নং- ২৭৫৬
২৩৩. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২১৫৪

আমি আমি করা অনুচিত :

ঘরের বাসিন্দার জন্য এক বিরক্তিকর ব্যাপার হয়, যখন আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাওয়ার পরও নাম-পরিচয় না বলে শুধু আমি আমি করে কিংবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আমি করলে বা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে তো প্রশ্নের উত্তর হয় না। যখন সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াযে আগন্তুককে চেনা যায়নি তখন শুধু 'আমি' বললে কীভাবে চিনবে?

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার আব্বার করযের ব্যাপারে আমি রাসূল (স.) এর দরজায় এসে করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? বললাম, আমি। তিনি অসন্তুষ্টির স্বরে বললেন, 'আমি আমি।' (অর্থাৎ জানতে চাওয়া হয়েছে, নাম-পরিচয় আর তুমি বলছ, 'আমি'!)[২৩৪]

দরজায় দাঁড়ানোর নিয়ম :

অনুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একেবারে দরজা বরাবর দাঁড়ানো সমীচীন নয়, বরং ডানে-বামে কিছুটা সরে দাঁড়ানো কর্তব্য। দরজা-জানালা বা অন্য কোনোভাবে ঘরের ভেতর উঁকি দেওয়া তো খুবই আপত্তিকর। উঁকি দিলে বা দরজা বরাবর দাঁড়ালে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কিছুর ওপর দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) যখন কারো দরজায় আসতেন তখন একেবারে দরজা বরাবর দাঁড়াতেন না। বরং ডান দিকে বা বাম দিকে দাঁড়াতেন এবং সালাম দিতেন।[২৩৫]

সালহা ইবন সা'আদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স.) এর কামরায় উঁকি দিল। তাঁর সঙ্গে তখন চিরুনি জাতীয় একটি জিনিস ছিল। তিনি বললেন,

لو أعلم أنك تنظر، لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر-

'আমি যদি জানতাম তুমি দৃষ্টি ফেলবে, তবে এটা দিয়ে তোমার চোখে খোঁচা মারতাম। অনুমতি চাওয়ার বিধান তো দৃষ্টির কারণেই।' অর্থাৎ, যাতে অনাকাক্ষিত কোনো কিছুর ওপর দৃষ্টি না পড়ে যায়।[২৩৬]

অপর এক হাদীসে এসেছে, কোনো মুসলিমের জন্য অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত অন্যের ঘরের ভেতর দৃষ্টি দেওয়া জায়েয নয়। যদি দৃষ্টি দেয়, তবে যেন ঢুকেই পড়ল।[২৩৭]

---

২৩৪. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬২৫০
২৩৫. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫১৮৬
২৩৬. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬২৪১

জবাব না এলে :

একবার অনুমতি চাওয়ার পর ভেতর থেকে কোনো জবাব না এলে দ্বিতীয়বার চাওয়া যাবে। দ্বিতীয়বার না এলে তৃতীয়বারও চাওয়া যাবে। কিন্তু তৃতীয়বার জবাব না এলে ফিরে আসতে হবে। তিনবার অনুমতি চাওয়ায় এটা তো মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, ভেতরে আওয়াজ পৌঁছেছে। কিন্তু ঘরে হয়তো কেউ নেই। অথবা থাকলেও এমন কোনো অবস্থায় আছে যে, অনুমতি দিতে পারছে না (যেমন নামায পড়ছে বা গোসল করছে) অথবা এ মুহূর্তে অনুমতি দেওয়া তার পছন্দ নয় কিন্তু সরাসরি অস্বীকৃতি জানাতে সংকোচবোধ করছে কিংবা খবর পাঠানোর জন্য কাউকে পাচ্ছে না ইত্যাদি।

আর এ সকল অবস্থায় সে মাযূর ও অপারগ। সক্ষমতা-অসক্ষমতা মিলিয়েই মানুষের জীবন। কখনো সে অপারগ হয়, না বাইরে আসতে পারে, না আগন্তুককে ভেতরে ডাকতে পারে। তাই পরস্পরের ওযর-সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে হবে এবং সহজভাবে নিতে হবে। এতে নারাজ হওয়া বা তা অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না।

সুতরাং তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও জবাব না এলে ফিরে আসতে হবে। আর সরাসরি ফিরে যেতে বললে তো কোনো কথাই নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দ্ব্যর্থহীন ইরশাদ-

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَاۤ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ-

তোমরা যদি তাতে কাউকে না পাও, তবু যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়, তাতে প্রবেশ করো না। তোমাদেরকে যদি বলা হয়, ফিরে যাও, তবে ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।[২৩৮]

আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনবার অনুমতি চাওয়া যাবে। মঞ্জুর হলেতো ভালো অন্যথায় ফিরে যাবে।[২৩৯]

---

২৩৭. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৩৫৭
২৩৮. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৮
২৩৯. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২১৫৪

এখানে দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য ও ভারসাম্য লক্ষণীয়। সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বলা হচ্ছে সে যেন যার সাক্ষাতে যায় পুরোপুরি তার সুবিধা-অসুবিধাকে প্রাধান্য দেয়- প্রবেশের আগে অনুমতি তলব করে, তা গৃহীত হলে প্রবেশ করে অন্যথায় খুশি মনে ফিরে আসে ইত্যাদি। অন্যদিকে যার সাক্ষাৎ কাম্য তাকে বলা হচ্ছে, إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

তোমার ওপর তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থীরও কিছু হক আছে।'[২৪০] যেমন তাকে ভেতরে ডাকা বা বাইরে এসে সাক্ষাৎ করা। তার সম্মান করা, কথা শোনা। বিশেষ ওযর ছাড়া অস্বীকৃতি না জানানো। কোনো প্রয়োজনে এলে সামর্থ্য থাকলে তা পূরণের চেষ্টা করা ইত্যাদি।

মাহরামের ঘরে গেলে :

মাহরাম আত্মীয়দের (যাদের পারস্পরিক বিবাহ হারাম) পরস্পরের মধ্যে পর্দার বিধান না থাকলেও একে অপরের 'সতর' দেখা নাজায়েয। আর ব্যক্তিগত কাজ, অবস্থা ও অবস্থান তো প্রত্যেকেরই কমবেশি থাকে। এ কারণে প্রাপ্তবয়স্ক মাহরামদেরও একে অন্যের ঘরে গেলে সর্বদা অনুমতি নেওয়া উচিত। পিতা-মাতা, প্রাপ্তবয়স্ক ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে সকল মাহরামের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য।

তবে সাবালকত্বে পৌঁছেনি এমন শিশুরা যেহেতু সাধারণত ঘরে ছোটাছুটি করে তাই তারা শুধু ঐ সময়গুলোতে অনুমতি নিবে যে সময়গুলোতে বড়রা বিশ্রাম ও একান্তে অবস্থান করে। এছাড়া অন্য সময়ে তাদের অনুমতি নিতে হবে না। বড়দের কর্তব্য নিজেদের বিশ্রাম ও একান্তে অবস্থানের সময়গুলোতে শিশুদের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার শিক্ষা দেওয়া ও উদ্বুদ্ধ করা। যাতে এ সময়গুলোতে তারাও অনুমতি ছাড়া বড়দের ঘরে প্রবেশ না করে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ- وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

২৪০. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৯৭৫

হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনো সাবালকত্বে পৌঁছেনি সে শিশুরা যেন তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে- ফজরের নামাযের আগে, দুপুর বেলা যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এ তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে তোমাদের ও তাদের প্রতি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তো সার্বক্ষণিক যাতায়াত থাকেই। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে তার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের শিশুরা সাবালক হয়ে গেলে যেন অনুমতি গ্রহণ করে, যেমন তাদের আগের বয়ঃপ্রাপ্তরা অনুমতি গ্রহণ করে আসছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২৪১]

এখানে বিশেষ তিনটি সময়ে শিশুদেরকেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশের আদেশ করা হয়েছে। কারণ, এ সময়গুলোতে সাধারণত মানুষ একটু খোলামেলা থাকতে পছন্দ করে। এ অবস্থায় হঠাৎ কেউ উপস্থিত হয়ে গেলে পর্দাহীনতার আশংকা থাকে আর আরাম-বিশ্রামের তো বিঘ্ন ঘটেই। কিন্তু অন্য সময়ে যেহেতু এসব ভয় থাকে না আবার তারা বেশি বেশি যাতায়াতও করে তাই তখন তারা বিনা অনুমতিতেও প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু সাবালকত্বে পৌঁছে যাওয়া ছেলে-মেয়ে এবং বড়দের অনুমতির বিষয়টি এ তিন সময়ে সীমাবদ্ধ না করে তাদেরকে সাধারণভাবে অনুমতি নেওয়ার আদেশ করা হয়েছে।

আলকামা থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি মায়ের কাছে গেলে অনুমতি নিব? বললেন, সব অবস্থায় তোমার তাকে দেখা পছন্দ হবে না।[২৪২]
আতা ইবন আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত, আমি ইবন আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, বোনের কাছে গেলে কি আমি অনুমতি নিব? বললেন, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আমার প্রতিপালনে দুটি বোন আছে, আমি তাদের দেখাশোনা করি এবং তাদের জন্য খরচ করি, তাদের কাছে গেলেও কি আমার অনুমতি নিতে হবে? বললেন, হ্যাঁ। তোমার কি তাদেরকে বিবস্ত্র দেখা পছন্দ হবে? এরপর তিনি সূরা নূরের ৫৮ ও ৫৯ নং আয়াত পাঠ করে বলেন, সকলের জন্য অনুমতি নেওয়া জরুরি।

---

২৪১. *আল কুরআন*, ২৪ : ৫৮-৫৯
২৪২. *আল আদাবুল মুফরাদ*, *প্রাগুপ্ত*, বর্ণনা- ১০৫৯

মহিলা মহিলার ঘরে গেলে :

অন্য অনেক বিধানের মত এই বিধানও নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য। পুরুষ পুরুষের বা মহিলার ঘরে গেলে যেমন অনুমতি নিতে হবে, তেমনি মহিলা যদি পুরুষের বা মহিলার ঘরে যায় তাকেও অনুমতি নিতে হবে।

ডেকে পাঠালে :

কখনো খাদেম বা অন্য কারো মাধ্যমে কাউকে ডাকা হয়। এক্ষেত্রে দূতের সাথে এলে কিংবা দেরি না হলে অনুমতি নিতে হবে না। ডেকে পাঠানোই অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু দেরিতে এলে অনুমতি নিতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, কারো কাছে দূতের আগমন তার জন্য অনুমতি গণ্য হবে।[২৪৩]

পাবলিক নিবাস হলে :

এ পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের ঘরে প্রবেশের আদব আলোচিত হয়েছে যে, এতে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া জরুরি। কিন্তু অনেক ঘর আছে, যা ব্যক্তি বিশেষের বাসস্থান নয়, বরং সাধারণভাবে তা যে কারো ব্যবহার করার অনুমতি আছে। যেমন : গণ-মুসাফিরখানা, হাসপাতাল, ডাকঘর, পার্ক, মসজিদ, মাদরাসা ইত্যাদি। এধরনের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। একইভাবে ব্যক্তিবিশেষের ঘরেও কোনো সময়ে নির্দিষ্ট কারো কিংবা সবার উন্মুক্ত সাক্ষাতের অনুমতি থাকলে সে সময়ে প্রবেশ করতে অনুমতি নিতে হবে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ-

যে ঘরে কেউ বাস করে না এবং তা দ্বারা তোমাদের উপকার গ্রহণের অধিকার আছে, তাতে তোমাদের প্রবেশে কোনো গোনাহ নেই। তোমরা যা প্রকাশ্যে কর এবং যা গোপনে কর আল্লাহ তা জানেন।[২৪৪]

যয়নব সাকাফী (রা.) (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী) বলেন, আবদুল্লাহ যখন কোনো প্রয়োজন সেরে দরজায় এসে পৌঁছতেন তখন গলা খাঁকারি দিতেন এবং থুথু ফেলতেন। যাতে অকস্মাৎ আমাদেরকে এমন কোনো অবস্থায় দেখে না ফেলেন যা তার খারাপ লাগবে।[২৪৫]

---

২৪৩. *সুনানে আবু দাউদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫১৮৯

২৪৪. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৯

২৪৫. আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (রহ.), *তাফসীরে তাবারী*, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বধানে অনূদিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-১৯৯৩), ১৭/২৪৫

অনুমতি গ্রহণের আদবসমূহ

ইসলাম মানুষকে অনন্য শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে নানা নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে। তেমনি কারো বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।’[২৪৬]

অন্যের বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের কিছু আদব রয়েছে। সেগুলো মেনে চললে সমাজ সুন্দর হয়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়। আর ঐ আদবগুলো না মানলে সমাজ হয় বিশৃঙ্খল। নিম্নে অনুমতি গ্রহণের আদবগুলো উল্লেখ করা হ’ল।

১. অনুমতি গ্রহণের প্রাক্কালে সালাম দেওয়া :

অনুমতি গ্রহণের পূর্বেই সালাম দেওয়া সুন্নাত। যদি কেউ জবাব না দেয়, তাহ’লে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার অনুরূপ বলবে। তারপরও যদি কেউ উত্তর না দেয়, তাহ’লে ফিরে আসবে।

হাদীসে এসেছে, কালাদাহ ইবনু হাম্বাল (রহ.) হতে বর্ণিত,

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى مَكَّةَ فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. وَذَاكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ-

‘একদা ছাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ (রা.) কে কিছু দুধ, একটি হরিণ ছানা ও কিছু শসাসহ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। তখন নবী করীম (স.) মক্কার উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। (ছাফওয়ান বলেন) আমি সালাম না দিয়েই তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং ‘আসসালামু আলাইকুম’ বল। এটা ছিল ছাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর’।[২৪৭]

---

২৪৬. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৭

২৪৭. *সুনানে আবু দাউদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫১৭৬

অন্যত্র রাসূল (স.) বলেন, لاَ تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ 'যে প্রথমে সালাম না দেয়, তোমরা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না'।[২৪৮]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রিবঈ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ. فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ-

'বনী আমিরের এক লোক আমাকে বলল, সে নবী করীম (স.) এর এক ঘরে অবস্থানকালে তাঁর নিকটে প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে বলল, আমি কি আসবো? নবী করীম (স.) তখন তাঁর খাদেমকে বললেন, তুমি বের হয়ে তার নিকটে গিয়ে তাকে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিখিয়ে দাও। তুমি তাকে বল যে, তুমি বল, 'আসসালামু আলাইকুম' আমি কি ভিতরে আসতে পারি?' লোকটি একথা শুনে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম' আমি কি ভিতরে আসতে পারি?' নবী করীম (স.) তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে ভিতরে প্রবেশ করল'।[২৪৯]

এ হাদীস দ্বারা অনুমতি গ্রহণের শিষ্টাচার সহজেই অনুমতি হয়। সুতরাং অনুমতির জন্য কলিংবেল বাজালেও, সেই সাথে মুখে সালাম বলা উচিত।

২. তিনবার অনুমতি চাওয়া :

কারো বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে তিনবার অনুমতি চাওয়া প্রয়োজন। এরপরও অনুমতি না মিললে ফিরে আসতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ 'তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায়। কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়'।[২৫০]

---

২৪৮. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), *সিলসিলাহ সহীহাহ*, হাফেয মুফতি মোবারক সালমান (আতিফা পাবলিকেশন, প্রকাশকাল- তা.বি.), হাদীস নং ৮১৭।

২৪৯. *সুনানে আবু দাউদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫১৭৭

২৫০. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৩১৮

অন্য হাদীসে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আনছারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবূ মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন, আমি তিনবার ওমর (রা.)-এর নিকটে অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল না। তাই আমি ফিরে আসলাম। ওমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল না। তাই আমি ফিরে আসলাম। (কারণ) রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়া না হয়, তবে সে যেন ফিরে যায়'। তখন ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই দলীল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি যিনি নবী করীম (স.) থেকে এ হাদীস শুনেছে? তখন উবাই ইবনু কা'ব (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমি দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নবী করীম (স.) অবশ্যই এ কথা বলেছেন'।[২৫১]

উল্লেখ্য, তিন বার অনুমতি চাওয়ার কারণ হলো প্রথমবার শ্রবণের, দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি গ্রহণের এবং তৃতীয়বার অনুমতি প্রদানের জন্য। আর তিন বারের অধিক অনুমতি চাওয়া সমীচীন নয়। আবুল আলানিয়া (রহ.) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এর বাড়িতে এসে সালাম দিলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি পুনরায় সালাম দিলাম, কিন্তু অনুমতি প্রাপ্ত হলাম না। আমি তৃতীয়বার উচ্চৈস্বরে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দার। এবারও আমি অনুমতি প্রাপ্ত হলাম না। অতএব আমি একপাশে সরে গিয়ে বসে থাকলাম। আমার নিকটে একটি গোলাম বের হয়ে এসে বলল, প্রবেশ করুন। আমি প্রবেশ করলে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) আমাকে বলেন, তুমি আরো অধিকবার অনুমতি প্রার্থনা করলে তোমাকে অনুমতি দেয়া হত না'।[২৫২]

৩. অনুমতি গ্রহণকারীর পরিচয় পেশ করা :

অনুমতি গ্রহণের সময় অনুমতি প্রার্থীর জন্য খুবই জরুরী হল নিজের পরিচয় পেশ করা। হাদীসে এসেছে, জাবির (রা.) বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا

২৫১. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৬২৪৫
২৫২. *আল আদাবুল মুফরাদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১০৭৭

‘আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল, এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমি নবী করীম (স.) এর কাছে আসলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন, আমি আমি, যেন তিনি তা অপছন্দ করলেন’।[২৫৩]

অন্যত্র এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রহ.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَبُوْ مُوْسَى يَقْرَأُ فَقَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا بُرَيْدَةُ جَعَلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: قَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ-

‘নবী করীম (স.) মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন আবু মূসা (রা.) কুরআন পড়ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি বুরায়দা, আপনার জন্য উৎসর্গপ্রাণ। তিনি বললেন, তাকে দাউদ (আ.) পরিবারের সুমধুর কণ্ঠস্বর থেকে একটি কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে’।[২৫৪]

অন্যত্র এসেছে, উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব (রা.) বলেন,

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِى طَالِبٍ. فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ-

‘আমি ফতেহ মক্কার বছর আল্লাহর রাসূল (স.) এর নিকটে গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন। আর তাঁর মেয়ে ফাতিমাহ (রা.) তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব। তিনি বললেন, মারহাবা, হে উম্মু হানী’।[২৫৫]

৪. জোরে জোরে দরজা খটখট না করা :

কারো বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি গ্রহণকালে খুব জোরে দরজা ধাক্কানো বা বিকটভাবে কড়া নাড়া যাবে না। কারণ এতে গৃহের অভ্যন্তরের লোকদের অসুবিধা হতে পারে। কেউ ঘুমন্ত থাকলে তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে। রোগী থাকলে তার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটবে। শিশুরা থাকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। আনাস (রা.) বলেন,

أَنَّ أَبْوَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقْرَعُ بِالأَظَافِيرِ ‘নবী করীম (স.) এর দরজায় নখ দ্বারা (হালকাভাবে) আঘাত করা হত’।[২৫৬]

---

২৫৩. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২১৫৫
২৫৪. *আল আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৮০৫
২৫৫. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৩৫৭
২৫৬. আল-আদাবুল মুফরাদ, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১০৮০

৫. অনুমতি গ্রহণের সময় দরজা বরাবর না দাঁড়ানো :

অনুমতি গ্রহণের সময় দরজা বরাবর দাঁড়ানো যাবে না। বরং ডান বা বাম দিকে সরে দাঁড়াবে। যাতে তার দৃষ্টিতে এমন কিছু না পড়ে যা তার জন্য দেখা বৈধ নয়। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ الدُّوْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُوْرٌ-

‘রাসূলুল্লাহ (ছস.) কোন কওমের নিকটে এলে সরাসরি দরজায় মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং দরজার ডান অথবা বাম পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলতেন, আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। কারণ সে যুগে দরজায় পর্দা টানানো থাকতো না’।[২৫৭]

বর্তমান যুগে দরজায় পর্দা থাকলেও পর্দা সরে গেলে ভিতরের অনেক কিছু দৃষ্টিগোচর হতে পারে, যা দেখা আগন্তুকের জন্য বৈধ নয়। এজন্য দরজা বরাবর না দাঁড়িয়ে এক পাশে দাঁড়ানো উচিত।

৬. অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা :

বাড়ীর মালিক, খাদেম বা বাড়ীর অন্য কোন জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অনুমতির অপেক্ষা করা। যারা বাড়ীর অবস্থা সম্পর্কে জানে। অনুমতির ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার কথায় গুরুত্ব না দেওয়া। কেননা তারা অনেক সময় আগন্তুককে ভিতরে প্রবেশের জন্য আহবান জানায়, অথচ অভ্যন্তরের পরিবেশ সে জানে না বা বোঝে না। তখন অনুমতি প্রার্থী বা আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করে কোন বিব্রতকর পরিস্থির মুখোমুখি হতে পারে কিংবা তার দৃষ্টি গোচর হতে পারে এমন কোন জিনিস যা তার জন্য দেখা বৈধ নয়।

৭. বিনা অনুমতিতে অন্যের বাড়ী বা গৃহের অভ্যন্তরে না তাকানো :

বাড়ীর মালিকের অনুমতি ছাড়া বাড়ীর ভিতরে তাকানো নিষেধ। সাহল ইবনে সা‘দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ، ‘দৃষ্টির কারণেই (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে’।[২৫৮]

---

২৫৭. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫১৮৬
২৫৮. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৬২৪১

অর্থাৎ দৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ। কারো বাড়ীর ভিতরে তাকালে বাড়ীর মহিলাদের অজ্ঞাতে তাদের দেখা হয়ে যেতে পারে। যাতে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। আর এভাবে কেউ তাকালে বাড়ীর লোকেরা বুঝতে পেরে ঐ লোকের চোখ ফুড়ে দিলে তাদের উপরে কোন দোষ বর্তাবে না। নবী করীম (স.) বলেন,

مَنِ اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَهُ 'যে ব্যক্তি কোন কওমের ঘরে তাদের অনুমিত ব্যতিরেকে উঁকি-ঝুঁকি মারে, তাহলে তার চোখ ফুড়ে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ'।[২৫৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

'কোন ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে তোমার প্রতি উঁকি-ঝুঁকি মারে, আর তুমি তাকে কংকর মেরে তার চোখ ফুঁড়ে দাও, তাহলে তোমার কোন দোষ নেই'।[২৬০]

সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِىْ دَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِىْ عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبْصَارِ-

'এক ব্যক্তি নবী করীম (স.)-এর ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। নবী করীম (স.) তখন লোহার একটি চিরুনী দিয়ে তাঁর মাথা আচড়াচ্ছিলেন। তখন তিনি তাকে দেখে বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, তুমি (উঁকি মেরে) আমাকে দেখছ, তাহলে আমি এই চিরুনী দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। দৃষ্টির কারণেই তো (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে'।[২৬১]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ. 'যে ব্যক্তি কোন গোত্রের গৃহে তাদের বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে এবং তারা দেখতে পেয়ে তার চক্ষু ফুটিয়ে দেয়, তবে তাতে কোন রক্তপণ (দিয়াত) বা অনুরূপ বদলা (ক্বিছাছ) নেই'।[২৬২]

---

২৫৯. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২১৫৮
২৬০. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৬৮৮৮
২৬১. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২৮৬৪
২৬২. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৬০৪৬

অতএব কারো গোপনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। সুতরাং দরজা, জানালা, দেওয়ালের ছিদ্র, বাড়ীর ছাদ থেকে সরাসরি কিংবা দুর্বিন বা দূরদর্শন যন্ত্রের সাহায্যে অন্যের বাড়ীর অভ্যন্তরে তাকানো বৈধ নয়। এরূপ কেউ করলে সে পাপী হবে।

৮. দৃষ্টি অবনমিত রাখা :

অন্যের বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের পর এদিক-সেদিক তাকানো হতে বিরত থাকবে এবং দৃষ্টি অবনত রাখবে। যাতে এমন কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিপতিত না হয় যা তার জন্য দেখা বৈধ নয়।

৯. অনুমতি দেওয়া না হ'লে ফিরে আসা :

প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার পর অনুমতি না দিলে ফিরে আসবে।

আল্লাহ বলেন, وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ، 'আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও! তাহলে তোমরা ফিরে এসো। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।[২৬৩]

অনুমতি না পেলে মন খারাপ করা উচিত নয়। কারণ বাড়ীর মালিকের বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে। যেমন ঘুমানো, যদিও সেটা অসময় হয়; ছায়েম থাকতে পারে, বাড়ীতে আগত মেহমানদের সাথে বিশেষ বৈঠক, পারিবারিক তা'লীম, অসুস্থ-রোগী কিংবা পারিবারিক বিশেষ কোন বৈঠক থাকতে পারে। সুতরাং যে কারণেই হোক অনুমতি না দিলে ফিরে আসাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে অনুমতি না দেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা বা মনে কষ্ট নেওয়া উচিত নয়।

১০. বাসিন্দা বিহীন বাড়ী বা ঘরে প্রবেশে অনুমতি নিষ্প্রয়োজন :

যে বাড়ীতে বা গৃহে কেউ বসবাস করে না, সেখানে প্রয়োজন থাকলে প্রবেশ করা যাবে। এক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ، 'যে গৃহে কেউ বসবাস করে না। সেখানে তোমাদের মাল-সম্পদ থাকলে তাতে প্রবেশে তোমাদের কোন দোষ নেই। বস্তুত আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।[২৬৪]

---

২৬৩. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৮
২৬৪. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৯

১১. কাউকে ডাকার জন্য লোক পাঠানো হ'লে অনুমতি নিষ্প্রয়োজন :

কাউকে ডাকার জন্য লোক পাঠানো হ'লে এবং সে ঐ লোকের সাথে আসলে তার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

রাসূল (স.) বলেন, 'رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ' 'কোন ব্যক্তিকে ডেকে আনার জন্য কোন লোক পাঠালে তা তার অনুমতি হিসাবে ধর্তব্য'।[২৬৫]

তিনি আরো বলেন, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ. 'যখন তোমাদের কেউ পানাহারের জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং সে আমন্ত্রণকারীর প্রতিনিধির সঙ্গে আসে, তবে তার জন্য এটাই অনুমতি'।[২৬৬]

ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন, إِذَا دُعِيْتَ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ 'যখন তোমাকে ডাকা হয়, সেটাই তোমার জন্য অনুমতি'।[২৬৭]

১২. মাহরাম মহিলাদের নিকটে প্রবেশকালে অনুমতি নেওয়া :

মাহরাম মহিলা অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম, তাদের নিকটে প্রবেশকালেও অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ মা, বোন, মেয়ে, নানী, দাদী, খালা, ফুফু ও অনুরূপ মহিলাদের নিকটে তাদের বিশ্রাম স্থলে প্রবেশের সময় অনুমতি নিতে হবে। অন্যথা এমন অবস্থায় তাদের দেখা হয়ে যাবে যে অবস্থায় দেখা উচিত নয়। অনুরূপভাবে মহিলারাও মাহরাম পুরুষের নিকটে প্রবেশের সময় অনুমতি নিবে। যাতে তারা কোন বিব্রতকর পরিস্থির শিকার না হয়।

আলকামা (রহ.) বলেন,

قال جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله أَأستأذن عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تحب أن تراها

'এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি আমার মায়ের নিকটে প্রবেশ করতেও অনুমতি চাইব? তিনি বলেন, প্রতিটি মুহূর্তে তুমি তাকে দেখতে পছন্দ করবে না'।[২৬৮]

২৬৫. *সুনানে আবু দাউদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫১৮৯
২৬৬. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫৪৩
২৬৭. *আল আদাবুল মুফরাদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১০৭৪
২৬৮. *আল আদাবুল মুফরাদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১০৫৯-৬০

ছা'লাবা ইবনে আবু মালেক আল-কুরাযী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি 'পর্দার তিন সময়' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য জন্তুযানে আরোহণ করে বনু হারিছা ইবনুল হারিছ-এর সদস্য আব্দুল্লাহ ইবনে সুয়াইদ (রা.)-এর নিকটে গেলেন। কারণ তিনি এই তিন সময়ের নিয়ম মেনে চলতেন। তিনি বলেন, তুমি কি জানতে চাও? আমি বললাম, আমি ঐ তিন সময়ের বিধান মেনে চলতে চাই। তিনি বলেন, দুপুরের সময় যখন আমি আমার পোশাকাদি খুলে রাখি তখন আমার পরিবারের কোন বালেগ সদস্য আমার অনুমতি ব্যতীত আমার নিকট প্রবেশ করতে পারে না।

অবশ্য আমি যদি তাকে ডাকি, তবে এটাও তার জন্য অনুমতি। আর যখন ফজরের ওয়াক্ত হয় এবং লোকজনকে চেনা যায়, তখন থেকে ফজরের ছালাত পড়া পর্যন্ত সময়ও কেউ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারে না। আর আমি এশার ছালাত পড়ার পর পোশাক খুলে রেখে ঘুমানো পর্যন্ত অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করে না।[২৬৯]

মায়ের গৃহে প্রবেশের ন্যায় বোনের নিকটে প্রবেশকালেও অনুমতি নিতে হবে। আতা (রহ.) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার বোনের নিকটেও প্রবেশানুতি প্রার্থনা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, আমার প্রতিপালনাধীনে আমার দু'টি বোন আছে, আমিই তাদের পৃষ্ঠপোষক নিরাপত্তা দানকারী এবং আমিই তাদের ভরণ-পোষণ করি, আমি কি তাদের নিকটেও প্রবেশানুমতি চাইব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ দেখতে পছন্দ করবে?

অতঃপর তিনি পড়েন 'হে মুমিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে আসতে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের ছালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন বিশ্রামের জন্য তোমরা কাপড় খুলে রাখ এবং এশার ছালাতের পর। এ তিনটি সময় তোমাদের জন্য পর্দার।[২৭০]

ইবনে আববাস (রা.) বলেন, পর্দার এই তিন সময়ই তাদেরকে অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে পূর্ববর্তীদের ন্যায়।[২৭১]

---

২৬৯. *আল আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১০৫৯
২৭০. *আল কুরআন*, ২৪ : ৫৮
২৭১. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫১৯২

১৩. শিশুদের অনুমতি গ্রহণ :

শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তাদেরকেও বাড়ী-ঘরে প্রবেশকালে এবং পিতা-মাতা ও বোন, ফুফু-খালার ঘরে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে।

আল্লাহর বাণী, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 'আর তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে পূর্ববর্তীদের ন্যায়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[২৭২]

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তার কোন সন্তান বালেগ হলেই তিনি তাঁকে পৃথক (বিছানা) করে দিতেন। সে অনুমতি ব্যতীত তার নিকটে প্রবেশ করতে পারতো না।[২৭৩]

১৪. বাড়ীতে বা গৃহে কেউ না থাকলে সেখানে প্রবেশ না করা :

কোন বাড়ীতে বা গৃহে যদি কেউ না থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে প্রবেশ না করা উত্তম। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ 'যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহ'লে সেখানে প্রবেশ করো না তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত'।[২৭৪]

অনুমতি ব্যতীত কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা অনুচিত। কারণ এতে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যা তৈরী হয়। যেমন হয়তো সে বাড়ীতে চুরি হ'ল। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে সন্দেহ ঐ ব্যক্তির দিকে যেতে পারে। অথবা বাড়ীতে ঘুমন্ত কেউ রয়েছে, যাকে দেখা প্রবেশকারীর জন্য বৈধ নয়। তাই অনুমতি প্রদানের মত কেউ না থাকলে ফিরে আসা যরূরী।

১৫. বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে স্ত্রীকে সতর্ক করা :

বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে সালাম প্রদান ও অন্য শারঈ কোন যিকর বা অন্য কোন আওয়াযের মাধ্যমে স্ত্রীকে সতর্ক করা, যাতে স্বামী বাড়ীতে প্রবেশ করে তাকে এমন কোন অবস্থায় না দেখে, যে কারণে স্বামীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিংবা সে অসন্তুষ্ট হয়। আর এর পরিণতি হয় ভয়াবহ। শয়তান সর্বদা মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে। তাই মনে সন্দেহের কোন অবকাশ যেন না থাকে তার ব্যবস্থা করা।

---

২৭২. *আল কুরআন*, ২৪ : ৫৯
২৭৩. *আল আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং-১০৬৮
২৭৪. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৮

১৬. তাসবীহ বলা বা হাতে হাত মারার মাধ্যমে অনুমতি প্রদান :

কোন সময় কোন বাড়ীতে কেউ অনুমতির জন্য করাঘাত করল, অথচ বাড়ীর মালিক তখন ছালাতে দন্ডায়মান তখন মালিক 'সুবহানাল্লাহ' বলে আওয়াজ করবে, এটাই তার অনুমতি। অথবা বাড়ীতে মহিলা ছালাতে দন্ডায়মান থাকলে সে হাতে হাত মেরে আওয়াজ করবে, এটাই আগন্তুকের জন্য অনুমতি।

রাসূল (স.) বলেন,

إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذْنُهُ التَّسْبِيْحُ وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فَإِذْنُها التَّصْفِيْقُ، 'যখন ছালাতে দন্ডায়মান কোন পুরুষের নিকটে অনুমতি চাওয়া হয়, তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলা তার অনুমতি। আর যদি ছালাতে দন্ডায়মান কোন মহিলার নিকটে অনুমতি চাওয়া হয়, তখন হাতে হাত মেরে আওয়াজ করা তার অনুমতি'।[২৭৫]

১৭. অনুমতি প্রার্থীকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা :

বাড়ীর মালিক কোন সমস্যা থাকলে বা ব্যবস্ততার কারণে স্পষ্ট ভাষায় কিংবা অস্পষ্ট ভাষায় অনুমতি প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক বা গৃহকর্তা কোন কারণ দর্শাতে বাধ্য নয়। আবার অনুমতি প্রার্থীকেও মালিকের অসুবিধা বা অপারগতার বিষয়টি খুটে খুটে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়।

১৮. বাড়ী বা গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় অনুমতি নেওয়া :

কারো বাড়ীতে গেলে তার অনুমতি ব্যতীত সে বাড়ী থেকে বের হওয়া যাবে না।

রাসূল (স.) বলেন, إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ فَلاَ يَقُوْمَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ،

'তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়, অতঃপর তার পাশে বসে। সে যেন তার (বাড়ীর মালিকের) অনুমতি ব্যতীত বের না হয়'।[২৭৬]

বাড়ীতে প্রবেশে যেমন অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন তেমনি বের হওয়ার সময়ও অনুমতি নিয়ে বের হতে হবে। যাতে অপ্রীতিকর কোন কিছু দৃষ্টিগোচর না হয়।

---

২৭৫. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৩২০

২৭৬. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫৮৩

১৯. জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি চাওয়া :

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল করা যায়, বহিঃশত্রু দমন করা যায় এবং অশেষ ছওয়াব হাছিল করা যায়। তবে কারো যদি পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ই বেঁচে থাকে তাহলে তাদের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে গমন বৈধ নয়। যেমনভাবে দেশের শাসক বা প্রধানের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে গমন করা বৈধ নয়। 'মু'আবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সুলামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)!

আল্লাহর সন্তোষ লাভের এবং আখেরাতে জান্নাত প্রাপ্তির আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ফিরে গিয়ে তার সেবা-যত্ন করো। এরপর আমি অপর পাশ থেকে তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হ্যাঁ।

তিনি বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তার সেবা-যত্ন কর। এরপর আমি তাঁর সম্মুখভাগে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তার পায়ের কাছে পড়ে থাক, সেখানেই জান্নাত'।[২৭৭]

অতএব কারো বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচারসমূহ মেনে চলা জরুরী। এর ফলে সমাজে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করবে এবং সেখান থেকে নানা অনাচার-দুরাচার দূরীভূত হবে। সেই সাথে এগুলি পালনের মাধ্যমে অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে।

---

২৭৭. *সুনানে ইবনে মাজাহ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২৭৮১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিথ্যা অপবাদ ইসলামে জঘন্যতম অপরাধ

অপবাদ সামাজিক সুস্থতাকে বিনষ্ট করে। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য হিসেবে তুলে ধরে। অপবাদ মানুষকে কোনো কারণ ছাড়াই অপরাধী হিসেবে তুলে ধরে এবং সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে বায়াত (আনুগত্যের শপথ) করতে এসে ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোনো মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং ঘোষিত ন্যায্য বিষয়ে তোমার নির্দেশ অমান্য করবে না, তখন তাদর বায়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৭৮]

স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে, অন্যের কান কথায় প্ররোচিত হয়ে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া জঘন্য অপরাধ। কারো সম্মানহানি করার অধিকার অন্যের নেই। ইসলামে মিথ্যা দোষারোপের সুযোগ নেই। এটা ঘৃণিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক।[২৭৯]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।[২৮০]

অপরদিকে ফেরাউন সমপ্রদায় তার দাওয়াতকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে হীন কুট-কৌশল অবলম্বন করেছিল। তারা স্বয়ং দাঈর ব্যক্তিগত বিষয়ে বিভিন্ন অপবাদের আশ্রয় নেয়। তাদের দৃষ্টিতে মূসা (আ.) একজন যাদুকর, বদ্ধপাগল, যাদুগ্রস্থ, পূর্বতন ধর্মের বিকৃতকারী ও নব্য ধর্মের প্রবর্তক। মূলতঃ সাধারণ মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখতে এবং তার দাওয়াতকে বিফল করতে তারা এ ধরণের কুট-কৌশলের পায়তারা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূসা (আ.) তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন এবং তাদের মনগড়া মতাদর্শ পরাজিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরষের যোগ্য আর চরিত্রহীন পুরষ চরিত্রহীনা নারীর যোগ্য।

চরিত্রবতী নারী চরিত্রবান পুরষের যোগ্য আর চরিত্রবান পুরষ চরিত্রবতী নারীর যোগ্য। কোন মিথ্যা অপবাদই চরিত্রবানদের কলঙ্কিত করতে পারে না। এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবনোপকরণ।[২৮১]

---

২৭৮. *আল কুরআন*, ৬০ : ১২
২৭৯. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১২
২৮০. *আল কুরআন*, ২২ : ২৩

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, মুনাফেক, রুগ্নমনা ও মিথ্যা গুজব রটনাকারীরা শহরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত না হলে আমি ওদের ওপর তোমাকে কর্তৃত্ব দান করব। তারপর হে নবী! খুব অল্প সময়ই ওরা এ নগরে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে। অভিশপ্ত অবস্থায় ওদের যেখানে পাওয়া যাবে, পাকড়াও ও বিনাশ করা হবে।[২৮২]

অপবাদ দেওয়ার প্রবণতা এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের সুসম্পর্কে চিড় ধরায়। সামাজিক ও জাতীয় ঐক্যের জন্যও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে এ ধরনের প্রবণতা। যে কারণে ইসলামে অপবাদ দেওয়ার প্রবণতাকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিতে অপর মুসলমানকে অপবাদ দেওয়া কবিরা গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।[২৮৩]

রাসূল (সা.) আরও বলেন, ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে অনুদারতা উঠিয়ে দিয়েছেন। তবে যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের ইয্যত সম্মান নিয়ে যাচ্ছেতাই করে, তার ব্যাপার স্বতন্ত্র। সে অনুদারতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বর্ণনা করেন-এক মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানের রক্ত ঝরানো, সম্পদ ও সম্ভ্রমহানি করা হারাম।[২৮৪]

রাসূল (স.) আরো বলেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। কেউ কারও প্রতি অত্যাচার চালায় না, একজন আরেকজনকে অসম্মান, অশ্রদ্ধা করে না। কোনো মুসলমানের জন্য এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর নেই, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করবে।[২৮৫]

ইসলামে দোষারোপ করা তো দূরের কথা, কারো সম্পর্কে কিছু প্রমাণ ছাড়া বলতেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মিথ্যা অপবাদে মানুষের সম্মানহানি ঘটে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, মুমিনদের প্রতি তোমরা ভালো ধারণা পোষণ করবে। অনুমান করেও কিছু বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।[২৮৬]

---

২৮১. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৮৫
২৮২. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৬
২৮৩. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৬১
২৮৪. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৮
২৮৫. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৪৬৫০
২৮৬. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৪৬৫০

কাউকে কোনো অপরাধে লিপ্ত দেখলে তাকে বিচারকের নিকট সোপর্দ করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আত্মপক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কেউ শাস্তি দিতে পারেন না। এ প্রক্রিয়ার বাইরে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান বিচারপতিও কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না। উমর (রা.) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফকে (রা.) বলেন, আপনি শাসক থাকা অবস্থায় যদি কাউকে ব্যভিচারের অপরাধে বা চুরির অপরাধরত দেখতে পান, তাহলে তার বিচারের বিধান কী? (নিজের দেখাতেই কি বিচার করতে পারবেন?) আব্দুর রাহমান (রা.) বলেন, "আপনার সাক্ষ্যও একজন সাধারণ মুসলিমের সাক্ষ্যের সমান"। উমর (রা.)বলেন, "আপনি সঠিক বলেছেন"।

অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান নিজের হাতে বিচার তুলে নিতে পারবেন না। এমনকি তার সাক্ষ্যেরও অতিরিক্ত কোনো মূল্য নেই। রাষ্ট্রপ্রধানের একার সাক্ষ্যে কোনো বিচার হবে না। বিধিমোতাবেক দুইজন বা চারজন সাক্ষীর কমে বিচারক কারো বিচার করতে পারবেন না।

ইসলাম অপবাদ রটনাকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'কোন পূতচরিত্রা নারীর বিরদ্ধে কেউ (ব্যভিচারের) অপবাদ দিয়ে যদি চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে অপবাদ রটনাকারীকে শাস্তি হিসেবে ৮০ বেত মারবে। আর কোনদিন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরা সত্যত্যাগী।[২৮৭]

তাই কারো সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমাদের সর্তক থাকা উচিত। অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে কষ্ট দেয়া বা সম্মানহানিকর পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকা ইসলামের অপরিহার্য দাবি।
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 'যারা চরিত্রহীনতার মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তা তোমাদেরই একটি দল।(কিন্তু এ অপবাদে যাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে) তারা যেন নিজেদের জন্যে বিষয়টিকে ক্ষতিকর মনে না করে। বরং এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। (অপবাদ রটনাকারী) প্রত্যেককেই এ পাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এদের মধ্যে যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন আযাব।[২৮৮]

২৮৭. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১২
২৮৮. *আল কুরআন*, ২৪ : ৪

ইসলামে কাউকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি

মিথ্যা বলা পাপ। মিথ্যার সর্বোচ্চ পর্যায় হলো কারো ওপর অপবাদ দেওয়া। যে অপরাধ বা দোষ কারো ভেতর নেই, এমন অপরাধ বা দোষ তার জন্য সাব্যস্ত করাকে অপবাদ বলা হয়।

অপবাদ কখনো কখনো কুফরি পর্যন্ত নিয়ে যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া কুফরি। পবিত্র কুরআনে মূর্তি পূজার সঙ্গে মিথ্যা সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, 'সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থেকো মিথ্যা কথা থেকে।'[২৮৯]

অপবাদ দেওয়া হয় ব্যক্তিগত শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে। অপবাদের মাধ্যমে সাময়িক নির্দোষ ব্যক্তির চরিত্রে কালিমা লেপন করা হলেও এর পরিণতি ভয়াবহ। সচ্চরিত্রবান নারীদের ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া কঠিন অপরাধ।

মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা সচ্চরিত্রবান সরলমনা মুমিন নারীদের ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য (আখিরাতে) আছে মহা শাস্তি।'[২৯০]

যারা কোনো সৎ ও নির্দোষ নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় তাদের অবশ্যই চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হবে। চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে না পারলে প্রত্যেককে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হবে, কারো ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং তখন থেকে তাদের পরিচয় হবে ফাসিক।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা সৎ নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিল, অথচ চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে তা প্রমাণিত করতে পারেনি তাহলে তোমরা ওদের ৮০ বেত্রাঘাত করো, কারো ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য আর কখনো গ্রহণ কোরো না এবং তারাই তো সত্যিকার ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয় (তারা সত্যিই অপরাধমুক্ত)। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[২৯১]

---

২৮৯. *আল কুরআন*, ২৪ : ১১
২৯০. *আল কুরআন*, ২২ : ৩০
২৯১. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৩

মহান আল্লাহ ব্যভিচারের অপবাদকে গুরতর অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। বর্ণিত হয়েছে, ‘তোমরা ব্যাপারটিকে তুচ্ছ মনে করছ; অথচ তা আল্লাহর কাছে খুবই গুরতর অপরাধ।’[২৯২]

অপবাদ দুই ধরনের। এক. যে অপবাদে ইসলামে নির্দিষ্ট পরিমাণের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যেমন- ব্যভিচারের প্রাকাশ্য অপবাদ অথবা কারো বংশীয় পরিচয় অস্বীকার করা।

দুই. যে অপবাদে ইসলামে নির্দিষ্ট পরিমাণের কোনো শাস্তি নেই। এমন অপবাদের ক্ষেত্রে অপবাদকারীকে শিক্ষামূলক কিছু শাস্তি অবশ্যই দেওয়া হবে। তবে যে যে কারণে অপবাদকারীকে বেত্রাঘাত করতে হয় না, সেগুলো চার ধরনের অপবাদ। যেমন :

১. যাকে অপবাদ দেওয়া হলো সে অপবাদকারীকে ক্ষমা করে দিলে।

২. যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে অপবাদকারীর অপবাদকে স্বীকার করলে।

৩. অপবাদকারী অপবাদের সত্যতার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দাঁড় করালে।

৪. পুরুষ নিজ স্ত্রীকে অপবাদ দিয়ে নিজেকে লানত করতে রাজি হলে।

অপবাদ থেকে বাঁচার উপায় হলো, সাধারণভাবে মানুষের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা এবং অনুমান থেকে দূরে থাকা। মহান আল্লাহ বর্ণনা করেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা বেশির ভাগ অনুমান থেকে দূরে থেকো।’[২৯৩]

কারো ওপর অপবাদ দেওয়া হয় তাকে হেয় করার জন্য; মানুষের কাছে তার চরিত্র হননের জন্য। অথচ এটি অপবাদ আরোপকারীর ওপরই বর্তায়। রাসূল (সা.) বলেন, ‘একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে হেয় মনে করে।’[২৯৪]

কারো ব্যাপারে অপবাদ দেওয়া হলে সে ক্ষমা না করলে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়া যাবে না। কেননা অপবাদ বান্দার হক। বান্দা ক্ষমা না করলে মহান আল্লাহ বান্দার হক ক্ষমা করেন না।

পাশাপাশি যার কাছে অন্যের বিরদ্ধে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয়, তার উচিত অন্ধভাবে তার কথা বিশ্বাস না করে তা যাচাই-বাছাই করা। অতিরিক্ত আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনো ভিত্তিহীন কথা

---

২৯২. *আল কুরআন*, ২৪ : ৪-৫
২৯৩. *আল কুরআন*, ২৪ : ১৫
২৯৪. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১২

প্রচার করা হয়। অথচ রাসূল (সা.) ভিত্তিহীন কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন কোনো খবর যাচাই না করেই প্রচার করতে। হাদীস শরিফে বর্ণনা হয়েছে, যা শুনে তা-ই বলতে থাকা কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।[২৯৫]

তাই কোনো কথাই ভালোভাবে যাচাই না করে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। কেননা অন্য কেউ বিপথগামী হতে পারে। হাদীস শরিফে বর্ণনা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সত্য কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, আর কল্যাণ জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের ওপর অবিচল থেকে অবশেষে সিদ্দিকের মর্যাদা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহা মিথ্যাচারী প্রতিপন্ন হয়ে যায়।[২৯৬]

অপবাদ ও অপপ্রচার নিয়ে কুরআনের বাণী :

এক জীবনে যা চাই, তার সবই সাজানো রয়েছে কুরআনের পরতে পরতে। সুস্থ সুন্দর সুখী পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য যা প্রয়োজন, পাতায় পাতায় রয়েছে তারই দিক-নির্দেশনা। এর পাশাপাশি মানুষের ভেতরের খারাপ দিকগুলোর জন্য শাস্তি ঘোষণা এসেছে। এসব পরিত্রাণের উপায়ও বলে দিয়েছে। এ পর্যায়ে অপবাদ ও অপপ্রচার নিয়ে কুরআন যা বলছে তা হলো -

'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নাও এবং প্রথম স্ত্রীকে প্রচুর অর্থবিত্ত দিয়ে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ বা যুলুমের মাধ্যমে তা ফেরত নেবে?'[২৯৭]

'হে মানুষ! শুনে রাখো কেউ কোন অন্যায় বা পাপ করে পরে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দিলে, মিথ্যা অপবাদের দায়ভার মুক্ত হয়ে তার পাপের বোঝা আরও ভারী হবে।'[২৯৮]

'দুঃখকষ্টের পর যখনই সত্য অস্বীকারকারীদের কিছুটা অনুগ্রহ আস্বাদনের সুযোগ দেয়া হয়, তখনই ওরা আমার বাণীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। হে নবী! ওদের বলো, আল্লাহ পরিকল্পিত

---

২৯৫. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৬৪৩৫
২৯৬. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫
২৯৭. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৬০৯৪
২৯৮. *আল কুরআন*, ৪ : ২০

কৌশল অবলম্বনে (তোমাদের চেয়ে) অনেক অগ্রগামী। (নিশ্চিত থাকো) তোমাদের চক্রান্ত ও অপপ্রচারের পূর্ণ বিবরণ ফেরেশতারা রেকর্ড করছে।'[২৯৯]

'আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর কোন শরিক নেই। যদি শরিক থাকত তবে প্রত্যেক শরিক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের লড়াইয়ে নেমে যেত (আর সৃষ্টির বারোটা বাজত)। ওদের অপবাদ থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান!'[৩০০]

অপবাদ :

যা ব্যক্তিত্ব বিনাশ করে। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকারক অন্যায় কাজগুলোর একটি হলো অপবাদ। যে ব্যক্তি অন্যকে অপবাদ দেয় সে অন্যের ক্ষতি করার পাশাপাশি নিজেরও ক্ষতি করতো। নিজের আত্মাকে পাপের মাধ্যমে কলুষিত করে।

অপবাদ বা কুৎসা রটনা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার। এটা যদি ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে করা হয় তাহলে তা গীবত হিসেবেও বিবেচিত হয়। অর্থাৎ অপবাদ দেয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে দুই ধরনের পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। এক ব্যক্তি একদিন ইমাম সাদেক (আ.) এর সঙ্গে হেটে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। ঐ ব্যক্তির সঙ্গে তার কাজের লোকটিও ছিল। হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে কাজের লোকটি পেছনে পড়ে যায়। এ অবস্থায় ইমামের সঙ্গী ব্যক্তিটি তার কাজের লোককে তার কাছে আসতে ডাক দিল। কিন্তু কাজের লোকটি কোন জবাব দিল না। এভাবে কয়েক বার ডাকাডাকির পরও যখন কাজের লোকটি কোন উত্তর দিল না তখন ওই ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হয়ে গালি দিল যা আসলে কাজের লোকটির মায়ের প্রতি এক ধরনের অপবাদ।

ইমাম সাদেক ওই ব্যক্তির আচরণ ও কথা শুনে অসন্তুষ্ট হন এবং ব্যক্তিটি যে নিন্দনীয় আচরণ করেছে তা তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ইমামের সঙ্গে চলা ব্যক্তিটি তার ভুল স্বীকার না করে নিজের আচরণের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা চালায়। ইমাম যখন বুঝতে পারলেন যে, ওই ব্যক্তি অপবাদ দেয়ার ভুল স্বীকার করতেও রাজি নয় তখন তিনি ওই ব্যক্তিকে বললেন তোমার আর আমার কাছে আসার দরকার নেই।

---

২৯৯. *আল কুরআন*, ৪ : ১১২
৩০০. *আল কুরআন*, ১০ : ২১

এখন আমরা দেখব, অপবাদের তৃতীয় প্রভাব কী? : 'অপবাদ' আগে বা পরে সামাজিক সুস্থতাকে বিনষ্ট করে। সামাজিক ন্যায়বিচার ধ্বংস করে। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য হিসেবে তুলে ধরে। অপবাদ মানুষকে কোন কারণ ছাড়াই অপরাধী হিসেবে তুলে ধরে এবং সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কোন সমাজে যখন অপবাদ দেয়ার রীতি চালু থাকে এবং অপবাদকে মেনে নেয় ও অপবাদকে বিশ্বাস করে তখন মিথ্যাটাও সত্যের বেশ ধারণ করে সামনে আসে। ফলে সমাজে অনাস্থা,অবিশ্বাস এবং বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যে কেউ কারো বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে এবং যাকে তাকে অপবাদ দেয়ার সাহস পায় এর ফলে সমাজে বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার স্থান দখল করে নেয়। কে কখন অপবাদের শিকার হয় তা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অপবাদের মারাত্বক কুপ্রভাব রয়েছে।

যে অপবাদ দেয় তার ঈমান নষ্ট হবার কারণ হলো ঈমান সততা ও সত্যবাদিতার সঙ্গে পথ চলে এবং অপবাদের অর্থ হলো অন্যের বিষয়ে মিথ্যা বলা। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যের বিষয়ে মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সে সত্যের পথে থাকতে পারে না। এভাবেই অপবাদ দানকারী ব্যক্তির ঈমান আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়। হৃদয়ে ঈমানের আলোর আর কোন অস্তিত্ব থাকে না এবং তার চূড়ান্ত স্থান হলো দোজখ বা নরক।ধারণা বা সন্দেহ অপুরণীয় ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, অনেকেই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নিজের স্বামী বা স্ত্রীকে হত্যা করেছে। পরে দেখা গেছে হত্যাকারীর যে বিষয়ে সন্দেহ করেছিল তা সত্য নয়। ইমাম মূসা কাজেম (আ.) কে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, আমি বিশ্বাসযোগ্য একাধিক সূত্রে জানতে পেরেছি এক মুসলিম ভাই আমার সম্পর্কে এমন কথা বলেছে যা আমার অপছন্দ। কিন্তু পরে আমি জিজ্ঞেস করলে ওই ব্যক্তি তা অস্বীকার করেছে। এখন আমার করণীয় কী?

ইমাম এর জবাবে বলেন, যদি ৫০ জন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিও তোমাকে বলে যে সে তোমার সম্পর্কে ভুল কথা বলেছে তাহলেও তুমি তা বিশ্বাস করো না যা তোমার মুসলিম ভাইয়ের জন্য সম্মানহানিকর তা তুমি করো না।

এখন আমরা দেখবো কোন অপবাদের কথা শোনার পর আমাদের করণীয় সম্পর্কে। সূরা হুজরাতের ৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন খবর আনে তাহলে তা পরীক্ষা করে দেখবে,যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ হলো, আমরা যখন কারো ব্যাপারে কোন কথা বা অপবাদ শুনব তখন আমাদের দায়িত্ব হলো প্রথমে তা পরীক্ষা করে এর সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হবো। কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক এবং প্রমাণ ও তদন্তবহীন মূল্যায়ন নিষিদ্ধ।

ইসলাম অপবাদকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে একে অপরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ না করা হয়। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কাউকে কোন কিছুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। পাশাপাশি এদিকে খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে যে, কেউ যাতে অপবাদ দিতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। মানুষের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সন্দেহ সৃষ্টির আশংকা দূর করতে হবে। এ কারণেই ইসলামে পাপাচারীদের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কারণ পাপাচারীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে মানুষের মনে মুমিনদের বিষয়েও সন্দেহের জন্ম হতে পারে এবং পরিণতিতে অপবাদ দিতে পারে।

মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ভয়াবহতা :

কারো ওপর অপবাদ আরোপ করা ইসলামে যেমন নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে সামাজিক দৃষ্টিতেও ঘৃণিত। এ অপবাদের কারণে একজন মানুষ আরেকজনের মান-মর্যাদা সব বিনষ্ট করে ফেলে। আমাদের সমাজে নিজের, দলের স্বার্থের জন্য ঘটে যায় এরকম হাজারো ঘটনা স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে।

এরকম কতো ঘটনা হরদম ঘটছে। এ পরিস্থিতি রীতিমতো মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। গল্প, গুজব, আড্ডা যত যাই হোক। সর্বত্রই অন্যের দোষচর্চা। অন্যের দুর্নাম, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। জানাশোনা-পরিচয় নেই কিছুই। তবুও একজনকে যাচ্ছেতাই বলা হচ্ছে। কেউ নিজের স্বার্থে, অনেকে দলের জন্য করে ফেলে এরকম জঘন্য কাজ। যিনি বলছেন তার পাপবোধ নেই। বিবেকে বাধে না। যারা শুনছেন তারাও কিছু বলেন না। বক্তার সঙ্গে তাল মেলান।

একজনের কাছ থেকে শোনেন,অমনিতেই ছড়িয়ে দেন আরেকজনের কাছে। একটুও যাচাই করার চেষ্টা করেন না যে, কথাটা কী আসলেই সঠিক। যাচাই না করার কারণে আপনি যখন অন্যত্রে বলেন তখন এটা মিথ্যায় পরিণত হয়। মিথ্যা বলা যে কত বড় গুনাহ, তা একটি হাদিস শরিফ থেকে বোঝা যায়।

অথচ দেখা যায় অন্যের নামে মিথ্যা দোষারোপ করা জঘন্য গোনাহ থেকেও আমরা বেঁচে থাকি না । কারও সম্মানহানি করার অধিকার অন্যের নেই। ইসলামে মিথ্যা দোষারোপের সুযোগ নেই। এটা ঘৃণিত অপরাধ। শাস্তিযোগ্য। আল্লাহ তায়া'লা অপবাদ রটনাকারীর শাস্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন,

'কোন পূতচরিত্রা নারীর বিরদ্ধে কেউ (ব্যভিচারের) অপবাদ দিয়ে যদি চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে অপবাদ রটনাকারীকে শাস্তি হিসেবে ৮০ বেত মারবে। আর কোনদিন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরা সত্যত্যাগী।'[৩০১]

নবী করিম (স.) বলেছেন, মুমিনদের প্রতি তোমরা ভালো ধারণা পোষণ করবে। অনুমান করেও কিছু বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।[৩০২]

পরিশেষে বলি, আমরা অন্যের সাথে হিংসা করা ছেড়ে দেই, অন্যের দোষচর্চা, মিথ্যা অপবাদ, দুর্নাম রটানো ছেড়ে দেই। এগুলো খুবই খারাপ জিনিস। এসব কাজ আপনাকে কখনোই প্রশান্তি দেবে না। বরং আপনার জীবনে নেমে আসবে অশান্তি আর অশান্তি। আর এর কারণে আপনার পরিবারও থাকে অশান্তিতে। তাই আসুন আমরা অন্যের দোষচর্চা ছেড়ে দেই, অন্যকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকি। একটা কথা শুনেই তাহকীক বা সত্যায়ন না করে এটাকে না ছড়াই। এমন কাজ ইসলাম কখনো সমর্থন করেনা।

৩০১. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৬০-৬১
৩০২. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৮৫

অপবাদ জঘন্য অপরাধ :

বেলাল নিজের স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন সিলেটের কোন এক পর্যটন এলাকায় বিকেলে বেড়াতে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে খোশগল্পে ব্যস্ত। সেখানে অন্যান্য পর্যটকদের ভীড়ে আতিকের পূর্ব পরিচিত কেউ একজন (বিয়ের ব্যাপারে অবগত নয়) সে তার সাথে থাকা বন্ধুকে চোখের ইশারায় আতিককে দেখিয়ে বলছে-ও-ই দেখছিস সে তাঁর মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে ডেটিংয়ে এসেছে। কত বড়!

পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বেলাল গত জুলাই মাসে একাকিত্ব জীবনের অবসান ঘটিয়ে দাম্পত্যজীবনে পা রাখে। এ রকম ঘটনা হরদম ঘটছে। রীতিমতো মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। গল্প, গুজব, আড্ডা যত যাই হোক। সর্বত্রই অন্যের দোষচর্চা। অন্যের দুর্নাম, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। জানাশোনা-পরিচয় নেই কিছুই। তবুও একজনকে যাচ্ছেতাই বলা হচ্ছে। যিনি বলছেন তার পাপবোধ নেই। বিবেকে বাধে না। যারা শুনছেন তারাও কিছু বলেন না। বক্তার সঙ্গে তাল মেলান। অথচ অন্যের নামে মিথ্যা দোষারোপ করা জঘন্য গোনা। কারও সম্মানহানি করার অধিকার অন্যের নেই।

এক জীবনে যা চাই, তার সবই সাজানো রয়েছে কুরআনের পরতে পরতে। সুস্থ সুন্দর সুখী পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য যা প্রয়োজন, পাতায় পাতায় রয়েছে তারই দিক-নির্দেশনা। ইসলামে মিথ্যা দোষারোপের সুযোগ নেই। এটা ঘৃণিত অপরাধ। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর পাশাপাশি মানুষের ভেতরের খারাপ দিকগুলোর জন্য শাস্তি ঘোষণা এসেছে। এসব পরিত্রাণের উপায়ও বলে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক।[৩০৩]
আল্লাহ বলেন, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।[৩০৪]

৩০৩. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১২
৩০৪. *আল কুরআন*, ২২ : ২৩

দোষারোপ করা, কারও দুর্নাম করা তো দূরের কথা, কারও সম্পর্কে কিছু প্রমাণ ছাড়া বলাও যাবে না। অহেতুক মানুষকে দোষারোপ করা সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। নবী করিম (স.) বলেছেন, মুমিনদের প্রতি তোমরা ভালো ধারণা পোষণ করবে। অনুমান করেও কিছু বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।[৩০৫]

কিছু পাপের কোনো কাফফারা হয় না। কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া তেমনই একটি পাপ।

তাই কথা বলার সময় সতর্ক থাকা দরকার। কম কথা বলা উত্তম। হাদীসে নবীজি (স.) জিহবাকে সংযত রাখতে বলেছেন।

এ পর্যায়ে অপবাদ ও অপপ্রচার নিয়ে কোরআন যা বলছে তা হলো -'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নাও এবং প্রথম স্ত্রীকে প্রচুর অর্থবিত্ত দিয়ে থাকো, তবে তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ বা জুলমের মাধ্যমে তা ফেরত নেবে?'[৩০৬]

'হে মানুষ! শুনে রাখো কেউ কোন অন্যায় বা পাপ করে পরে তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির ওপর চাপিয়ে দিলে, মিথ্যা অপবাদের দায়ভার মুক্ত হয়ে তার পাপের বোঝা আরও ভারী হবে।'[৩০৭]

'দুঃখকষ্টের পর যখনই সত্য অস্বীকারকারীদের কিছুটা অনুগ্রহ আস্বাদনের সুযোগ দেয়া হয়, তখনই ওরা আমার বাণীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। হে নবী! ওদের বলো, আল্লাহ পরিকল্পিত কৌশল অবলম্বনে (তোমাদের চেয়ে) অনেক অগ্রগামী। (নিশ্চিত থাকো) তোমাদের চক্রান্ত ও অপপ্রচারের পূর্ণ বিবরণ ফেরেশতারা রেকর্ড করছে।'[৩০৮]

'আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর কোন শরিক নেই। যদি শরিক থাকত তবে প্রত্যেক শরিক উপাস্য নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের লড়াইয়ে নেমে যেত (আর সৃষ্টির বারোটা বাজত)। ওদের অপবাদ থেকে আল্লাহ পবিত্র, মহান!'[৩০৯]

---

৩০৫. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৮৫
৩০৬. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১২
৩০৭. *আল কুরআন*, ৪ : ২০
৩০৮. *আল কুরআন*, ৪ : ১১২
৩০৯. *আল কুরআন*, ১০ : ২১

‘যারা বিনা দোষে বিশ্বাসী পুরষ ও বিশ্বাসী নারীকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হবে।’[৩১০]

‘হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন তোমার কাছে বায়াত বা আনুগত্যের শপথ করতে এসে ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোন মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং ঘোষিত ন্যায্য বিষয়ে তোমার নির্দেশ অমান্য করবে না, তখন তাদর বায়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ তো অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[৩১১]

অপবাদ যাদের কলঙ্কিত করতে পারে না :

‘চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরষের যোগ্য আর চরিত্রহীন পুরষ চরিত্রহীনা নারীর যোগ্য। চরিত্রবতী নারী চরিত্রবান পুরষের যোগ্য আর চরিত্রবান পুরষ চরিত্রবতী নারীর যোগ্য। কোন মিথ্যা অপবাদই চরিত্রবানদের কলঙ্কিত করতে পারে না। এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবনোপকরণ।’[৩১২]

অপবাদ রটনাকারীর শাস্তি : ‘কোন পূতচরিত্রা নারীর বিরূদ্ধে কেউ (ব্যভিচারের) অপবাদ দিয়ে যদি চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে অপবাদ রটনাকারীকে শাস্তি হিসেবে ৮০ বেত মারবে। আর কোনদিন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরা সত্যত্যাগী।’[৩১৩]

‘যারা চরিত্রহীনতার মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তা তোমাদেরই একটি দল। (কিন্তু এই অপবাদে যাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে) তারা যেন নিজেদের জন্যে বিষয়টিকে ক্ষতিকর মনে না করে। বরং এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। (অপবাদ রটনাকারী) প্রত্যেককেই এ পাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এদের মধ্যে যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন আজাব।’[৩১৪]

---

৩১০. *আল কুরআন*, ২৩ : ৯১
৩১১. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৮
৩১২. *আল কুরআন*, ৬০ : ১২
৩১৩. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৬
৩১৪. *আল কুরআন*, ২৪ : ৪

'মুনাফেক, রুগ্নমনা ও মিথ্যা গুজব রটনাকারীরা শহরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত না হলে আমি ওদের ওপর তোমাকে কর্তৃত্ব দান করব। তারপর (হে নবী!) খুব অল্প সময়ই ওরা এ নগরে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে। অভিশপ্ত অবস্থায় ওদের যেখানে পাওয়া যাবে, পাকড়াও ও বিনাশ করা হবে।'[৩১৫]

অতএব অপবাদ ও অপপ্রচার থেকে দূরে থাকি, নিজের কল্যাণ সাধিত হবে।

মিথ্যা দোষারোপ জঘন্য অপরাধ!

মানব জীবনের একটি মারাত্মক ও নিন্দনীয় বদস্বভাব হচ্ছে মিথ্যা দোষারোপ করা, ইহকাল ও পরকালে যার পরিণতি খুব কঠিন ও ভয়াবহ। মিথ্যা অপবাদ বা দোষারোপ মানব চরিত্রের অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট স্বভাব। জঘন্য এ মন্দ কাজের সঙ্গে মিথ্যাচার, পরচর্চা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ, ছিদ্রান্বেষণ, পরশ্রীকাতরতার মতো ঘৃণ্য তৎপরতা জড়িত। মিথ্যাচারে অভ্যস্ত মানুষই কেবল কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করতে পারে। মিথ্যা দোষারোপ মিথ্যাচারের চরম বহিঃপ্রকাশ। মিথ্যাচার জঘন্য ধরনের পাপাচার, এটি তাকওয়ার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও শরিয়ত-গর্হিত কাজ। পবিত্র কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে যে 'তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক।'[৩১৬]

মানবজাতিকে অহেতুক অনুমান থেকে দূরে থাকার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ, অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ।'[৩১৭]

মিথ্যা দোষারোপ করার ক্ষেত্রে দোষারোপকারীকে পরচর্চা ও পরনিন্দার আশ্রয় নিতে হয়। ইসলামে পরনিন্দা ও পরচর্চাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরনিন্দাকারীকে কঠোর দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

---

৩১৫. *আল কুরআন*, ২৪ : ১১
৩১৬. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৬০-৬১
৩১৭. *আল কুরআন*, ২২ : ৩০

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।’[৩১৮] কারও বিপক্ষে মিথ্যা দোষারোপ করতে হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে প্ররোচিত করে। মানুষ সাধারণত পরশ্রীকাতর হয়ে এবং অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা দোষারোপের অপরাধে লিপ্ত হয়। মানব চরিত্রের ক্ষতিকর মন্দ স্বভাবের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ জঘন্য ধরনের বদাভ্যাস। নেতৃত্বের মোহ, সুযোগ-সুবিধা লাভের ক্ষেত্র তৈরি, অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা, নিজেকে জোরপূর্বক যোগ্যতম হিসেবে প্রতষ্ঠিত করা প্রভৃতি খারাপ মানসিকতা মানুষকে হিংসা ও বিদ্বেষপরায়ণ হতে প্ররাচিত করে। হিংসা ও বিদ্বেষপোষণকারীর অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার আহ্বান জানিয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে (পানাহ চাই), যখন সে হিংসা করে।’[৩১৯]

মিথ্যা অপবাদের ফলে একদিকে দোষারোপকারীরা অবৈধভাবে নানা ধরনের ফায়দা লুটছে, অন্যদিকে যাকে মিথ্যা দোষারোপ করা হচ্ছে, তাকে দারুণভাবে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। এর দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি ঘটে, হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক বন্ধনের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক ঐক্য ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় ক্ষেত্রে এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে দুর্বল করে ফেলে। তাই ইসলামের শিক্ষার আলোকে প্রত্যেকেরই মিথ্যা অপবাদ ও দোষারোপের ন্যায় জঘন্য সামাজিক অনাচারমূলক কর্মকান্ড থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকা উচিত।

---

৩১৮. *আল কুরআন*, ১০৪ : ১
৩১৯. *আল কুরআন*, ১১৩ : ৫

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ-এর পরিণাম :

আল্লাহ তায়ালা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে দিয়েছেন ইসলামী জীবনবিধান। এ বিধানের মূল লক্ষ্য মানুষকে সত্যিকারে আল্লাহর বান্দা তৈরি করা। সে জন্য ইসলাম মানুষকে তার জীবনে বেশ কিছু বিধিবিধান মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে এবং কিছু কাজ থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছে। মানবজীবনে অপরিহার্যভাবে দূরে থাকার ব্যাপারে যে নির্দেশ এসেছে তন্মধ্যে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা এবং অপবাদ দেয়া অন্যতম। এ দু'টিকে কবীরা গুনাহর এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ ধরণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না । আল কুরআনে বলা হয়েছে,

وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامًا-

"আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়।"[৩২০]

যুগ যুগ ধরে প্রকৃত ইমানদারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ দেয়া হয়েছে। আল কুরআনে এসেছে-

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ-

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর।"[৩২১]

আজকে আমাদের সমাজে নানাভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ দেয়ার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। একজন অপরজনকে ঘায়েল করার জন্য এ দু'টি মানবতাবিরোধী কাজ অহরহ চলছে।

৩২০. *আল কুরআন*, ২৫ : ৭২
৩২১. *আল কুরআন*, ৬ : ১১২

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদের মাধ্যমে হয়ত সাময়িক লাভবান বা আনন্দিত হওয়া যায়, কিন্তু এর ভয়াবহ পরিণাম দুনিয়াতে যেমনি রয়েছে, তেমনিভাবে আখেরাতেও রয়েছে কঠিন শাস্তি।

এসব থেকে বিরত থাকতে আল কুরআনে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ-

"সুতরাং মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর।"[৩২২]

মানুষের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ দেয়ার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাকে জীবনের সকল পর্যায়ে বিপর্যস্ত ও সমস্যাগ্রস্ত করতে এ দু'টি পাপই যথেষ্ট- যা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানবেতিহাসের পরিক্রমায় এ সত্যটিই বার বার আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে, প্রমাণিত হয়েছে নানাভাবে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত বহুজাতি জ্ঞান-গরিমা, সম্পদ-সমৃদ্ধি, কৃষ্টি-কালচারে আকাশচুম্বি সফলতা অর্জন করার পরও এ একটি কারণে তারা সমূলে ধ্বংস হয়েছে। কুরআনুল কারীমে আদ ও সামূদ জাতিসহ অনেক জাতিগোষ্ঠীর বিপর্যয় ও ধ্বংসের সংবাদ আমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ দেয়ার অপরাধের মাত্রা এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কয়েকটি পরিণাম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

১. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান শিরক সমতুল্য গুনাহ :

শিরক সবচেয়ে বড় ও কঠিন গুনাহ। আল্লাহ তায়ালা শিরক ছাড়া সব ধরণের গুণাহ ক্ষমা করবেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এমন বড় গুনাহের কাজ, যা শিরকের গুনাহের সমতুল্য। হাদীসে এসেছে,

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِقَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ-

"একবার রাসূল (স.) হেলান দিয়ে বসে ছিলেন এ অবস্থায় তিনি সাহাবাদের বললেন, বড় গোনাহ সম্পর্কে কি আমি তোমাদের বলব? সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ বলুন।

৩২২. *আল কুরআন*, ২২ : ৩০

রাসূলাল্লাহ (স.) বললেন, বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হল কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা তথা শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা। অতঃপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া (একথা তিনি বার বার বলেছিলেন এমনকি আমরা বললাম যদি তিনি (স.) চুপ করতেন।[৩২৩]

২. মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার ভাল আমল কবুল হবে না :

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে তার জীবনের মুক্তি ও কল্যাণলাভের সকল পথ চিররুদ্ধ করে দেয়া হয়। দুনিয়ার জীবনে কোন বিচারকাজে তার সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় না। আখিরাতের জীবনের জন্য তার ভাল কোন আমল আল্লাহর নিকট কবুল হবে না।

এ বিষয়ে রাসূলাল্লাহ (স.) বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ-

“যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ এবং মুর্খতা পরিত্যাগ করতে পারল না, তার রোযা রেখে শুধুমাত্র পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”[৩২৪]

৩. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কবীরাহ গুনাহ :

মানবজীবনের দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণলাভের জন্য কবীরা গুনাহ পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। কেউ যদি মিথ্যা সাক্ষী দেয় তবে তা হবে কবীরা গুনাহ। তাওবাহ করা ছাড়া তার উপায় নেই। ইচ্ছাকৃত কবীরাগুনাহকারী ঈমান নিয়ে কবরে যেতে পারে না। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ-

“আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলাল্লাহ (স.) এর নিকট কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা তথা শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, মানুষ হত্যা করা ও মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া।”[৩২৫]

---

৩২৩. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২৬৫৪
৩২৪. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৬০৫৭
৩২৫. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২৬৫৩

৪. মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ দেওয়া বড় যুলুম :

কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা ও অপবাদ রটনার মাধ্যমে ব্যক্তির ওপর যুলুম করা হয়। আর যুলুমের কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেয়। এ বিপর্যয় কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তির ওপর আসে না, বরং সকেলই এর ভুক্তভুগী হয়ে থাকে। রাসূলাল্লাহ (স.) মুসলমানদেরকে মযলুমের বদ দু'আ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা মযলুমের দু'আ কখনও ফেরত দেন না।

কুরআনে বলা হয়েছে,

وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةًۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ-

"আর তোমরা ভয় কর ফিতনাকে যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু যালিমদের ওপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।"[৩২৬]

৫. মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ও গ্রহণকারী উভয়ে সমান অপরাধী :

মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা তার সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে যে অপরাধ করেছে, আর সে অপরাধ যে গ্রহণ করেছে সেও সমান অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হবে। কারণ মিথ্যা সাক্ষ্য বিচারের নামে প্রতারণার নামান্তর। এখানে সাক্ষ্যদাতা ও বিচারক উভয়েই প্রতারণা ও যুলুমের দায়ে দোষী বিবেচিত হবে।

৬. মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ও গ্রহণকারী খেয়ানতকারী হিসাবে অভিযুক্ত :

একজন মুসলমানের ঈমানের প্রধান দাবি স্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করা। যারা বিচার শালিস করে থাকেন তাদের ওপর এক বিরাট আমানতের দায়িত্ব থাকে। জেনে শুনে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে উভয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে আমানতের খেয়ানত করে থাকে। কেননা কুরআনে এসেছে,

وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمًا-

"নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না"।[৩২৭]

আর খেয়ানতকারীর শাস্তি ভয়াবহ হবে।

---

৩২৬. *আল কুরআন*, ৮ : ২৫
৩২৭. *আল কুরআন*, ৪ : ১০৫

৭. মিথ্যা অপবাদকারী হতভাগা :

মিথ্যা অপবাদকারী সাময়িক আনন্দ, কোন প্রাচুর্য পেলে বা তার কোন পদোন্নতি হলেও মিথ্যা অপবাদকারীর চেয়ে হতভাগা আর কেহ নেই। সে দুনিয়াতে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং আখিরাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সকল অপরাধের বোঝা বহন করবে এবং এক পর্যায়ে নি:স্ব অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي " :قَالُوا: الْمُفْلِسُ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ ، فَقَالَ " قَالَ أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ-

“তোমরা কি জান গরীব কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নাই সে হলো গরীব লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরীব যে, কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে, অন্যায়ভাবে লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক আমল নামা দিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”[৩২৮]

৮. বানোয়াট অভিযোগকারীর স্থান জাহান্নাম :

কেউ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধে কোন বানোয়াট অভিযোগ আনলে তা অভিযোগকারীর জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ হবে। আবু যার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

“যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোন বানোয়াট অভিযোগ আনল, সে যেন নিজেই নিজের স্থান জাহান্নামে করে নিল।”[৩২৯]

৩২৮. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৪১৮
৩২৯. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৩৫০৮

৯. মিথ্যা রটনাকারীর ওপর আল্লাহর গযব :

কোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বললে সে নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর অন্যের ব্যাপারে বললে সে অনেককে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং নিজেও তার শিকার হয়। এটি মহাপাপ। তাই মিথ্যা রটনাকারীর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব অনিবার্য হয়ে যায়। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلۡعِجۡلَ سَيَنَالُهُمۡ غَضَبٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَذِلَّةٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُفۡتَرِينَ-

"নিশ্চয় যারা গো বাছুরকে (উপাস্য হিসাবে) গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে আক্রান্ত করবে তাদের রবের পক্ষ থেকে গযব ও লাঞ্ছনা। আর এভাবে আমি মিথ্যা রটনাকারীদের প্রতিফল দেই।"[৩৩০]

১০. মিথ্যা রটনাকারী ব্যর্থ হয় :

মিথ্যা কখনও সত্যে পরিণত হয় না। মিথ্যা আরোপ করে সাময়িক সাফল্য পাওয়া গেলেও চূড়ান্তভাবে সফল হওয়া যায় না, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সাময়িকভাবে কাউকে হেয় করা যায় বা কাউকে পাকড়াও করা যায়। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা অপবাদ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَقَدۡ خَابَ مَنِ ٱفۡتَرَىٰ-

"আর যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে, সে-ই ব্যর্থ হয়।"[৩৩১]

১১. অপবাদ ক্ষণস্থায়ী :

মানুষের জীবন দুনিয়াতেই শেষ নয়। আখিরাতের অনন্ত জীবনই মানুষের প্রকৃত বা আসল জীবন। সেখানেই তাকে চিরকাল অবস্থান করতে হবে। সত্য চিরস্থায়ী। আর অপবাদ সবসময় ক্ষণস্থায়ী, এর স্থায়িত্ব একান্ত সাময়িক। পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল কুরআনে বলা হয়েছে,

ٱنظُرۡ كَيۡفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡۚ وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ-

"দেখ, তারা কীভাবে মিথ্যা বলেছে নিজদের ওপর, তারা যে মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের থেকে হারিয়ে গেল।"[৩৩২]

---

৩৩০. *আল কুরআন*, ৭ : ১৫২
৩৩১. *আল কুরআন*, ২০ : ৬১
৩৩২. *আল কুরআন*, ৬ : ২৪

১২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায় :

মিথ্যা সাক্ষ্য এবং অপবাদ কোন সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠালাভ করলে সেখানে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায় না। সামাজিক অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এর যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া অপরিহার্য।

১৩. সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় :

মিথ্যা সাক্ষ্য এবং অপবাদ কোন সমাজে ব্যাপকভিত্তি পেলে সেখানের সামাজিক শৃঙ্খলা দ্রুত বিনষ্ট হয়। সমাজের সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করে। পারস্পরিক কলহ বিবাদ বেড়ে যায়। ফলে সমন্বিত কোন কল্যাণকাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ সহজতর হয়।

১৪. সামাজিক ঐক্য ও সংহতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় :

মিথ্যা সাক্ষ্য এবং অপবাদ-এর কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসরতদের মাঝে স্থায়ী শত্রুতার জন্ম নেয়। ফলে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয় না।

১৫. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ব্যাহত হয় :

একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিবাসীরা যখন পারস্পরিক বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং একে অন্যকে অপবাদ দেয়া শুরু করে, তখন সেখানে কোন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা আস্থাহীনতা কোন কল্যাণকর উদ্যোগকেই সফল হতে দেয় না। একে অন্যে কাদা ছোঁড়াছুড়িতে ব্যস্ত থাকে।

ইসলামে বিশ্বাসী সকল মানুষের জন্য উপরে বর্ণিত অতি গর্হিত এবং সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী পাপাচার থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রে কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এই অপরাধমুক্ত হওয়া জরুরী। বিশ্বমানবতাকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত হতে বাঁচানোর একমাত্র রক্ষাকবচ। এটি মানবচরিত্রের সকল ভালগুণাবলী বিনষ্টকারী।

মানবসমাজে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়। পক্ষান্তরে পৃথিবীর সকল বিপর্যয়ের নিয়ামক। মানুষে মানুষে সবধরণের অন্যায় ও যুলুম পরিচালনার মূল কারণ। আজকের সমাজে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য ও অপবাদ দেয়ার মত জঘন্য কাজে সম্পৃক্ত তাদেরকে সতর্ক হওয়া এবং এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা অনেক জাতিতে তাদের এ দুটি কুকর্মের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল কুরআনে এসেছে,

أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلۡقُرُونِ أَنَّهُمۡ إِلَيۡهِمۡ لَا يَرۡجِعُونَ

“তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, নিশ্চয় যারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না।”[৩৩৩]

আমরা যারা এসব অন্যায় কাজ হতে দেখছি তাদেরকেও এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা অপবাদ দেয়ার মত জঘন্য কাজে সম্পৃক্ত তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাবে হবে।

হযরত আয়েশা (রা:) এর ওপর মিথ্যা চারিত্রিক অপবাদ রটানোর কাজে ভুলবশত মানবীয় দুর্বলতার কারণে মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি দলও জড়িয়ে পড়েছিলো। তবে মাত্র তিনজন মুসলমানের নাম হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের পাতায় পাওয়া যায়, যারা ভুলবশত মোনাফেকদের পাতানো ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন। এ তিনজন হলেন- কবি হাসনান ইবন সাবেত (রা.), মিসতাহ ইবন উসাসা (রা.) এবং হামনা বিনতে জাহাশ (রা.)।

চারিত্রিক অপবাদের ভিত্তিহীন খবর প্রচার এবং সেটার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে না পারার কারণে শরীয়তের নিয়ন অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হয়। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে তাদের তাওবাহ কবুল করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (সূরা আন নূরের ২৪নং আয়াতে বর্ণিত)। সেজন্য আমরা বর্তমান কালের মুসলমান ঐ তিনজনের প্রতি কোনোরূপ ক্ষোভ-বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি না। কারণ আল্লাহর ক্ষমাই চূড়ান্ত ফয়সালা। সুতারাং তাদের নামের শেষে রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়তে হবে, নচেত ভীষণ গুনাহের কাজ

৩৩৩. *আল কুরআন*, ৩৬ : ৩১

হবে। যাহোক, নারীদের চরিত্রের ওপর অপবাদ রটনাকারীরা কি পরিমাণে আল্লাহর দ্বারা অভিশপ্ত তা বোঝানোর জন্য একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। রাসূল (স.) বলেছেন।

সাতটি ধ্বংসকারী পাপ থেকে তোমরা বেঁচে থাক। জিজ্ঞেস করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! সাঃ ঐ গুলো কী? উত্তরে তিনি বললেন : ঐগুলো হলো- আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদু করা, বিনা কারণে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং সতী-সাধ্বী, সরল মোমেনা স্ত্রী লোকের ওপর অপবাদ আরোপ করা।[৩৩৪]

গীবত এবং অপবাদের পার্থক্য

গীবত কী?

গীবত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দোষারোপ করা, অনুপস্থিত থাকা, পরচর্চা করা, পরনিন্দা করা, কুৎসা রটনা করা, পিছে সমালোচনা করা ইত্যাদি।

মানুষ সব সময় সুখ ও শান্তি চায়। শান্তি মানুষের একটি পরম কাংখিত বিষয়।

কিন্তু এ প্রত্যাশিত সুখ-শান্তি নির্ভর করে সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র এসব পার্থক্যই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যই এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা হুজরাতে এরশাদ করেছেন, হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।[৩৩৫]

৩৩৪. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং ১/৯২
৩৩৫. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১৩

মানব সমাজের এই পার্থক্য আল্লাহ্ কর্তৃক পরিকল্পিত। সুতরাং যে যেই অবস্থায় আছে সেইটুকুতে সন্তুষ্ট থাকাই (তাকওয়া)। যেসব কারণে সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়, সমাজ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়, সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়, পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়, তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো গীবত, যা মানুষকে নিকৃষ্টতম প্রাণীতে পরিণত করে।

সাহাবী আবু হুরায়ারা (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, গীবত কাকে বলে, তোমরা জান কী? সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) ই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তোমার কোনো ভাই (দীনি) সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, তা-ই গীবত। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যে দোষের কথা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তাহলেও কি গীবত হবে? উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, তুমি যে দোষের কথা বল, তা যদি তোমার ভাইয়ের থাকে তবে তুমি অবশ্যই তার গীবত করলে আর তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছো।[৩৩৬]
একথায় বুঝা গেল মিথ্যা অপবাদ গীবতের চাইতেও জগন্যতম অপরাধ।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন,
"আর তোমরা একজন অন্যজনের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের আড়ালে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ে গোশত খেতে চাইবে? প্রকৃতপক্ষে তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।"[৩৩৭]
সুস্থ, স্বাধীন কোনো বিবেকবান মানুষই জ্ঞান অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মৃত মানুষ তো দূরের কথা, যে পশু জীবিত থাকলে হালাল সেই পশু মৃত হলে তার গোশতও ভক্ষণ করবে না। অথচ মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে, স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে গীবতের মতো জঘন্য ফেতনায় নিমজ্জিত হয়।

---

৩৩৬. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৪১২
৩৩৭. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১২

এখানে আল্লাহ্ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যদি আমরা এই ঘৃন্য কাজ করে থাকি আল্লাহর কাছে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করি,আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোনো (মুমিনের) ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলা গীবত যা সে অপছন্দ করে। কেউ গীবত শুনলে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে তা প্রতিরোধ করতে হবে সাধ্যমতো। আর যদি প্রতিরোধের শক্তি না থাকে তবে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনা নিজে গীবত করার মতোই অপরাধ।

হাদীসে আছে, সাহাবী মায়মুন (র.) বলেন, 'একদিন স্বপ্নে দেখলাম এক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে তা ভক্ষণ করতে বলছে। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি তো তার সম্পর্কে কখনো কোনো ভালোমন্দ কথা বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক। কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং সম্মত রয়েছো।'

আবু সায়িদ ও জাবের (র.) থেকে বর্ণিত রাসূল রাসূল (স.) বলেছেন, 'গীবত ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এটা কিভাবে? তিনি বললেন, ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু গীবত যে করে তার গোনাহ আক্রান্ত প্রতিপক্ষের ক্ষমা না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।'

সুতরাং এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে, গীবত একটি জঘন্য পাপাচার। এ থেকে সবাইকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকতে হবে। মিথ্যা অপবাদকারী সাময়িক আনন্দ, কোন প্রাচুর্য পেলে বা তার কোন পদোন্নতি হলেও মিথ্যা অপবাদকারীর চেয়ে হতভাগা আর কেহ নেই।

মিথ্যা অপবাদকারী, যুলুমকারী, খুনী ও খেয়ানতকারী সবাই হতভাগা :

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) বলেছেন,
তোমরা কি জান গরীব কে? সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে যার সম্পদ নাই সে হলো গরীব লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে হলো গরীব যে, কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে অথচ সে অমুককে গালি দিয়েছে, অমুককে অপবাদ দিয়েছে,

অন্যায়ভাবে লোকের মাল খেয়েছে, সে লোকের রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। কাজেই এসব নির্যাতিত ব্যক্তিদেরকে সেদিন তার নেক আমল নামা দিয়ে দেয়া হবে। এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩৩৮]

আবু যার রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোন বানোয়াট অভিযোগ আনল, সেযেন নিজেই নিজের স্থান জাহান্নামে করে নিল।[৩৩৯]

মিথ্যা আরোপ করে সফল হওয়া যায় না, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সাময়িকভাবে কাওকে হেয় করা যায় বা সাময়িক কষ্ট দেয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা অপবাদ ব্যর্থ হয়।

কেননা কুরআনে বলা হয়েছে- "আর যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে, সে-ই ব্যর্থ হয়।"[৩৪০]

যাদের দোষ বর্ণনা করা যায় :

গীবত নিঃসন্দেহে হারাম। তারপরও যাদের দোষ বর্ণনা করা যায় তা হচ্ছে- কোনো অত্যাচারীর অত্যাচারের কাহিনী প্রতিকারের আশায় বর্ণনা করা। সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা। ফতোয়া গ্রহণ করার জন্য ঘটনার বিবরণ দেয়া ও প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারো দোষ বর্ণনা করা জরুরি। আবার যাদের স্বভাব গীবত করা তাদের সম্পর্কে অন্যদের সাবধান করার জন্য তার দোষ বর্ণনা করা জায়েজ। যেমন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা এক ব্যক্তি (মাখরামা ইবনে নওফেল) নবী করিম (স.) এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তিনি বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও, সে গোত্রের কতই না নিকৃষ্ট লোক। অত:পর তিনি তার সাথে প্রশস্ত চেহারায় তাকালেন এবং হাসিমুখে কথা বললেন।

গীবত থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। এ থেকে বাঁচার প্রথম উপায় হচ্ছে অপরের কল্যাণ কামনা করা। কেননা, রাসূল (স.) বলেছেন, 'দীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা করা।'

---

৩৩৮. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২৪১৮
৩৩৯. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৩৫০৮
৩৪০. *আল কুরআন*, ২০ : ৬১

দ্বিতীয়ত, আত্মত্যাগ অর্থাৎ যেকোনো প্রয়োজনে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়া। যেমন আল্লাহ সূরা হাশরের ৯ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেছেন, ‘তারা নিজের ওপর অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অনটনের মধ্যে থাকে।’

তৃতীয়ত, অপরের অপরাধকে ক্ষমা করে দেয়া।

চতুর্থত, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী বেশি বেশি করে অধ্যয়ন করা।

* গীবত হল অন্যের অনুপস্থিতি তে তার এমন দোষ আলোচনা করা যা তার মধ্যে বিদ্যমান।

* অপবাদ হল উপস্থিতি হওক কিংবা অনুপস্থিতি মানুষকে এমন দোষে দোষারোপ করা যা তার মধ্যে নাই।

* গীবতের হুকুম হল হারাম।

গীবত এমন অপরাধ যা জিনার থেকেও মারাত্মক। গীবত করা মানে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া।

* অপবাদের হুকুম হল গীবতের হুকুম থেকেও মারাত্মক।

গীবত এবং অপবাদের গোনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না বান্দা ক্ষমা করে।
অর্থাৎ গীবত এবং অপবাদের গোনাহ ক্ষমা পাওয়ার শর্ত হল যার গীবত করা হয়েছে এবং যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমা করতে হবে।নতুবা আল্লাহ পাক ক্ষমা করবে না।

কিয়ামতের ময়দানে যারা গিবত করে এবং অপবাদ দেয় তাদের আমলনামায় কোন পূন্য থাকবে না। কারণ তাদের পূণ্য সব যাদের গিবত করা হয়েছে এবং যাদেরকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খোঁটা দেওয়া

কারো উপকার করে খোঁটা দেওয়া একটি বিশ্রি অভ্যাস। এটা মানুষের ব্যক্তিত্বকে ছোট করে দেয়। দেখা যায়, একশ্রেণীর মানুষ দান-খয়রাত করে এবং ঋণকর্জ দিয়ে পরক্ষণেই খোঁটা দেয়।

বিশেষত যদি গ্রহীতার সঙ্গে দাতার কোনো কারণে সম্পর্ক নষ্ট হয় বা মতপার্থক্য দেখা দেয়, তখন অতীতের উপকারের ফিরিস্তি খুলে দিয়ে খোঁটা দিতে শুরু করে। কাউকে সহযোগিতা কিংবা উপকার করে খোঁটা দেওয়া ইসলামে নিকৃষ্ট অপরাধ। খোঁটা দিলে উপকারের সওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই খোঁটা দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অন্যায় ও কবিরা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোনো আশঙ্কা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।[৩৪১]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-বদান্যতা বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মতো, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।[৩৪২]

মূলত যারা সংকীর্ণমনা তারাই উপকার করে অপরকে খোঁটা দেয়। আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না বলে হাদীসে এসেছে। আবু যর (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, তিন শ্রেণির লোকের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না। খোঁটাদানকারী; সে যা কিছু দান সদকা করে পরক্ষণেই তার খোঁটা দেয়। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রি করে এবং যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে বা পরিধান করে।[৩৪৩]

---

৩৪১. *আল কুরআন*, ২ : ২৬২
৩৪২. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৪
৩৪৩. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২০২

মুসলিম শরিফের আরেকটি হাদিসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পাপমুক্ত করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। এই তিনজন হচ্ছে, পায়ের গিরার নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী, অনুগ্রহ ও দান-দক্ষিণার পর খোঁটাদাতা ও প্রচারকারী এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্যসামগ্রী বিক্রয়কারী।

তাই কাউকে উপকার করতে চাইলে, নিঃস্বার্থভাবেই করবো। উপকার করে খোঁটা দিতে যাবো না। নিজের ব্যক্তিত্ব ছোট করার পাশাপাশি উপকারের সওয়াব নষ্ট করবো না। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

খোঁটা দেওয়ার কুফল :

ইসলামে পরোপকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঈমানের দাবি এবং আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পসন্দনীয় কাজ। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ-

"যে ব্যক্তি মানুষের বেশি উপকার করে, সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ।"

মানুষের উপকার করা যায় বিভিন্নভাবে। অর্থ দিয়ে, শক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে এবং বিদ্যা দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা একেকজনকে একেকরকম যোগ্যতা দিয়েছেন। যার যেই যোগ্যতা আছে, সে যদি তার সেই যোগ্যতাকে সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করে, তবেই তার সেই যোগ্যতা সার্থক হয়। এর দ্বারা সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে সাফল্যমন্ডিত হয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে- কোনও যোগ্যতা দেনই এজন্যে যে, সে তা মানব-সেবায় নিয়োজিত করে নিজ জীবনকে সফল করে তুলবে। পরোপকার যে পন্থায়ই করা হোক, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা কবুল হওয়া এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজরূপে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল- ইখলাস থাকা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে করা এবং পার্থিব কোনও উদ্দেশ্য না থাকা। পার্থিব উদ্দেশ্য বলতে- যার উপকার করা হল তার কাছ থেকে কোনও বদলা পাওয়া কিংবা সুনাম-সুখ্যাতি লাভ করা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করা বা অন্য কোনও রকমের সুবিধাভোগ হতে পারে। মু'মিনের পরোপকার এইসকল উপসর্গ থেকে মুক্ত হওয়া জরুরি।

তার প্রাণের কথা হবে-

.اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا-

অর্থ : 'আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আমরা তোমাদের কাছে কোনও প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।'[৩৪৪]

মু'মিন তো এই ভেবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে যে, আল্লাহর দেওয়া জান-মাল ও আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান-বুদ্ধিকে সে আল্লাহর বান্দার সেবায় ব্যয় করতে পারছে। এ ব্যয়ের লাভ তো শেষটায় নিজের ভাগেই আসবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো মেহেরবানী করে তার প্রদত্ত জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে তার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

. اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ-

অর্থ : 'আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে- এর বিনিময়ে।'[৩৪৫]

এক হাদীসে আছে-

مَنْ نَّفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَّسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِىْ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَه اللهُ فِىْ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اللهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ-

'যে ব্যক্তি কোনও মু'মিনের দুনিয়াবী সংকটসমূহ থেকে একটা সংকট মোচন করে দেওয়া, আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের সংকটসমূহের একটা সংকট মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোনও অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখিরাতে স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। যে ব্যক্তি কোনও মুসলিমের দোষ-গুণ গোপন করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।'[৩৪৬]

---

৩৪৪. *আল কুরআন*, ৭৬ : ৯
৩৪৫. *আল কুরআন*, ৯ : ১১১
৩৪৬. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২৬৯৯

এ হাদীস জানাচ্ছে- পরোপকারের লাভ কেবল আখিরাতেই নয়, দুনিয়ায়ও পাওয়া যায়। তবে তা পাওয়া যায় কেবল তখনই, যখন লক্ষবস্তু হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি। যে ব্যক্তি পরোপকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য, পার্থিব স্বার্থে নয়, সে কখনও এদিকে লক্ষ করে না যে, সে যার উপকার করেছে তার পক্ষ হতে কি রকম আচরণ পাচ্ছে। তাই তার খোঁটা দেওয়ারও কোনও অবকাশ আসে না। খোঁটা দিতে পারে তো কেবল সেই, যে উপকার করে পার্থিব প্রাপ্তির আশায়। সে যখন তার আশানুরূপ ফল না পায়, তখন হতাশ হয়। সেই হতাশারই প্রকাশ ঘটে খোঁটাদানের মাধ্যমে।

অনেক সময় ইখলাসের সংগে উপকার করার পরও নগদপ্রাপ্তির দিকে নজর চলে যায়। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিনিময় তার পাওয়ার ছিল, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। কাজেই পরোপকারের সুফল লাভের জন্য শুরুর ইখলাসই যথেষ্ট নয়, পরবর্তী সময়ে সেই ইখলাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকাও জরুরি। অন্যথায় তার ইখলাসের সংগে কৃত পরোপকারও নিষ্ফল হয়ে যায়। তাইতো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

অর্থ : 'যারা নিজ সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে আর ব্যয় করার পর খোঁটা দেয় না এবং কোনও কষ্টও দেয় না, তারা নিজ প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রতিদান পাবে। তাদের কোনও ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'[৩৪৭]

এ আয়াতে জানানো হচ্ছে- আল্লাহর পথে কৃত ব্যয়ের সুফল লাভের জন্যে শর্ত হল, পরবর্তীকালে সেই দানের জন্য কোনওরূপ খোঁটা না দেওয়া এবং কোনও কষ্ট না দেওয়া। বলা বাহুল্য, কোনও দান আল্লাহর পথে হয় তখনই, যখন তাতে ইখলাস থাকে। তাহলে এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, কেবল দানকালীন ইখলাসই যথেষ্ট নয়, বরং দানের পরও ইখলাস রক্ষা জরুরি। খোঁটা দেওয়া ইখলাসের পরিপন্থী। কেননা খোঁটা দেওয়াই হয় পার্থিব প্রত্যাশা পূরণ না হলে।

---

৩৪৭. *আল কুরআন*, ২ : ২৬২

খোঁটা দ্বারা কেবল দান-খয়রাত ও পরোপকারের সওয়াবই নষ্ট হয় না; বরং এটা একটা কঠিন পাপও বটে। কেননা এর দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির অন্তরে আঘাত দেওয়া হয়। মানুষের মনে আঘাত দেওয়া কবীরা গুনাহ। সুতরাং খোঁটা দেওয়া ইসলাম ও ঈমানের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। কেননা মুসলিম বলাই হয় তাকে, যার হাত ও মুখ থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।[৩৪৮]

আর মু'মিন সেই, যার ক্ষতি থেকে সকল মানুষ নিরাপদ থাকে।[৩৪৯]

এজন্যেই খোঁটা দেওয়াকে কুরআন মাজীদে কাফের-বেঈমানের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ-

অর্থ : 'হে মু'মিনগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-সদকাকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করো না, যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত এরকম, যেমন এক মসৃণ পাথরের উপরে মাটি জমে আছে, অত:পর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ে এবং তা সেই মাটিকে ধুয় নিয়ে যায় এবং সেটিকে পুনরায় মসৃণ পাথর বানিয়ে দেয়। এরূপ লোক যা উপার্জন করে, তার কিছুমাত্র তারা হস্তগত করতে পারে না। আর আল্লাহ এরূপ কাফেরদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।'[৩৫০]

অর্থাৎ খোঁটা দেওয়া কাফেরদেরই বৈশিষ্ট্য। তারা যেহেতু আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাই সওয়াবেরও কোনও আশা থাকে না। আশা থাকে কেবল নগদপ্রাপ্তি। হয় সে ব্যক্তি তাকে আরও বেশি দেবে, নয় তার অনুরূপ উপকার তারও করবে। অন্ততপক্ষে তার গুণগান করে তো বেড়াবেই। যখন এর কোনওটা পায় না, তখন মনে করে- বৃথাই টাকা-পয়সা নষ্ট করল। এভাবে সে হতাশার শিকার হয় আর নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি বলে গালাগাল করে। এখন মু'মিন-ব্যক্তিও যদি খোঁটা দিয়ে বসে, তবে তা কাফেরসুলভ আচরণই হল। এর দ্বারা প্রমাণ হবে- দান বা উপকার করার সময়

৩৪৮. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১০
৩৪৯. *মুসনাদ আহমাদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস- ১২৫৬১
৩৫০. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৪

আল্লাহর সন্তুষ্টি তার উদ্দেশ্য ছিল না। যেমন কাফের ব্যক্তির সেরকম উদ্দেশ্য থাকে না। আর যে দান-খয়রাত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হয় না, তার পরিণাম সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- অথবা প্রমাণ হবে- উপকার করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকলেও পরবর্তী সময়ে সেই উদ্দেশ্যের উপর সুদৃঢ় থাকতে পারেনি। নজর চলে গেছে নগদপ্রাপ্তির দিকে। ফলে যেই সওয়াব তার পাওয়ার ছিল, তা তো বরবাদ করে ফেলেছেই, উপরন্তু আমলনামায় কবীরা গুনাহ যোগ করেছে। কেননা নগদ-বদলা না পাওয়ার কারণে সে তাকে খোঁটা দিয়েছে, অকৃতজ্ঞ বলেছে। এভাবে তার মনে কঠিন আঘাত দিয়েছে।

যে ব্যক্তি কারও উপকার নেয়, সে এমনিতেই মানসিকভাবে দুর্বল থাকে। তার উপর যদি খোঁটা দেওয়া হয়, তবে তা তার অন্তরে রীতিমত রক্তক্ষরণ ঘটায়। সেই রক্তক্ষরণের বিপরীতে তার দান-খয়রাত ও উপকার কোনও ধর্তব্যেই আসে না। বরং আঘাতের উৎপত্তি যেহেতু ঐ উপকার থেকে, তাই উপকারটাও উপকৃত ব্যক্তির পক্ষে হয়ে যায় এক পাষাণ ভার। যেন এই উপকার না করাই তার পক্ষে ভালো ছিল। তাই তো বর্ণিত হয়েছে-

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَ اللهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ-.

অর্থ : 'উত্তম কথা বলে দেওয়া ও ক্ষমা করা সেই দান-সদকা অপেক্ষা শ্রেয়, যার পর কোনও কষ্ট দেওয়া হয়। আল্লাহ অতি বেনিয়ায ও সহনশীল।'[৩৫১]

অর্থাৎ কেউ যদি কারও কাছে কোনও সাহায্য চায় এবং সে কোনও কারণে তা করতে না পারে, তবে তার উচিত নম্র ও ভদ্র ভাষায় তাকে জবাব দিয়ে দেওয়া। আর যদি অনুচিত পীড়াপীড়ি করে, সেজন্য তাকে ক্ষমা করা। আর এভাবে নম্রকথা বলে বিদায় করা ও ক্ষমা করা সেই দান অপেক্ষা বহু শ্রেয়, যে দানের পর খোঁটা দেওয়া হয় কিংবা অপমান করে কষ্ট দেওয়া হয়।

খোঁটা দেওয়া যে কত গর্হিত এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে কত ঘৃণ্য, হযরত আবূ যর (রাযি.)-এর একটি হাদীস দ্বারা তা অনুমান করা যায়।

৩৫১. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৩

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বর্ণনা করেন-

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثُ مِرَارٍ، قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ : خَابُوْا وَ خَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : اَلْمُسْبِلُ وَ الْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَه بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ-

‘তিন ব্যক্তি এমন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা যাদের সংগে কথা বলবেন না, তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আবূ যর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এ কথাটি তিন-তিনবার বললেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা, তারা তো সর্বস্বান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল? তিনি বললেন, (ক) যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপডর টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখে; (খ) যে ব্যক্তি উপকার করার পর খোঁটা দেয় এবং (গ) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য চালায়।’[৩৫২]

খোঁটা দেওয়া যে কত গুরুতর অপরাধ, এ হাদীস দ্বারা তা আঁচ করা যায়। বস্তুত খোঁটাদানকারী নিজেকে মহানুভবতার উচ্চস্তর থেকে হীনতার গভীর খাদে নামিয়ে আনে। যে পরোপকার করে, সে তা আলণ্ঢাহর খলীফা হিসেবেই করে। সৃষ্টির উপর তার হাত যেন আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের হাত। এরূপ হাত সম্পর্কে হাদীস বলছে-

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ الْيَدِ السُّفْلٰى-

‘উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।’[৩৫৩]

অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহিতার হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খোঁটা দ্বারা দান-উপকারের এই মহিমা নষ্ট হয়। কারণ বিনিময়ের আশাবাদী হওয়ার কারণে সে আর আল্লাহর প্রতিনিধি থাকে না। বাহ্যদৃষ্টিতে সে উপকারকারী হলেও প্রকৃতপক্ষে সে উপকারলাভের ভিখারী। সে উপকার করেছিল স্বার্থচিন্তায় তাড়িত হয়ে। কিংবা উপকার করার পর এখন সেই তাড়না বোধ করছে। সে তার উপকারকে ছলনার স্তরে নামিয়ে এনেছে। শিকারী যেমন সশ্যদানা ছিটিয়ে পাখি বা মাছ শিকার করে, তেমনি সেও উপকারের দানা ছিটিয়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিল করতে চায়। তার হাত আর উপরের হাত থাকল না। নিচের হাত

৩৫২. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১০৬
৩৫৩. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১৪২৭

হয়ে গেল। বান্দার সব আশা ও চাওয়া-পাওয়া তো হবে কেবল আল্লাহরই কাছে। কিন্তু খোঁটা দেওয়ার দ্বারা প্রমাণ হয়- সে মাখলূকের কাছে আশাবাদী ছিল। মাখলূকের কাছে আশাবাদ মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে খর্ব করে এবং দৃষ্টিকে করে সংকীর্ণ। মাখলূক কতটুকুই বা দিতে পারে! অথচ আসমান-যমীনের মালিক দান-উপকারের যে বিনিময় ঘোষণা করেছেন, তা সৃষ্টির কল্পনারও অতীত।

খোঁটা দেওয়া একরকম অহমিকাও বটে। কারণ এর দ্বারা সে যাকে উপকার করেছে, তাকে নিজ কৃপাধন্য মনে করে। তাকে হীন ও ছোট ভাবে। অথচ দান-উপকার করা চাই ব্যক্তির মান-সমভ্রমের প্রতি লক্ষ্য রেখেই। অসম্ভব কি আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশেষ কোনও আমলের কারণে সে তার মত বহু দান-খয়রাতকারী অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা রাখে। তাই উপকার করা উচিত সেবার মানসিকতা নিয়ে। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে। ভাবা উচিত তাকে উপকার করে প্রকৃতপক্ষে নিজে উপকৃত হচ্ছে। দান-উপকার গ্রহণ করে সে তাকে আল্লাহর কাছে বিপুল মর্যাদালাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। যেই উপকারের সাথে এরকম মানসিকতা থাকে, খোঁটা দেওয়ার মত হীনতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আসলে খোঁটা দেওয়া একরকম ধৃষ্টতা। কারণ মানুষ খোঁটা কেবল তখনই দেয়, যখন উপকার করতে পারাকে নিজ কৃতিত্ব গণ্য করে, আল্লাহর দান ও তাওফীকের দিকে দৃষ্টি না থাকে। কেবল সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকলেই তো উপকার করা যায় না। এর জন্য আল্লাহর তাওফীকের দরকার হয়। দান করার পরে খোঁটা দিলে সেই তাওফীকের অমর্যাদা করা হয় এবং করা হয় অকৃতজ্ঞতা। এই অকৃতজ্ঞতা ও ধৃষ্টতার কারণেই তো কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ তা'আলার সুদৃষ্টি, সুবাক্য ও পরিশোধন থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তাকে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। যেমনটা উপরের হাদীসে ঘোষিত হয়েছে। খোঁটা দেওয়ারই পরিণতি যে, যার উপকার করা হয়, একসময় তার ও উপকারকারীর মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এটা এখন এমনই ব্যাপক যে, বলাই হয়ে থাকে- তুমি কারও উপকার করলে প্রস্তুত থেকো একদিন সে তোমার অপকার করবে। আসলে এটা উপকার করার দোষ নয়; বরং খোঁটা দেওয়া ও নিয়ত সহীহ না থাকার পরিণাম। নিয়ত সহীহ না থাকলে বিনিময়ের প্রত্যাশা থাকে। প্রত্যাশা অনুযায়ী সেই বিনিময় না পেলে খোঁটা দেওয়া হয়। যার পরিণামে সৃষ্টি হয় মনোমালিন্য। একপর্যায়ে তা শত্রুতায় গড়ায়। আর তখন ভাবা হয়, এটা সেই উপকার করার পরিণাম।

অথচ সহীহ নিয়তে উপকার করলে শত্রুতা সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না; বরং শত্রুর সংগেও ভালো ব্যবহার করলে, তার কোনও উপকার করলে এবং আদর-আপ্যায়ন করলে সে বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে বলেন-

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ-

অর্থ : 'ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দের জবাব দাও ভালোর দ্বারা। তাহলে যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সহসাই সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।'[৩৫৪]

বহু হাদীস দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতাও তাই বলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রাযি.) বলেন, "আমি যে- কোনও ব্যক্তির উপকার করেছি। পরে দেখা গেছে তার ও আমার মধ্যে এক স্নিগ্ধময় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর যার প্রতি কখনও আমার দ্বারা মন্দ ব্যবহার হয়ে গেছে, পরে দেখতে পেয়েছি- তার ও আমার মধ্যে সম্পর্কে মলিনতা সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং দান-খয়রাত ও উপকার করার পরিণাম কখনও খারাপ হতেই পারে না, যদি তাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য থাকে এবং পরে কোনও রকম খোঁটা ও কষ্টদান না করা হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, উপকার ও দান-খয়রাত করার পর খোঁটা দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এটা একটি মহাপাপ এবং বহু দোষের আকর। সর্বোপরি এটা ঈমান ও ইসলামের চেতনা-পরিপন্থী কাজ ও কাফের-বেঈমানদের বৈশিষ্ট্য। মু'মিনমাত্রেরই এর থেকে বিরত থাকা অবশ্য-কর্তব্য। উপড়ন্তু উপকার করা অপেক্ষা কৃত উপকারকে হেফাজত করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এমনিতে উপকার করা তো একটি নফল কাজ, কিন্তু তার হেফাজত করা ফরয এবং নষ্ট করা মহাপাপ। সেই হেফাজতের জন্যই কর্তব্য খোঁটাদান থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى-

অর্থ : 'হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের দান-সদকাকে পন্ডকরো না খোঁটাদান ও কষ্ট দেওয়ার দ্বারা।'[৩৫৫]

---

৩৫৪. *আল কুরআন*, ৪১ : ৩৪
৩৫৫. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৪

কারও উপকার করার পরে কোনও অবস্থাতেই যাতে খোঁটাদানের অপরাধ ঘটে না যায়, সেজন্যে কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে।

১. উপকার করার সময় এবং তার পরও আলণ্ডাহ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের চেতনাকে অন্তরে জাগ্রত রাখা। কিছুতেই পার্থিব কোনও বিনিময়ের আশাবাদী না হওয়া। সে বিনিময় বৈষয়িক হোক বা সুনাম-সুখ্যাতি হোক কিংবা হোক উপকৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

২. যার উপকার করা হবে, উপকার করার সময়ও এবং তার পরও তার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা। মনে করতে হবে প্রকৃতপক্ষে সেই আমার উপকারকারী। কেননা আমার কাছে সাহায্য চেয়ে এবং আমার উপকার গ্রহণ করে সে আমাকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযি.)-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

"আমি তিন ব্যক্তির বদলা দিতে সক্ষম নই। (ক) যে আমাকে প্রথম সালাম দেয়; (খ) যে আমাকে মজলিসে বসার সুযোগ করে দেয় এবং (গ) যে সালাম-কালামের ইচ্ছায় আমার কাছে আসার জন্যে নিজ পদযুগলকে ধুলোমলিন করে। আর চতুর্থ এক ব্যক্তি আছে- আমার পক্ষ থেকে এক আল- াহ ছাড়া আর কেউ তাকে বদলা দিতে পারবে না। জিজ্ঞেস করা হল, সে কে? তিনি বললেন- ওই ব্যক্তি, যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তারপর সারা রাত চিন্তা করেছে সাহায্যের জন্য কার কাছে যাবে। অবশেষে আমাকেই তার উপযুক্ত মনে করল এবং আমার কাছে এসে তার সেই মসিবতের কথা বলল।" অর্থাৎ কোনও বিপন্ন ব্যক্তি যদি সাহায্যের আশায় কারও কাছে যায়, তবে এটা তার প্রতি সেই ব্যক্তির বিশেষ আস্থা এবং তাকে বিশেষ মর্যাদা দানেরই পরিচয় বহন করে। এর মাহাত্ম্য অনুধাবন করা উচিত।

৩. নিজের দান-খয়রাত ও উপকারকে ক্ষুদ্র গণ্য করা। অর্থাৎ কল্পনা করতে হবে যে, তার যা প্রয়োজন সে অনুপাতে আমি অতি সামান্যই করতে পারছি এবং আমার যা করণীয় ছিল, সে অনুযায়ী যা করছি তা খুবই নগণ্য। আর খোদা না করুন, যদি এটা কবুল না হয়, তবে তো নিতান্তই তুচ্ছ। মানুষ মানুষের উপকারার্থে কতকিছুই করছে। সে হিসেবে আমি যা করছি তা কোনও ধর্তব্যেই আসে না। কথাটিকে এভাবে বলা যায় যে, দান করার সময় তা করতে হবে বিনয়ের সংগে এবং পরেও সেই বিনয়ভাব বজায় রাখা চাই।

৪. উপকারের বিষয়টাকে গোপন রাখা। অর্থাৎ যার যেই উপকার করা হবে, যথাসম্ভব তা গোপন রাখার চেষ্টা করতে হবে। কেননা প্রকাশ করলে যেমন ইখলাস নষ্ট হতে পারে, তেমনি তা একরকম খোঁটায়ও পর্যবসিত হবার আশংকা থাকে। কেননা উপকারের কথা যদি প্রচার করে বেড়ানো হয় আর এভাবে তা তার কানে গিয়ে পৌঁছায়, তবে তা তার জন্যে নিশ্চিত পীড়াদায়ক হবে। এটাও একরকম খোঁটাই বটে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস স্মরণ রাখা যেতে পারে। তাতে সাত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে; হাশরের ময়দানে তারা আরশের ছায়াতলে জায়গা পাবে। তার মধ্যে এক ব্যক্তি হল-

رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُه مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُه-

'ঐ ব্যক্তি, যে কোনও দান-সদকা করে এবং তা গোপন রাখে এমনকি তার বামহাত জানে না ডানহাত কী খরচ করে।'[৩৫৬]

৫. উপকার করার কথা ভুলে যাওয়া। জনৈক ব্যক্তি তার সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিল- তোমরা যদি কারও কোনও উপকার করো, তবে তা ভুলে যেতো। কেননা তা স্মরণ রাখলে খোঁটা দেওয়ার আশংকা থেকে যায়। আর খোঁটা দিলে উপকার নিষ্ফল হয়ে যায়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, উপকৃত ব্যক্তিরও তো কর্তব্য উপকারকারীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَه فَادْعُوْا لَه-.

'যে ব্যক্তি তোমাদের কোনও উপকার করে, তোমরা তার বদলা দিও। যদি বদলা দেওয়ার মত কিছু না পাও, তার জন্য দু'আ করো।'[৩৫৭]

তো কেউ যদি উপকার গ্রহণ করার পরে বদলা না দেয় বা দু'আ না করে, এককথায় কৃতজ্ঞতা না জানায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই খোঁটার ব্যাপারটা এসে যায় না কি? উত্তর হল, এটা সম্পূর্ণই তার ব্যাপার। উপকার লাভের পরে কৃতজ্ঞতা না জানালে সে দ্বীনের শিক্ষা অমান্য করল। এজন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি উপকার করল, তাকে বলা হয়নি যে, তুমি তার কৃতজ্ঞতার অপেক্ষায় থেকো।

---

৩৫৬. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৬৬০
৩৫৭. *সুনানে আবু দাউদ*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১৬৭২

বরং তাকে যেই চেতনার শিক্ষা দেওয়া হয়য়েছে, তা হচ্ছে-

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا-.

অর্থ : 'আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে। আমরা তোমাদের কাছে কোনও প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।'[৩৫৮]

সুতরাং সে কৃতজ্ঞতা না জানালে খোঁটা দেওয়ার অবকাশ আসবে কেন? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সবরকম জাহেরী ও বাতেনী ফিতনা থেকে রক্ষা করুন এবং সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন- আমীন।

উপকার করে খোটা দিলে সওয়াব নষ্ট হয়ে যায় :

ইসলামে কারো উপকার করে খোটা দেয়া হারাম। এর মাধ্যমে উপকারের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অত:পর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অত:পর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল।[৩৫৯]

রাসূল (স.) বলেছেন-

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ-

"সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে উপকার করে খোঁটা দেয়।"[৩৬০]

---

৩৫৮. *আল কুরআন*, ৭৬ : ৯

৩৫৯. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৪

৩৬০. আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন নাসাঈ (রহ.), *সুনান আন নাসাঈ*, অনু : আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল-২০১৩),হাদীস নং-৫৬৮৮

আপনি কাউকে দান করে, ঋণ দিয়ে বা কোন উপকার করে তাকে বলেন, তোমার কি মনে নেই আমি তোমাকে দান করেছিলাম, এই এই উপকার করেছিলাম? এটাকেই খাোটা বলা হয়। এর মাধ্যমে আপনার দান-সদকা বা উপকার করার সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে।

আপনি যার উপরকার করেছেন সে যদি আপনার সাথে খারাপ আচরণ করে বা আপনার ক্ষতি করে তাহলে এ জন্য সে গুনাহগার হবে। আপনি ধৈর্য ও সহশীলতার সাথে তার মোকাবেলা করবেন। কিন্তু আপনি যে তার উপকার করেছেন সেটা তুলে ধরে নিজ গুনাহগার হবে না বা নিজের আমল নষ্ট করতে যাবেন না। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। দানের কথা মনে করিয়ে খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে বরবাদ করে দিয়ো না দান করে তারপর খোঁটা দেওয়া, কথা শোনানো কতটা খারাপ, তা আল্লাহ তা'আলা আবারো আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

বিশ্বাসীরা শোনো, দানের কথা মনে করিয়ে খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে বরবাদ করে দিয়ো না, সেই লোকের মত, যে কিনা দান করে মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না। ওর উদাহরণ হলো একটা বড় পাথরের মতো, যার উপরে কিছুটা মাটির আস্তর জমে, কিন্তু তারপর ভারি বৃষ্টি এসে সব মাটি ধুয়ে আবার খালি পাথর রেখে যায়। সে যা অর্জন করলো, তার কিছুই তার আর কাজে লাগলো না। আল্লাহ অবিশ্বাসী লোকদের পথ দেখান না।[৩৬১]

"দেখেন ভাবি, বুয়াকে এই ঈদে এই নতুন কাপড়টা কিনে দিয়েছি। ও সবসময় পুরনো ছেড়া একটা কাপড় পড়ে আসতো। এখন ওকে কত ভালো দেখাচ্ছে না?" অথবা, "ভাই সাহেব, আপনাকে আমি অনেকদিন থেকে সাহায্য করে আসছি। এবার আপনি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন, নাকি? আপনি কি সারাজীবন আমার ঘাড়ে ঝুলে থাকবেন?" অনেক সময় আমরা যাদেরকে দান করি, তাদেরকে নানা ভাবে কষ্ট দিই। তাদের অভাবের কথা বার বার মনে করিয়ে দিই। তাদেরকে যে আমি কত উপকার করছি, সেটা সুযোগ পেলেই জানান দিই। তাদের কাছ থেকে ফুটফরমাশ একটু কম পেলেই দানের কথা মনে করিয়ে দিই, যেন সে আমার দানের প্রতিদান দিতে কোনো গাফিলতি না করে। এসব করে আমরা আমাদের দানকে পুরোপুরি বাতিল করে দিই।

---

৩৬১. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৪

আল্লাহ তা'আলা একটা কঠিন উপমা দিয়েছেন। যারা মানুষকে দান করে তারপর অন্যের সামনে সেটা বলে বেড়ায়, শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি রাখার কথা ভুলে যায় অথবা আল্লাহকে খুশি করাটা তাদের আসল উদ্দেশ্য থাকে না, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এক বড় পাথরের সাথে তুলনা করেছেন। পাথরের শক্ত আবরণে একসময় একটু মাটির আস্তর পড়ে, একটু নরম হয়। কিন্তু তারপর এক বৃষ্টি এসে সেই নরম মাটির স্তর ধুয়ে দেয়, আবার পাথরের শক্ত আবরণ বের হয়ে যায়। এভাবে আমাদের পাথরের অন্তরটাকে আমরা দান করে একটু নরম করি, তারপর সেটা মানুষকে বলে বেড়িয়ে আবার রুক্ষ পাথরে ফিরে যাই। যা অর্জন করেছিলাম, যা সব ধুয়ে শেষ হয়ে যায়।

যেসব মানুষ আখিরাতের প্রতিদানে গভীর বিশ্বাস রাখে না, শুধু তারাই দান করে সেটা মানুষকে বলে বেড়ানোর মত জঘন্য কাজ করতে পারে। আর যে অভাবী মানুষকে দান করে তারপর তাকে কথা শোনায়, কষ্ট দেয়, তার মত পাষাণ মানুষের আখিরাতে বিশ্বাস থাকতে পারে না। আখিরাতের বিচারে এবং প্রতিদানে যদি কারও বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে ভুলেও কোনোদিন তার দানের কথা বলে বেড়াতে যাবে না। আর যাকে দান করেছে, তাকে সেটা মনে করিয়ে দেওয়া, বা তাকে কোনো ধরণের কষ্ট দিয়ে দানের সওয়াব বাতিল করে দেওয়ার মত বোকামি করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আয়াতের শেষ অংশটি ভয়ংকর, “আল্লাহ অবিশ্বাসী লোকদের পথ দেখান না।”অবিশ্বাসী বা কাফির শব্দটা খুবই কঠিন শব্দ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে আমাদেরকে শেখাচ্ছেন যে, যাদের কাছে দান করাটা লোক দেখানো কাজ, যারা মানুষকে দান করে তারপর কষ্ট দেয়, এরা আসলে আল্লাহকে এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে না। কারণ যদি এরা আল্লাহ তা'আলা এবং আখিরাতে বিশ্বাস করতই, তাহলে তারা কোনোদিন এই কাজ করত না। আরা যারা আল্লাহ তা'আলা এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা হচ্ছে অবিশ্বাসী। এদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথ দেখাবেন না। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পথ দেখাবেন না, তাদের পরিণতি জাহান্নাম। আর যে আল্লাহকে খুশি করার আশায় এবং নিজের বিশ্বাসকে মজবুত রাখার জন্য তার সম্পদ খরচ করে, তার উপমা হলো উঁচু ভূমিতে গাছে ঘেরা এক ঘন সবুজ বাগানের মতো, যেখানে ভারি বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফলন হয়।

আর ভারি বৃষ্টি যদি না-ও হয়, হাল্কা ঝিরঝির বৃষ্টিই তার জন্য যথেষ্ট। তোমরা যা কিছুই করো, আল্লাহ তার সব দেখেন।[৩৬২]

আমাদের দানের উদ্দেশ্য যেন হয় শুধুই আল্লাহর তা'আলা সন্তুষ্টি পাওয়ার আন্তরিক আকাঙ্খা। যারা আন্তরিক আকাঙ্খা থেকে তার সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত অর্থাৎ এক ঘন গাছের ছায়ায় ঘেরা বাগানের সাথে তুলনা করেছেন, যেটা আবার উঁচু ভূমিতে উর্বর জমিতে গড়ে উঠেছে। উঁচু ভূমির কারণে সেটি সুরক্ষিত, নিরাপদ। সেখানে ভারি বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফলন হয়। আবার হাল্কা ঝিরঝির বৃষ্টি হলেও ফলন হয়। এই উপমাটার মানে হলো যে, কত বেশি দান করলো সেটা কোনো ব্যাপার না। টাকার পরিমাণের সাথে পুরস্কারের কোনো সম্পর্ক নেই। আসল ব্যাপার হচ্ছে আন্তরিকতা, আল্লাহকে খুশি করার ইচ্ছা।

এই আয়াতে একটি ব্যাপার লক্ষ করার মতো, "নিজের বিশ্বাসকে মজবুত রাখার জন্য তার সম্পদ খরচ করে"বিশ্বাসীরা দান করে তাদের অন্তরকে শক্তিশালী করার জন্য। কারণ ঘরে বসে নামাজ, রোজা করা সোজা কাজ। কিন্তু নিজের কষ্টের সম্পদ কাউকে দান করা কঠিন ব্যাপার। দান করতে গেলেই মাথার মধ্যে হাজারো চিন্তা শুরু হয়ে যায়, "যদি দান করি তাহলে বাচ্চার পড়ার খরচের জন্য টাকা থাকবে? আগামী কয়েকমাস বাড়ি ভাড়া দিতে পারবো? পরিবারের কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার টাকা কীভাবে দেব? গাড়ি-বাড়ি কেনার জন্য টাকা জমাবো কীভাবে?" আর যখনি আমরা কোনো দান করার পরিস্থিতিতে পড়ি, তখনি আমরা একেক জন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হয়ে যাই। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের যাবতীয় সম্পদ, বিনিয়োগ এবং ঝুঁকির হিসাব মাথার মধ্যে গিজগিজ করতে থাকে।

একারণেই যারা নিজের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত দান করতে পারেন, তাদের বিশ্বাস মজবুত হয়ে যায়, তাদের অন্তর শক্তিশালী হয়ে যায়। তাদের ভেতরে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। যেমন, আল্লাহর প্রতি আস্থা বেড়ে যায়, ভবিষ্যৎ নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করা কমে যায়, অমূলক ভয়-ভীতিকে তারা জয় করেন, নেতিবাচক চিন্তা কমে যায়, অন্যের প্রতি আত্মত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি হয়, সহমর্মিতা বোধ বাড়ে।

৩৬২. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৫

একারণেই যারা নিয়মিত দান করেন, তাদের অন্তর মজবুত হয়, অল্পতেই মন ভেঙ্গে পড়ে না। দান করাটা হচ্ছে কঠিন পরিস্থিতিতেও অন্তরকে আল্লাহর আদেশ মানানোর জন্য এক ধরনের ট্রেনিং। দুর্ভিক্ষ, মহামারি বা কষ্টের সময় মানুষকে দান করা, যখন কিনা নিজেরই অভাব চলছে, আত্মীয়দেরকে দান করা যাদের সাথে সম্পর্ক ভালো না এগুলো বেশ কঠিন কাজ। এগুলো আমাদেরকে সহজ, আরামের ইবাদতের গন্ডি থেকে বের করে, কঠিন পরিস্থিতিতেও আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা, তাঁর আদেশ মেনে চলার ট্রেনিং দেয়।

তোমাদের মধ্যে কেউ কি চাইবে যে, তার একটি গাছে ঘেরা ঘন সবুজ বাগান থাকুক, আঙুর এবং খেজুরে ভরা, যার ভেতর দিয়ে ঝর্ণা ধারা বয়ে যায়, যেখানে সব ধরনের ফল-ফসল হয়, আর সে একসময় বয়সের ভারে নুয়ে পড়ুক এবং তার সন্তানগুলোও হোক দুর্বল? তারপর এক আগুনের ঘূর্ণি এসে সব জ্বালিয়ে পুরিয়ে ছারখার করে দিক? এভাবেই আল্লাহ তোমাদেরকে তার বাণী পরিষ্কার করে দেন, যেন তোমরা চিন্তাভাবনা করো।[৩৬৩]

এখানে আরবদের জন্য আদর্শ বাগানের উপমা দেওয়া হয়েছে। এই বাগানের চারদিকের সীমানায় রয়েছে মজবুত খেজুর গাছের সারি, যা একধরনের প্রাচীর হিসেবে কাজ করে, বাগানকে পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। একইসাথে তা মরুভূমির তপ্ত বায়ুর প্রবাহ থেকে ভেতরটাকে রক্ষা করে। এর ছায়ায় গড়ে উঠেছে আঙুরের লতাময় গাছ, মাঝখানে নানাধরনের শস্য, ফলমূলের গাছ। একইসাথে সেটির ভেতরে দিয়ে পানির ধারা বয়ে যায়, যার কারণে কষ্ট করে সেচের পানির ব্যবস্থা করতে হয় না। ঘন সবুজ ছায়ায় ঘেরা একদম স্বপ্নের বাগান।

এই স্বপ্নের বাগানটা একটা আগুনের ঘূর্ণি এসে জ্বালিয়ে পুরিয়ে ছারখার করে দিলো। যদি মানুষটা বৃদ্ধ না হতো, তাহলে তার বাগান ধ্বংস হয়ে গেলেও সে আবার আরেকটা বাগান করে নিতে পারত। আবার যদি তার সন্তানরা সবল, সামর্থ্যবান হতো, তাহলে সেই সন্তানেরা আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারত, মানুষটার তখন আর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হতো না। কিন্তু লোকটার অবস্থা সব দিক থেকেই খারাপ।

---

৩৬৩. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৬

সে একে তো বৃদ্ধ, তার ওপর তার সন্তানরাও কোনো কাজের না। একারণে সে যখন তার এত কষ্টের বাগান হারিয়ে ফেলল, সে তখন একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গেলো। তার নিজের এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ শেষ। দান করে যারা মানুষকে নিজের উদারতার কথা বলে বেড়ায়, যাদেরকে দান করেছে, তাদেরকে কষ্ট দেয়, তাদের অবস্থা হচ্ছে এই রকম সর্বহারা মানুষের মতো। এদের সম্পদ চলে গেলো, সওয়াব চলে গেলো এবং এরা আল্লাহর কাছে ঘৃণিত হয়ে গেলো। এরা সবদিক থেকে নিঃস্ব, পরাজিত, অপমানিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিবাহ ও এর বিধান

বিবাহের শাব্দিক সংজ্ঞা :

নিকাহ তথা বিবাহের শাব্দিক অর্থ যৌন সঙ্গম, দু'টি জিনিস একত্রিত করা। কখনও কখনও নিকাহ বন্ধন বা চুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, (نكح فلانة) যখন কেউ বিয়ে করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার বলা হয়, (نكح امرأته) সে তার স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করল।

শরী'আতের পরিভাষায় বিবাহ :

عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع أو الازدواج أو المشاركة-

"নিকাহ হলো এমন একটি চুক্তি যাতে 'বিবাহ দেওয়া বা বিবাহ করা' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে উপভোগ বা একত্রে থাকা বা পরস্পর অংশীদার হওয়া বুঝায়"।

বিবাহ শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমত :

বিবাহ ইসলামের একটি অন্যতম সুন্নাত। রাসূল (স.) বিবাহ করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ-

"হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে। আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে; কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।"[৩৬৪]

৩৬৪. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৪৭৭৮

বিবাহের হিকমতের মধ্যে :

১. পারিবারিক সম্পর্ক বজায়, পরস্পর ভালোবাসা বিনিময়, আত্মসংযম ও হারাম কাজ থেকে নিজেকে হিফাযত করতে বিবাহ একটি উত্তম মাধ্যম ও উপায়।

২. (হালালভাবে) বংশ পরিক্রমা ঠিক রেখে সন্তান জন্ম দেওয়া ও বংশ বিস্তারে বিবাহ একটি উত্তম পদ্ধতি।

৩. নানা রোগ-ব্যাধিমুক্ত ও নিরাপদে মানুষের যৌন চাহিদা মিটাতে ও মনোবাসনা পূরণ করতে বিবাহ একটি সুন্দরতম পদ্ধতি।

৪. বিবাহের মাধ্যমে সন্তান লাভের দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের স্বাদ ভোগ করা যায়।

৫. বিবাহে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য শান্তির আবাস, প্রশান্তি, শালীনতা ও সচ্চরিত্র।

বিবাহের হুকুম :

যাদের যৌন চাহিদা রয়েছে তবে যিনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা নেই তাদের জন্য বিয়ে করা সুন্নাত। আর যাদের যিনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাদের জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। যাদের যৌন চাহিদা নেই যেমন, পুরুষত্বহীন ও বয়স্ক ইত্যাদি লোকের বিয়ে করা বৈধ। তবে প্রয়াজন না থাকলে যারা দারুল হরবে তথা যুদ্ধরত কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করেন তাদের জন্য বিয়ে করা হারাম।

বিবাহ সংঘটিত হওয়ার শব্দাবলি :

যেকোনো ভাষায় বিবাহ করা বা দেওয়া বুঝায় এমন সব শব্দে বিবাহ সংঘটিত হবে। যেমন বলা, (زوجت أو نكحت) আমি বিবাহ করলাম বা বিয়ে দিলাম। অথবা বলা, (قبلت هذا النكاح) আমি এ বিয়ে কবুল করলাম। অথবা (تزوجتها) আমি তাকে বিয়ে করলাম, বা (تزوجت) আমি বিয়ে করলাম, অথবা (رضيت) এ বিয়ে আমি রাজি আছি।

আরবি ভাষার শব্দ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। তবে যারা আরবি ভাষা জানেন না তারা তাদের ভাষায় প্রস্তাবনা ও কবুল করলেই বিয়ে সংঘটিত হবে।

বিবাহের রুকনসমূহ :

বিয়ের রুকন দু'টি। তা হলো :

১- প্রস্তাব (الإيجاب) : অলী তথা অভিভাবক অথবা যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন তার পক্ষ থেকে বিয়ে করার বা বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া। যিনি আরবি ভালো পারেন তার (إنكاح أو تزويج) শব্দ দ্বারা প্রস্তাব দেওয়া উত্তম। কেননা এ শব্দদ্বয় কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ-

“তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে।”[৩৬৫]

২- কবুল (القبول) : স্বামী বা তার স্থলাভিষিক্ত থেকে বিয়ে কবুল করার শব্দ। যেমন বলা, (قبلت) আমি বিয়ে কবুল করলাম বা (رضيت هذا النكاح) এ বিয়ে আমি রাজি আছি বা শুধু কবুল করেছি বলা। ইজাব তথা প্রস্তাব কবুলের আগে হতে হবে, তবে কোনো আলামত থাকলে আগে কবুল বললেও হবে।

বিবাহের শর্তাবলি :

বিয়ের শর্ত চারটি। তা হচ্ছে :

১. স্বামী-স্ত্রী নির্ধারিত হওয়া।

২. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকা। অতএব, স্বামী-স্ত্রী কাউকে জোর করে বিয়ে দেওয়া জায়েয নেই। কুমারী ও অকুমারী উভয়ের অনুমতি নিবে। কুমারীর চুপ থাকা তার অনুমতি দেওয়া আর অকুমারীর মৌখিক সম্মতি নিতে হবে। পাগল ও নির্বোধের ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয়।

৩. অভিভাবক : অভিভাবক পুরুষ, স্বাধীন, বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক), আকেল (জ্ঞানবান), বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। এছাড়া একই দ্বীনের অনুসারী হওয়াও শর্ত।

---

৩৬৫. *আল কুরআন*, ৪ : ৩

বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা তার অভিভাবক হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য, অতঃপর বাবার অসিয়তকৃত ব্যক্তি, অতঃপর তার দাদা, এভাবে উর্ধতন দাদারা, অতঃপর তার ছেলে ও নিম্নতম ছেলেরা, তার সহোদর ভাই, অতঃপর তার বৈমাত্রেয় ভাই, অতঃপর এসব ভাইয়ের ছেলেরা, অত:পর, আপন চাচা, অত:পর বৈমাত্রেয় চাচা, অত:পর তাদের সন্তানেরা, অত:পর বংশীয় নিকটাত্মীয়রা, অত:পর দেশের বাদশাহ অভিভাবক হবেন।

৪. সাক্ষ্য : ন্যায়পরায়ণ, পুরুষ ও শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য (প্রাপ্তবয়স্ক) এমন দুজন সাক্ষ্যের সাক্ষী ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হবে না।

৫. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিবাহ বন্ধনে শরী'আতের নিষেধাজ্ঞামুক্ত থাকা (অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া)।

বিবাহে যেসব কাজ সুন্নাত ও যেসব কাজ হারাম :

যে ব্যক্তি দীনদারিতা, ভিনদেশীয়তা, কুমারী, সন্তান ও সৌন্দর্য্যের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা বজায় রাখতে পারবে না তার জন্য একটি বিয়ে করা সুন্নাত। বিয়ের খিতবা তথা প্রস্তাব দেওয়া কন্যাকে সতর ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালোভাবে দেখা মুস্তাহাব, যাতে তাকে বিয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলে, তবে নির্জনে দেখতে পারবে না। এমনিভাবে কনেও হবু বরকে ভালোভাবে দেখা মুস্তাহাব। বিয়ের প্রস্তাবকারী বরের পক্ষে মেয়েকে দেখা সম্ভব না হলে সে একজন বিশ্বস্ত নারী পাঠাবে, তিনি ভালোভাবে দেখে তাকে মেয়ের গুণাবলি বর্ণনা করবে। কেউ কোনো মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলে উক্ত প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া বা তাকে দেখার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ উক্ত মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হারাম।

যেসব নারী তিন ত্বালাক ব্যতীত বায়েন ত্বালাকের ইদ্দত পালনরত তাদেরকে স্পষ্ট বা ইশারায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ। তবে রাজ'ঈ তালাকের ইদ্দত পালনকারী নারীকে স্পষ্ট বা ইশারায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। জুম'আর দিন (শুক্রবার) বিকেলে বিয়ে পড়ানো সুন্নাত। কেননা আসরের সালাতের পরের সময় দো'আ কবুল হয় এবং সম্ভব হলে মসজিদে বিয়ে পড়ানো সুন্নাত।

বিবাহ ও আদর্শ দম্পতি :

বিয়ে সব নবীর সুন্নত। পৃথিবীর সব ধর্ম ও জাতির মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোকে বিয়ে প্রচলিত রয়েছে। হাদীসে বিয়েকে ঈমানের অর্ধেক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বিয়ের ভূমিকা ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। কেননা একটি আদর্শ দম্পতিই একটি আদর্শ পরিবার নির্মাণ করতে পারে। এজন্য মা-বাবা এবং অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে গড়ে তোলা।

আদর্শ দম্পতি সৃষ্টি করার জন্য বিয়েকে সহজ করা অপরিহার্য। সন্তানের বিয়ের বয়স হলে দেরি না করে বিয়ে-শাদি সম্পন্ন করে দেওয়া। আমাদের সমাজে বিলম্বিত বিয়ে মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বিয়ের বয়স হওয়ার পরেও অকারণে কিংবা বিভিন্ন অজুহাতে, যেমন উচ্চশিক্ষা, ভালো চাকরি, উচ্চাকাঙ্খার পাত্র-পাত্রী ইত্যাদি কারণে সন্তানসন্ততির বিয়ে-শাদিতে অনেক কালক্ষেপণ করতে দেখা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী (স.) এর সঙ্গে আমরা কতক যুবক ছিলাম; আর আমাদের কোনো কিছু ছিল না।

এ অবস্থায় আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা বিয়ে করে নেবে। কারণ, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান সুরক্ষা করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে। কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।’[৩৬৬]

বিয়ে সহজ করা হয়েছে ইসলামে

পৃথিবীর ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার অন্যতম এক উপাদান বিয়ে। চারিত্রিক নিষ্কলুষতা টিকিয়ে রাখার উপায়ও এই বিয়ে। হাদীসের ভাষায়, বিয়েতে রয়েছে নানামুখী বরকত। এটি লজ্জাস্থান ও দৃষ্টি হেফাজতের সর্বোত্তম পন্থা। তবে বিয়ের বহুবিধ কল্যাণ থাকলেও বর্তমানে বিষয়টিকে কঠিন করে তোলা হয়েছে। বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে।

---

৩৬৬. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫০৬৬

অভাব ও দারিদ্র্যের ভয়ে বিয়ের প্রতি যুবকদের একটি নীরব অনীহা ও শংকা সৃষ্টি হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পেছনে আমাদের সমাজ অনেকাংশে দায়ী। আমাদের সমাজের যুবক শ্রেণি- পড়াশুনা, ক্যারিয়ার ও দারিদ্র্যের শঙ্কায় চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে বিয়ে থেকে বিমুখ থাকছে। ফলশ্রুতিতে সমাজে অবৈধ সম্পর্ক, অনাচার, চরিত্র বিধ্বংসী নানা কার্যকলাপ বিকাশ লাভের সুযোগ অবারিত হচ্ছে। অথচ বিয়ের সহজীকরণের ব্যাপারে খোদ আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা, 'যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের স্বাবলম্বী বানিয়ে দেবেন।'[৩৬৭]

এর চেয়ে বড় সুসংবাদ ও ভরসার কথা কী হতে পারে!

রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগের দিকে তাকালে আমরা দেখি, সামান্য লোহার আংটি দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। হাদীসে স্পষ্ট এসেছে, 'ঐ বিয়েতে আল্লাহর বরকত রয়েছে যা সম্পন্নকরণে অতি সহজ।' অর্থাৎ যে বিয়েতে দেনমোহর অল্প ধরা হয় বা বাড়তি খরচ ব্যতিরেকে বিয়ে সম্পন্ন করা হয়। এটিই সুন্নাহ সম্মত বিয়ে। ইসলাম বিয়েকে সহজ করেছে, কিন্তু অধুনা সমাজব্যবস্থা বিয়েকে জটিল করে তুলে ধরছে যুবকদের মাঝে। ফলে, বিয়েকে আহামরি ভেবে বিয়ে থেকে দূরে থাকলেও অন্যান্য পাপকর্ম বেড়ে চলছে।

বিয়ে কঠিন হওয়ার প্রেক্ষিতে নানাবিধ অনাচার দেখা যাচ্ছে সমাজে। এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইসলামের বিপরীত। কুরআন-হাদীসে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নৈতিকতার উৎকর্ষতা সাধন ও সামাজিক সুশৃঙ্খলা আনার জন্য বিয়েকে সার্বিকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদের বিয়ে করিয়ে দাও এবং তোমাদের সৎ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদেরও। যদি তারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তার নিজ অনুগ্রহে ধনী বানিয়ে দেবেন।'[৩৬৮]

---

৩৬৭. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩২
৩৬৮. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩২

রাসূলুল্লাহ (স.) হাদীসে বিয়ের প্রতি উৎসাহ ও তাকিদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবু আইয়ুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'চারটি জিনিস নবীদের চিরাচরিত সুন্নত। ১. লজ্জা-শরম, ২. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৩. মেসওয়াক করা এবং ৪. বিয়ে করা।'[৩৬৯]

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক (বিবাহের ব্যয় বহনের) সামর্থ্য আমাদের ছিলো না। তিনি বলেন, হে যুবসমাজ! তোদের বিয়ে করা উচিত। কেননা এটি দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রাখে সুরক্ষিত। আর তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে, কেননা রোজা তার যৌনশক্তিকে দমিয়ে রাখবে।'[৩৭০]

বিয়ে কাকে করবেন এ সম্পর্কেও নবী করিম (স.) নির্দেশনা দিয়েছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'চারটি কারণ বিবেচনা করে কোনো নারীকে বিয়ে করা হয়। ১. ধন-সম্পদ, ২. বংশমর্যাদা, ৩. সৌন্দর্য ও ৪. দ্বীনি চেতনা। অতএব, দ্বীনি চেতনাকে অগ্রাধিকার দাও, তোমার হাত কল্যাণে পূর্ণ হয়ে যাবে।' এই হাদীসে দ্বীনদার নারীকে বিয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে বলা হয়েছে; তোমার হাত কল্যাণে পূর্ণ হয়ে যাবে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের সমাজের লোকদের এই হাদীস থেকে শিক্ষা নিতে দেখা যায় না। উল্টো দেখা যায় সুন্দরী, প্রভাবশালী ও ধনসম্পদকে প্রাধান্য দিতে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেনমোহর। মোহরের পরিমাণ স্বামীর অবস্থানুযায়ী বেশি বা কম হতে পারে। উভয়পক্ষ একমত হয়ে এ ব্যাপারে যা নির্ধারণ করবে তাই ধার্য হবে। হযরত আবুল আজফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা নারীদের মোহর উচ্চহারে বৃদ্ধি করবে না।

---

৩৬৯. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১০১৮
৩৭০. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১০১৯

কেননা, তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের বস্তু অথবা আল্লাহর কাছে তাকওয়ার বস্তু হতো তবে তোমাদের চেয়ে আল্লাহর নবী এ ব্যাপারে বেশি উদ্যোগী হতেন। কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (স.) বারো উকিয়ার বেশি মোহরে তার কোনো স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন অথবা কোনো কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।'[৩৭১]

বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা যায়, মোহরের পরিমাণ একেবারে সামান্য হওয়া যেমন ঠিক নয়, যদিও তাতে বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনি খুব বেশি আকাশচুম্বী পরিমাণও যথার্থ নয়, বিশেষ করে তা আদায়ের কোনো বাধ্যবাধকতা যদি না থাকে। বরং তা আদায়ের নিয়ত না থাকলে তো বিয়েই বৈধ হবে না। ইসলামের যৌতুক প্রথার কোনো স্থান নেই। স্বামীর প্রাপ্য হিসেবে কোনো কিছু রয়েছে বলে কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই। অথচ আমাদের সমাজে যৌতুককে একটি বাধ্যতামূলক অংশ ধরা হয়ে থাকে, যা কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনকি এই যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়, স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তালাক দেওয়া হয়।

এখানে একটি কথা না বললেই নয়। তা হলো অপরাধ যে করে আর অপরাধকে যে প্রশ্রয় দেয় দু'জনই সমান অপরাধী। যৌতুকের জন্য অনেক মা-বাবা তার আদরের মেয়েকে বিয়ে দিতে পারেন না। আর এ কারণে সমাজে অনেক ব্যভিচার বৃদ্ধি পায়। কাল কিয়ামতের দিন এই ব্যভিচারের দায়ভার কে নেবে? একটু চিন্তা করা উচিত। সমাজ থেকে যৌতুক প্রথাকে বিলুপ্ত করা না হলে কালক্রমে এই সমাজ ধ্বংসের দিকে পতিত হবে।

তাই রাষ্ট্র ও সমাজকে যৌন অনাচার থেকে রক্ষা করতে হবে। আইন প্রয়োগে কঠোর হতে হবে। যৌন উত্তেজনামূলক সব কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে। বিয়েকে করতে হবে সহজ ও স্বাভাবিক। আর প্রত্যেক মা-বাবার উচিত তাড়াতাড়ি তাদের উপযুক্ত ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা।"তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে তার উচিত বিবাহ করা" শীর্ষক হাদীসের অর্থ এ নয় যে, গরীব লোককে বিয়ে করা থেকে বারণ করা।

---

৩৭১. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১০৫১

এখানে ব্রিটেনে অনেক ছাত্ররাই চাকুরী করে। কেননা তারা নিজেদেরকে হারাম থেকে বাঁচানোর জন্য বিয়ে করতে চায়। আমি দুটো হাদীস পড়েছি; মনে হচ্ছে হাদীসদ্বয় সাংঘর্ষিক। এক :"হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে তার উচিত বিয়ে করা"। অপরটি হল : নবী (স.) জনৈক মহিলাকে এক গরীব লোকের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যা বুঝতে পেরেছি, প্রথম হাদীস বলছে; পুরুষের বিয়ের জন্য আর্থিকভাবে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; যাতে করে স্ত্রীর খরচ চালাতে পারে। আর দ্বিতীয় হাদীস বলছে: তিনি এক গরীব লোককে বিয়ে করিয়েছেন যে কোন সম্পদের মালিক নয়।
এ হাদীসদ্বয় কি সাংঘর্ষিক; নাকি আমার বুঝার ভুল আছে?

উত্তর : ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমরা নবী (স.) সাথে কিছু যুবক ছিলাম যাদের কিছুই ছিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখ তাদের উচিত বিয়ে করে ফেলা। কেননা বিয়ে দৃষ্টি অবনতকারী ও লজ্জাস্থানকে হেফাযতকারী। আর যার সামর্থ্য নেই তার উচিত রোযা রাখা। কেননা রোযা যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী।"[৩৭২]

দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে সাহল বিন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার নিজেকে আপনার জন্য উপহার দিতে এসেছি (পরোক্ষ ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব)। তখন নবী (স.) তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে, নবী (স.) কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে পড়ল। এমন সময় রাসূল (স.) এর সাহাবীদের একজন বলল, যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম কিছুই নেই। তিনি বললেন, তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং দেখ কিছু পাও কি না? এরপর লোকটি চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স.) বললেন, দেখ- একটি লোহার আংটি হলেও! তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, একটি লোহার আংটিও পেলাম না।

৩৭২. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১৪০০

কিন্তু এই যে আমার লুঙ্গি আছে। সাহল (রা:) বলেন, তার কোন চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বলল, এটাই আমার পরনের লুঙ্গি; এর অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসূল (স.) বললেন, তোমার লুঙ্গি দিয়ে সে কি করবে? তুমি পরিধান করলে তার গায়ে কোন কিছু থাকবে না। আর সে পরিধান করলে তোমার গায়ে কোন কিছু থাকবে না। তখন লোকটি বসে পড়লো এবং অনেকক্ষণ সে বসেছিল। তারপর উঠে গেল। রাসূল (স.) তাকে ফিরে যেতে দেখে ডেকে আনলেন। যখন সে ফিরে আসল, নবী (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে? সে গুণে বলল, অমুক অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছে। তখন নবী (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পার? সে বলল, হ্যাঁ! তখন নবী (স.) যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ করেছ এর বিনিময়ে এ মহিলার সাথে তোমার বিবাহ দিলাম।[৩৭৩]

আলহামদু লিল্লাহ্; এ হাদীসদ্বয় সাংঘর্ষিক নয়। বরং প্রত্যেকটি হাদীস এর যথোপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা.) এর হাদীসে সাধারণভাবে সকল যুবক ও বিয়েতে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান উদ্ধৃত হয়েছে; এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, বিয়ের জন্য খরচের সামর্থ্য থাকা ও যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়; যাতে করে স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ফরয দায়িত্ব পালন করতে পারে।

الباءة (সামর্থ্য) মানে হচ্ছে বিয়ের খরচাদি। তাই শরিয়ত প্রণেতা (আইনদাতা) এ মূল বিধানটি বর্ণনা করতে চাইলেন। সেটা হলো বিয়েটা শুধু নিছক একটি আকদ (চুক্তি) ও বৈধভাবে যৌন চাহিদাপূরণ নয়। বরং বিয়ে একটি দায়িত্ব-কর্তব্য ও নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব। নবী (স.) এর বাণী "তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখ তাদের উচিত বিয়ে করে ফেলা।" এ দলিলও রয়েছে যে, যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে ও বিয়ের খরচাদি বহন করার ক্ষমতা আছে তার জন্যে অবিলম্বে বিয়ে করাটাই শরিয়তের বিধান। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় হাদীসটি বিশেষ একটি ঘটনাকেন্দ্রিক এবং দরিদ্র এক ব্যক্তির বিয়ে করা ও চরিত্র রক্ষা করা সংক্রান্ত। নবী (স.) তাকে ঐ নারীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন যে নারী নিজেকে নবী (স.) এর প্রতি উপহার হিসেবে পেশ করেছিলেন।

---

৩৭৩. *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ৫০৩০

এ হাদীসে দলিল রয়েছে যে, দরিদ্রতা সত্তাগতভাবে বিবাহকে বাধা দেয় না; যদি পাত্র দ্বীনদার হয় এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাসী হয় এবং পাত্রীও সে রকম হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ্ই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্ মহা দানশীল, মহাজ্ঞানী।"[৩৭৪]

সুতরাং আল্লাহ্র উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল, চরিত্র রক্ষার আকাঙ্খা, আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা থাকলে আশা করা যায় এমন দম্পতিকে আল্লাহ্ সাহায্য করবেন এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে রিযিক দিবেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, "তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্র দায়িত্বে: আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী, এমন মুকাতাব দাস (মালিককে নিজের মূল্য পরিশোধ করে স্বাধীন হতে ইচ্ছুক) যে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক এবং এমন বিবাহকারী যে চরিত্র রক্ষা করতে ইচ্ছুক।"[৩৭৫]

ইমাম বুখারী এ হাদীসটির শিরোনাম দিয়েছেন এই বলে, "অভাবীর কাছে বিয়ে দেওয়া"। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী- "তারা যদি দরিদ্র হয় আল্লাহ্ই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দিবেন"। হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, "তিনি যে শিরোনাম দিয়েছেন সেটার পক্ষে কারণ হিসেবে আল্লাহ্র বাণী, "তারা যদি দরিদ্র হয় আল্লাহ্ই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দিবেন" কে পেশ করেছেন। এর সার কথা হচ্ছে- বর্তমানে কারো দরিদ্র অবস্থা তার কাছে বিয়ে দেয়ার পথে বাধা নয়; যেহেতু ভবিষ্যতে তার সম্পদ অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

আলী বিন আবু তালহা, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, "আল্লাহ্ তাদেরকে বিয়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তিনি স্বাধীন ও দাস সবাইকে বিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তারা যদি দরিদ্র হয় আল্লাহ্ই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দিবেন।"

---

৩৭৪. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩২
৩৭৫. *সুনানে তিরমিযী*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ১৬৫৫

ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, "তোমরা বিয়ে করার মাধ্যমে স্বাবলম্বন সন্ধান কর"।[৩৭৬]

শাইখ বিন বায (রহ.) বলেন, এ আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ্‌ তাআলা যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই তাদেরকে এবং সৎ ও যোগ্য দাস-দাসীদের কাছে বিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, এটি গরীবদের সচ্ছলতার মাধ্যম যাতে করে, পাত্রী ও পাত্রীর অভিভাবকগণ নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, দারিদ্র বিয়ের পথে বাধা হওয়া অনুচিত। বরং বিয়ে রিযিক হাছিল ও স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যম।
এ কারণে সামর্থ্যবানকে বিয়ে করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার অর্থ এ নয় যে, সামর্থ্যহীনকে বিয়ে করতে বারণ করা; বিশেষত কেউ যদি নিজের ব্যাপারে হারামে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করে।

অনুরূপভাবে সামর্থ্যহীনকে যৌন উত্তেজনা দমিয়ে রাখা ও শান্ত করার জন্য রোযা রাখার দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মধ্যেও বিয়ে করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। হতে পারে সে এমন কাউকে পাবে যিনি তাকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন। হতে পারে সে এমন কোন পাত্রীকে পাবে যে পাত্রী তার দ্বীনদারি ও সৎ হওয়ার কারণে তার আর্থিক অবস্থাকে মেনে নেবে। এগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, এক প্রথা থেকে অপর প্রথাতে পার্থক্য হয়।

পক্ষান্তরে, ইবনে মাসউদ (রা.) এর হাদীসে যা উদ্ধৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে সাধারণ একটা শিষ্টাচার এবং সামর্থ্যহীনকে রোযা রাখার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করার পরামর্শ। আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার কোন উপায় পায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং তাকে বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্বুদ্ধ করা হবে। ঠিক এ কারণে নবী (স.) বলেছেন, "আর যার সামর্থ্য নেই" তার ক্ষেত্রে তিনি এ কথা বলেননি যে, 'তার উচিত বিয়ে না করা'। বরং তিনি বলেছেন, "তার উচিত রোযা রাখা"; যাতে করে সে গুনাহতে লিপ্ত না হয়। আর যদি কিছু কষ্ট-ক্লেশ করে হলেও সে বিয়ে করতে পারে নিঃসন্দেহে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ রোযাকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে একেবারে অপারগতার ক্ষেত্রে। যদি কিছু কষ্ট করে হলেও বিয়ে করতে পারে তাহলে সেটাই ভাল।

৩৭৬. *তাফসীরে ইবন কাসীর, প্রাগুপ্ত*, ৬/৫১

নবম পরিচ্ছেদ

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেআন

ملاعنه ও لعان শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধের বদদু'আ করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেআন বলা হয়। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার শুক্রজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবী করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চার জন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চার জন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে লেআন করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কুরআনে উল্লেখিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচ বার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার ওপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচ বার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কুরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচ বার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেআন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আল্লাহ তাআলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী পরকালের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকের অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না।

ইসলামী শরীয়তে লেআনের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চার জন চাক্ষুস সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টো তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চার জন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ মেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে, কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে; আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ আইনের আওতা-বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেয়া হয়েছে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লেআন শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেআন আয়াতের শানে নুযুল কোন ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযুল সাব্যস্ত করেছেন। বুখারীর টিকায় হাফেজ ইবনে হাজার ও মুসলিমের টিকায় ইমাম নববী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে নুযুল আখ্যা দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর যা বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানীতে বর্ণিত আছে।

এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ হযরত ইবনে আব্বাসেরই জবানীতে মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, যখন কুরআনে অপবাদের হদ সম্পর্কিত وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাসূল (স.) এর কাছে আরয করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাযিল হয়েছে? রাসূল (স.) হযরত সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সরদার কি কথা বলেছেন? আনসারগণ বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে তিরস্কার করবেন না। তার এ কথা বলার কারণ তার তীব্র আতমর্যাদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমার পুরোপুরি বিশ্বাস যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার ওপর বিভিন্ন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্য বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শাসাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্য এটা জরুরী যে, আমি চারজন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পালায়ন করবে না? এ স্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্ন রূপ বর্ণিত আছে। সবগুলোর সারমর্ম একই।

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে মুয়াজের এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হলো। হিলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাবার্তা নিজ কানে শুনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রাসূল (স.) এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করণে তিনি খুব দু:খিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন।

এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগলো যে, আমাদের সরদার হযরত সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রাসূল সা. হিলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত কবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হিলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ আয়ালা আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। বুখারীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, রাসূল সা. হিলালের ব্যাপার শুনে কোরআনের বিধান মোতাবেক বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবির স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদেও শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হিলাল উত্তরে আরয করলেন যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তার কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ আয়ালা এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবে।

এই কথাবার্তা চলছিল, এমতাবস্থায় জিবরাইল (আ) লেআনের আইন সম্বলিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الخ

আবু ইয়ালা এই রেওয়ায়েতটিই হযরত আনাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (স.) হিলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হিলাল আরয করলেন : আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে এই আশাই পোষণ করছিলাম। অত:পর রাসূলুল্লাহ (স.) হিলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হলো। সে বলল : আমার স্বামী হিলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ জানেন। জিজ্ঞাসা এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হিলাল আরয করলেন : আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেআন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হিলালকে বলা হয় যে, কুরআনে বর্ণিত ভাষায় চারবার সাক্ষ্য দাও; অর্থাৎ আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল আদেশ অনুযায়ী চারবার সাক্ষ্য দিলেন।

পঞ্চম সাক্ষ্যের কুরআনী ভাষা এরূপ : যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। এই সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ (স.) হিলালকে বললেন : দেখ হিলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হাল্কা। আল্লাহর আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হিলাল আরয করলেন : আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আযাব দিবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যেও শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হিলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরণের চার সাক্ষ্য ও কসম নেওয়া হরো। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহর আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্তত করতে লাগল।

এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল : আল্লাহর কসম আমি আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না। অতঃপর সে সাক্ষ্যও এ কথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে আমার উপর আল্লাহর গযব হবে। এভাবে লেআনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (স.) উভয় স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দিলেন অর্থাৎ তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ধিকৃতও করা হবে না।

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে এভাবে উল্লেখ করেছেন ও অপবাদের শাস্তি সম্বলিত আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (স.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে শিশু দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যআত হবে এবং মুসলমাসগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে।

এটা হুবহু প্রথম ঘটনায় সাদ ইবনে মুয়াযের উত্থাপিত প্রশ্ন। এক শুক্রবার এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওমায়রের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওমায়ের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওমায়ের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন।

আসেম ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুম'আর নামাযের সময় রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে আরয করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! বিগত জুম'আয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা, আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়ায়েতে এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ভিন্ন পুরুষের সাথে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? নতুবা সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : আল্লাহ তায়ালা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে আস। বর্ণনাকারী সাহল বলেন। এদেরকে এনে রাসূলুল্লাহ (স.) মসজিদের মধ্যে লেআন করালেন। যখন উভয় পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেআন সমাপ্ত হলো, তখন ওমায়মের বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তালাক দিলাম।

উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেআন - আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হকেম ইবনে হাজর ও ইমাম নববী উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেআন-আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই।

এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে فنزل جبرئيل এবং ওমায়রের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قد انزل الله فيك এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমার অনুরূপ এক ঘটনার বিধান নাযিল করেছেন।

মাসআলা : বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়ে গেলে স্বামীর হারাম হয়ে যায়; যেমন দুগ্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا লেআনের সাথে সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়; কিন্তু ইদ্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয হবে, যখন স্বামী তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।

মাসআলা : লেআনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) হিলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়েরই ঘটনায় এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লেআনের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরো বেড়ে যাবে; দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী, সন্তানকে জারজ সন্তান বলাও কারো জন্য জায়েয হবে না। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স.) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ প্রেমিক বান্দাহগণের পরিচয়

আল্লাহর প্রেমের তাৎপর্য-আল্লাহর ভালোবাসা :

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অর্থ হলো অন্তরে তাঁর প্রতি ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হওয়া ও ধাবিত হওয়া, এবং আল্লাহর চাওয়া ও নির্দেশিত বিষয়ের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেয়া। আর সর্বোপরি অন্তর জুড়ে আল্লাহর স্মরণ বিরাজমান ও প্রভাব বিস্তার করে থাকা। আল্লাহর মুহাব্বতের হাকীকত আল্লাহকে মুহাব্বত করা মানে আল্লাহর ইবাদাতকে ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতি অনুরক্ত হওয়া। আল্লাহর নির্দেশ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলি পরিহারই মূলত আল্লাহকে ভালোবাসা ও তাঁকে প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদনের নামান্তর। আর এ আন্তরিক ভালোবাসাই হলো তাওহীদের আলামত ও প্রভাব। এর মাধ্যমেই অগণিত মর্যাদা ও ফযীলত অর্জিত হয়। আল্লাহকে মুহাব্বত করার অর্থ হলো তিনি যে সকল স্থান, সময়, ব্যক্তি, কর্ম ও কথাসহ তিনি যেগুলোকে ভালোবাসেন সেগুলোকে ভালোবাসা ও পছন্দ করা।

আল্লাহর ভালোবাসা হতে হবে খাঁটি ও একনিষ্ঠভাবে। আর আল্লাহর ভালোবাসা স্বভাবজাত ভালোবাসার পরিপন্থি নয়। যেমন সন্তানের প্রতি পিতার মুহাব্বত, পিতার প্রতি সন্তানের মুহাব্বত, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের মুহাব্বত এবং খাদ্য, পানীয়, বিবাহ, পোশাক, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদির প্রতি মুহাব্বত। এর কোনটিই আল্লাহকে ভালোবাসার পরিপন্থি কিংবা বিপরীত নয়। নিষিদ্ধ ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার সঙ্গে শিরকের অনুরূপ। যেমন মুশরিকদের সাথে তাদের মূর্তি ও মনগড়া উপাস্যদের কারণে মুহাব্বত করা এবং নিজের প্রবৃত্তির পছন্দকে আল্লাহর পছন্দের ওপর প্রাধান্য দেয়া, অথবা আল্লাহ যে সব, সময়, স্থান, ব্যক্তি, কথা ও কাজকে অপছন্দ করেন, সেগুলোকে পছন্দ করা। এসবই নিষিদ্ধ ভালোবাসা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।[৩৭৭]

আল্লাহর মুহাব্বতের ফযীলতসমূহ :

১. নিশ্চয় আল্লাহর মুহাব্বতই হলো প্রকৃত একত্ববাদ। একত্ববাদের রূহ হলো, এক আল্লাহর প্রতি খালেছভাবে মুহাব্বত করা; বরং এটাই ইবাদাতের হাকীকত। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রভুর প্রতি বান্দার মুহাব্বত পরিপূর্ণ না হবে এবং সব কিছুর মুহাব্বতের চেয়ে আল্লাহর প্রতি বান্দার মুহাব্বত অগ্রগণ্য ও প্রাধান্য না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার একত্ববাদে বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না। আর এ আল্লাহপ্রীতিই তার মাঝে শাসন ও কর্তৃত্ব করবে। অর্থাৎ বান্দার অন্যসব পছন্দ অপছন্দ হবে আল্লাহর পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে। আর এতেই সে সফল ও সার্থক হতে পারবে।

২. বিপদের সময় আল্লাহ প্রেমিক প্রশান্তি লাভ করবে। অনন্তর আল্লাহর প্রেমিক মুহাব্বতের এমন অনাবিল স্বাদ পাবে যা তাকে মুসিবতের কথা ভুলিয়ে দেবে। আর কঠিনতর বিপদাপদ ও তার ওপর অতি সহজ বলে মনে হবে।

আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর কাছে রহমতের আশা করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত নেই। আল্লাহ ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্খা কোমল বাতাসের মত যা অন্তরের ওপর প্রবাহিত হলে দুনিয়ার মোহ কেটে যায়।

৩. নেয়ামতের পরিপূর্ণতা ও সীমাহীন আনন্দ লাভ। এটা আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত ছাড়া অর্জন হয় না। আর তাঁর প্রতি মুহাব্বত ও তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্তর স্বকীয়তা লাভ করে না। অন্তর পরিতৃপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা পায় না। যদি সে আনন্দের সকল উপকরণ পেয়ে যায় তবুও আল্লাহর মুহাব্বত ছাড়া প্রশান্তি পাবে না।

---

৩৭৭. *আল কুরআন*, ২ : ১৬৫

সুতরাং আল্লাহর মুহাব্বত নফসের জন্য নেয়ামত স্বরূপ। সুস্থ অন্তর, পবিত্র মানসিকতা, পরিশুদ্ধ চিন্তাশক্তির কাছে আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত, তাঁর ঘনিষ্ট হওয়া, এবং তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহের চেয়ে বেশী সুমিষ্ট, সুস্বাধু, আনন্দদায়ক নেয়ামত আর কিছু নেই। আল্লাহর মুহাব্বতের মাঝে মুমিন যে সৌন্দর্য খুঁজে পাবে তা সকল সৌন্দর্যের উর্ধ্বে। আর এর মাধ্যমে যে নেয়ামত অর্জিত হয় তা সর্বদিক দিয়ে অধিক পরিপূর্ণ এবং এরচেয়ে উপভোগ্য কোন জিনিস পৃথিবীতে নেই। তিনটি জিনিস যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল অন্য সবকিছু থেকে তার কাছে প্রিয় হবে। সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসে। আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে মুক্তি দেয়ার পর পুনর্বার কুফরীতে ফিরে যাওয়া আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে। প্রতাপশালী মহামহিম আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও আনুগত্যে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে যে আত্মিক প্রশান্তি লাভ না করেছে তার চেয়ে হতভাগা পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টিকারী কিছু বিষয় :

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালবাসে এবং তাঁকে আপন করে নেয় আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহর মুহাব্বতের প্রথম আলামত হলো, বান্দা তাঁকে যেমন ভালোবাসবে তেমন ভালোবাসা আর কোন মাখলুকের প্রতি হবে না। আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১- অর্থ ও মর্ম বুঝে উপদেশ গ্রহণের নিয়তে কুরআন পাঠ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি মনোযোগী হবে এবং সে মহাগ্রন্থ অনুযায়ী আমল করবে তার অন্তর আল্লাহর মুহাব্বতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

২- ফরয নামাযের পর নফল নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। বান্দা নফল নামাযের মাধ্যমে আমার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। এতেকরে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে এবং তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে অবলোকন করে। তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে।

তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে। যদি সে কিছু চায় তবে আমি অবশ্যই তা দান করব। যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই তাকে আশ্রয় দান করব।

৩- মুখে, অন্তরে, কথায়, কর্ম সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির ও স্মরণ করা।

৪- মনের চাহিদার উপর আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া। যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে।[৩৭৮]

৫- আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলি এবং সেগুলোর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অন্তরে ধারণ ও লালন করা।

৬- আল্লাহর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দান, অনুগ্রহ ও কল্যাণকর নেয়ামতসমূহের কথা চিন্তা ও কল্পনা করা।

৭-অন্তরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সামনে সমর্পণ ও বিনয়াবনত করা।

৮- রাতের শেষ অংশে যখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন তখন একান্তচিত্তে নির্জনস্থানে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা। বান্দা একাকী আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হবে, তাঁর সাথে মুনাজাতের মাধ্যমে কথা বলবে। কুরআন তেলাওয়াত করবে। আদবের সাথে তাঁর সামনে নামাযে দাঁড়াবে এবং তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে এসব ইবাদাতের সমাপ্তি ঘটাবে।

৯- ফলের স্তুপ হতে যেমন উৎকৃষ্ট ফল বেছে নেয়া হয়, তেমন আল্লাহ প্রেমিক সত্যবাদীদের সান্নিধ্যে বসে তাদের কথা থেকে উৎকৃষ্ট উপদেশ আহরণ করা। আর সচরাচর অপ্রয়োজনীয় ও অকল্যাণকর কথা না বলা। কল্যাণকর এবং অন্যের জন্য উপকারী কথাই বলা উচিত।

১০- এমন বিষয় থেকে দূরে থাকা যা অন্তর ও আল্লাহর মাঝে ব্যবধান করে দেয়।

আল্লাহর মুহাব্বতের দ্বারা বান্দার লাভ :

যে আল্লাহকে সে তিনি তাকে সুপথ প্রদর্শন করেন এবং তাকে নৈকট্য দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, আমি আমার বান্দার ধারনার নিকটবর্তী। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথেই থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি।

---

৩৭৮. *আল কুরআন*, ৫: ৫৪

যদি সে আমার বিষয়ে কোন দলের সম্মুখে আলোচনা করে তবে আমি তাদের চেয়ে উত্তম দলের সম্মুখে তার আলোচনা করি। যদি সে এক বিঘত আমার প্রতি অগ্রসর হয় তবে আমি তার প্রতি একহাত অগ্রসর হই, যদি সে এক হাত অগ্রসর হয় তবে আমি দুই বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। যদি সে আমার কাছে হেঁটে আসে তবে আমি তার প্রতি দৌড়ে অগ্রসর হই। বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে তখন সে হেদায়েতের ভিন্ন স্তরে আরোহন করে। আর যখন সে আল্লাহকে ভালোবাসে তখন তার হেদায়াত বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে তার তাকওয়া বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, কেননা হেদায়েত মানুষের তাকওয়া বাড়িয়ে দেয়। যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাকে ভূমণ্ডলে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় করে দেন।

অর্থাৎ আল্লাহ যে বান্দাকে ভালোবাসেন, তাকে তিনি সর্বজনগ্রাহ্য করে দেন, তার প্রতি সকলে আকৃষ্ট হয়, সন্তুষ্ট হয় ও গুনকীর্তন করে এবং কাফের ছাড়া সবকিছুই তাকে ভালোবাসে। কাফের যেহেতু আল্লাহর ভালবাসাকেই প্রত্যাখ্যান করেছে, সে কি করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে ভালবাসবে? রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন- আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি তুমিও তাকে ভালোবাস। এরপর জিবরীল (আ.) আসমানে ঘোষণা করেন, অমুক বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসী তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। এরপর জমিনে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

এমনিভাবে আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তাকে স্বীয় প্রতিপালন ও পরিচর্যা দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখেন। সবকিছু তার অনুগত করে দেন। সকল কঠিন তার জন্য সহজ করে দেন। সকল দূরবর্তী জিনিস তার নিকটবর্তী করে দেন। দুনিয়ার সকল কাজ তার জন্য সহজ করে দেন। ফলে সে কোন ক্লান্তি ও কষ্ট অনুভব করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালোবাসা দেবেন।[৩৭৯]

৩৭৯. *আল কুরআন*, ১৯ : ৯৬

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে আপন সান্নিধ্যে স্থান দেন। যখন আল্লাহ বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তাকে নিজের কাছে রেখে প্রতিপালন করেন এবং আপন পরিচর্যার দ্বারা তাকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। তাকে কষ্ট দেয়ার বা ক্ষতি করার সাধ্য কারো থাকে না। রাসূল (স.) বর্ণর্না করেছেন- মহান আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার অলীকে (বন্ধুকে) কষ্ট দেয় আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেই। আমার বান্দা আমার আরোপিত ফরয কাজের মাধ্যমে এবং নফল কাজের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে (এক স্তরে) আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। আর যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে দেই। আর যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যা করি সে বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি না। কিন্তু মুমিন যদি মৃত্যুকে অপছন্দ করে তবে আমি তার প্রাণ নিয়ে সংশয়ে ভুগি। কেননা তার কোন ভুল হোক আমার পছন্দ নয়। সত্যিকারের ঈমান রূহের খোরাক এবং প্রশান্তির ময়দান। যেমন আল্লাহকে অস্বীকার করা রূহের মৃত্যুসম এবং অস্থির জীবনের উপকরণ।

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তার দোয়া কবুল করেন। মুমিন বান্দাদের দোয়া কবুল করা তাদের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ। এমন বান্দা দোয়ার জন্য আকাশের দিকে হাত তুলতেই তাকে নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। তারা যখন বলে, হে আমার রব! আল্লাহ তা'আলা বলেন-আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুত: আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।[৩৮০]

৩৮০. *আল কুরআন*, ০২ : ১৮৬

যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন ফেরেশতাদেরকে তার মাগফিরাত কামনায় নিযুক্ত করেন। ফেরশতাগণ ঐ ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করেন আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন। তারা তার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।[৩৮১]

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন- আকাশ ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।[৩৮২]

আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তাকে নেক আমলের ওপর মৃত্যু দেন। রাসূল (স.) বর্ণনা করেছেন- আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে মধু পান করান। মধু পান করানো দ্বারা উদ্দেশ্য কি? জিজ্ঞেস করলে হযরত রাসূল (স.) বলেন- আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পূর্বে নেক আমলে অভ্যস্ত হওয়ার তাওফীক দেন এবং এর উপরই তার মৃত্যু দেন।

আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তাকে মৃত্যুর সময় অভয় ও নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তাকে দুনিয়াতে নিরাপদ জীবন দান করেন। মৃত্যুর সময় তাকে ফেরেশতা দ্বারা অভয় ও নিরাপত্তার সুসংবাদ দেন এবং ঈমানের ওপর অটল রাখেন। অতঃপর তার প্রতি ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যারা কোমলভাবে তার জান কবজ করে নেন। মৃত্যুর সময় তাকে ঈমানের ওপর দৃঢ়পদ রেখে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

---

৩৮১. *আল কুরআন*, ৪০ : ০৭
৩৮২. *আল কুরআন*, ৪২ : ০৫

আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।[৩৮৩]

আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে চিরস্থায়ী জান্নাত দেন। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন আখেরাতে সে জান্নাতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে সেখানে এমন সম্মান দিবেন যা সে কখনো চিন্তা করেনি এবং অন্য কারো ভাবনায়ও যা আসেনি। আল্লাহ তাঁর প্রিয়দের এমন জান্নাত দান করবেন যেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে। যেমনটি হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করা হয়েছে- আল্লাহ তা'আলা বলেন- আমি নেককার বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি এবং কোন মনে এর কল্পনাও সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য ছাড়া দুনিয়া উপভোগ্য হবে না। তাঁর দর্শন লাভ ব্যতিরেকে জান্নাতও আনন্দময় হবে না। বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার অন্যতম ফল ও উপকারিতা হলো, বান্দার আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মুখে স্বীয় নূরসহ প্রকাশিত হবেন। ফলে তাদের কাছে আর আল্লাহর দীদারের চেয়ে প্রিয় কিছুই থাকবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন- তোমরা অচিরেই তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন এই চাঁদকে দেখছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমাদের সামর্থ থাকে, তবে তোমাদের ওপর ফজরের সালাত ও আছরের সালাতে যেন (শয়তান) বিজয়ী না হয় (অর্থাৎ এই দুই নামায যেন কাজা না হয়। বরং তা আদায় করবে)।

আল্লাহর মুহাব্বত সংক্রান্ত কিছু জ্ঞাতব্য :

১- আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসার অর্থ এই নয় যে, তার কোন বিপদ আসবে না। রাসূল (স.) বর্ণনা করেছেন- নিশ্চয় বড় বিপদের সাথে রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আল্লাহ যখন কোন জাতিকে পছন্দ করেন তখন তাদেরকে বিপদের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন।

---

৩৮৩. *আল কুরআন*, ৪১ : ৩০

যে বিপদের এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হবে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে এ পরীক্ষার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন এবং তার গুনাহসমূহকে নিঃশেষ করে দেন। তার অন্তরকে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে, এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।[৩৮৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েত প্রাপ্ত।[৩৮৫]

২- নাফরমানী ও অবাধ্যতা, বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসাকে কমিয়ে দেয়, এবং সেটাকে অপূর্ণ করে দেয়। ঈমানের মত মুহাব্বতেরও একটি মূল আছে এবং তার রয়েছে পরিপূর্ণতা। গুনাহের কারণে তার পরিপূর্ণতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সংশয় ও কপটতা মুহাব্বতের মৌলভিত্তিকেও নিঃশেষ করে দেয়। যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা নেই সে কাফের, মুরতাদ ও মুনাফিক। তার মধ্যে ঈমানের লেশমাত্র নাই। পক্ষান্তরে পাপাচারী ব্যক্তির ব্যাপারে একথা বলা যাবে না যে, তার মাঝে আল্লাহর মুহাব্বত নেই। বরং বলা যেতে পারে যে আল্লাহর প্রতি তার মুহাব্বত ত্রুটিপূর্ণ। আর এই মুহাব্বতের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকে যার যার প্রতিদান পাবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বর্ণনা করেছেন- যদি তোমরা গুনাহ না করতে তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন একটি জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করতো অতঃপর (তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত) আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতেন।

---

৩৮৪. *আল কুরআন*, ৪৭ : ৩১
৩৮৫. *আল কুরআন*, ০২ : ১৫৫-১৫৭

শিরক, সন্দেহ ও প্ররোচনা থেকে অন্তর ও মনের মুক্তিই হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতা। আর মনের দাসত্বই প্রকৃত দাসত্ব ও ইবাদাত, যেখানে গাইরুল্লাহর দাসত্বের কোন স্থান থাকবে না।

৩- আল্লাহর প্রতি মুহাব্বত, স্বভাবজাত মুহাব্বতের বিরোধী নয়। যেমন পানাহার, নারী ইত্যাদির প্রতি টান প্রকৃতিগত বিষয়। রাসূল (স.) বর্ণনা করেছেন- দুনিয়াতে দুটি জিনিস আমার নিকট প্রিয় : ১. নারী, ২. সুগন্ধি। সুতরাং পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলোর মুহাব্বত করা শিরক নয়। কেননা রাসূল (স.)ও এসব বস্তুকে মুহাব্বত করেছেন। এজন্য এমন সব বস্তুকে মুহাব্বত করা জায়েজ যার মুহাব্বত নিষিদ্ধ বা হারাম নয়।

৪- যে ব্যক্তি কাউকে এমনভাবে ভালোবাসবে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসে সে মুশরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।[৩৮৬]

এ আয়াতে তাদের ব্যাপারে সতর্কবাণী আরোপ করা হয়েছে যারা ইবাদাত ও সম্মানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভালোবাসার মত আর কাউকে ভালোবাসবে। রাসূল (স.) বর্ণনা করেছেন- আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য কারো সাথে শত্রুতা করা।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন, বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।[৩৮৭]

---

৩৮৬. *আল কুরআন*, ০২ : ১৬৫
৩৮৭. *আল কুরআন*, ০৯ : ২৪

এ আয়াতে তাদের প্রতি কঠিন সতর্কবাণী রয়েছে যারা উক্ত আট শ্রেণীর প্রতি আল্লাহ থেকে বেশী মুহাব্বত পোষণ করেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বর্ণনা করেন- তোমরা কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সন্তান, পিতা ও অন্যদের চেয়ে আমাকে অধিক ভাল না বাসবে।

৫- ঈমানদারদের ভালোবাসার পরিবর্তে মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ ও তাদেরকে ভালোবাসা মূলতঃ আল্লাহর প্রতি ভালবাসার সংগে সাংঘর্ষিক বিষয়। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের মস্তবড় মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন- মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।[৩৮৮]

আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদেরকে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর বন্ধুত্ব থাকবে না। সুতরাং আল্লাহর বন্ধুদের ভালবাসা ও শত্রুদের ভালবাসা ভিন্ন ও বিপরীত দুটি বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।[৩৮৯]

কাফেরদের সাথে কেবল ঐ সকল লোকদেরকে বন্ধুত্বের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যারা কাফেরদের অনিষ্টের শিকার হওয়ার আশংকাবোধ করে। শুধু এ ক্ষেত্রেই তাদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা যাবে। তখন তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা যাবে তবে অন্তর ঈমানের প্রতি অবিচল থাকবে এবং কাফেরদের কুফরের প্রতি ঘৃণা থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত।[৩৯০]

---

৩৮৮. *আল কুরআন*, ০৩ : ২৮
৩৮৯. *আল কুরআন*, ০৩ : ২৮
৩৯০. *আল কুরআন*, ১৬ : ১০৬

ভালোবাসার চমক যখন রাসূল (স.) কে পার্থিব জীবন ও আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয় তখন তিনি বলেন, বরং পরম বন্ধুর সান্নিধ্য।

সুতরাং রাসূল (স.) আল্লাহর মুহাব্বত ও তাঁর সাথে সাক্ষাতকে প্রাধান্য দেন এবং আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়াকে দুনিয়ার মোহ ও ভোগের ওপর প্রাধান্য দেন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হলো অধিক পরিমাণে তাঁকে স্মরণ করা এবং তাঁর সাক্ষাতের প্রতি উদগ্রীব হওয়া। কেউ কোন বস্তুকে ভালোবাসলে তার স্মরণ এবং সাক্ষাতের চেয়ে প্রিয় তার কাছে আর কি থাকতে পারে?

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্টকারী বিষয়সমূহ, বাংলাদেশে এর প্রয়োগ :

পরকিয়া ও ব্যভিচার :

সাধারণ প্রেমেরে চেয়ে পরকীয়ার গল্প অনেক বেশি মুখরোচক, আকষর্ণীয়। একই কারণে পরকীয়া সম্পর্কের প্রতি ঝোকটাও বেশি। আজকাল বাংলাদেশের খবরের কাগজ হাতে নিলেই চোখে পড়ে শীর্ষ শিরোনামে গৃহবধূ ধর্ষণের খবর। গবেষণা বলছে, গৃহবধূ ধর্ষণের পেছনে পরকীয়া সম্পর্কেও যোগসূত্র অনেক। পরকীয়া সম্পর্ক থেকেই বেশির ভাগ গৃহবধূ ধর্ষিত হচ্ছে।

পরকীয়া সম্পর্কে যেমন সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, তেমনি পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরে। পরকীয়ার ফাঁদে আটকা পড়ে আত্মহনন করছেন অগণিত নারী-পুরুষ। বলি হচ্ছেন নিরপরাধ সন্তান, স্বামী অথবা স্ত্রী। পরকীয়ার পথে বাধা হওয়ায় নিজ সন্তানকেও নির্মমভাবে হত্যা করছে মমতাময়ী মা।

ইসলামে পরকীয়া ও অবৈধ সম্পর্ক থেকে নারী-পুরুষকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো নারীর পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। সূরা আহযাবের ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারীদের পরপুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যাতে নারীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কোনো আকর্ষণবোধ না করেন।

শুধু নারীদেরই নয়, বরং সূরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর ৩১ নম্বর আয়াতে মহিলাদেরকে তাদের দৃষ্টি সংযত রাখার পাশাপাশি গোপন শোভা অনাবৃত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। অপাত্রে সৌন্দর্য প্রদর্শনকে হারাম করে সবটুকু সৌন্দর্য স্বামীর জন্য নিবেদনে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কারণ, স্বামী তার স্ত্রীর সৌন্দর্যে মোহিত হলে সংসারের শান্তিই বাড়বে। পক্ষান্তরে স্ত্রীর সৌন্দর্য দিয়ে অন্যকে মোহিত করার পথ অবায়িত করলে, তা কেবল বিপদই ডেকে আনবে।

হাদীসে ব্যভিচারের ভয়ানক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যভিচার পরিত্যাগ কর। কারণ, এর ছয়টি শাস্তি রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি দুনিয়াতে ও তিনটি আখেরাতে প্রকাশ পাবে। যে তিনটি শাস্তি দুনিয়াতে হয় তা হচ্ছে, তার চেহেরার ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয়ে যাবে, তার আয়ুষ্কাল সংকীর্ণ হয়ে যাবে, এবং তার দারিদ্রতা চিরস্থায়ী হবে। আর তিনটি শাস্তি আখেরাতে প্রকাশ পাবে তা হচ্ছে, সে আল্লাহর অসন্তোষ, কঠিন হিসাব ও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।[৩৯১]

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : যে ব্যক্তি মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের জামিনদার হবে আমি তার বেহেশতের জামিনদার হব।[৩৯২]

কখনো দেখা যায় দেবরের সঙ্গে জমে ওঠে পরকীয়া। ইসলাম দেবরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করার লাগামকেও টেনে ধরেছে। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, সাবধান! তোমরা নির্জনে নারীদের কাছেও যেও না। এক আনসারী সাহাবি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দেবর সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কী? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, দেবর তো মৃত্যুও সমতুল্য।[৩৯৩]

হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ফতহুল বারিতে লিখেছেন, এখানে মৃত্যুর সমতুল্যর অর্থ হলো হারাম। আর ইসলামে এসবের শাস্তি ভয়াবহ। এসবের শাস্তি হিসেবে রজম ও দোররার নির্দেশ এসেছে হাদীসে। যাতে কোনো নারী ও পুরুষ যেন এ ধরনের ভয়াবহ কর্মে লিপ্ত না হয়।

---

৩৯১. *বায়হাক্বী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫৬৪
৩৯২. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৭৬৫৮
৩৯৩. সহীহ মুসলিম, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ২৪৪৫

পরকীয়ার সাজা নিয়ে হাইকোর্টের রুল বনাম বাস্তবতা :

১৮৬০ সালে তৈরি ঐ আইনের ৪৯৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি কোনো মাহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করলে এবং ঐ মহিলার স্বামীর অনুমতি না থাকলে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল এবং জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। বিবাাহিত নারীকে অপরাধের শিকার বিবেচনা করে আইনে সম্পর্ক স্থাপনকারী পুরুষকেই দোষী হিসেবে গণ্য করার বিধান ছিল।[৩৯৪]

পরকীয়ার সাজাসংক্রান্ত দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারা কেন অবৈধ এবং অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সম্প্রতি বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি ইকবাল কবিরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। রিটে ৪৯৭ ধারা সংশোধনের নির্দেশনার আবেদনও রয়েছে।

দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারা অনুযায়ী কোনো স্ত্রী পরকীয়া করলে যার সঙ্গে পরকীয়া করবে শুধু সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। অথচ স্ত্রী বিরুদ্ধে স্বামীর কিছুই করার নেই। একইভাবে স্বামী পরকীয়া করলে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে বা যার সঙ্গে পরকীয়া জড়িত হবে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পাবেন না। উপরন্তু স্বামী যদি কোন বিধবা বা অবিবাহিত নারীর সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন এবং স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে পরকীয়ায় জড়িত হয় তা আইনত বৈধ। এ আইন সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ৩২ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং এটা অদ্ভুত ও বৈষম্যমূলক।

এর আগে পরকীয়া ফৌজদারি অপরাধ নয়, ইংরেজ শাসনকালে তৈরি এ আইনের ৪৯৭ ধারা অসাংবিধানিক এমনটিই রায় দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ প্রধান বিচারপ্রতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এই আইন স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। মহিলাদের স্বাতন্ত্র খর্ব করে। স্বামী কখনই স্ত্রীর প্রভু বা মালিক হতে পারে না। তবে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে বলে মত দিয়েছেন। ব্রিটিশদের তৈরি করা ১৮৬০ আইনকে চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলার প্রেক্ষিতেই শীর্ষ আদালত এ রায় দিয়েছেন।

৩৯৪. *বিবিসি বাংলা নিউজ*, ৩০ জুলাই ২০১৯

রায়ের পর থেকেই সাংবাদিক, আইনবিদ, মানবাধিকারকর্মী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা ও সাধারণ মানুষ গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছেন। আবেগ-উত্তাপ ও যৌক্তিক তর্ক-বিতর্ক এখনো চলছে, চায়ের দোকান থেকে টেলিভিশন টক শো ও পত্রিকার কলাম পর্যন্ত। সন্দেহ নেই আরও কিছুকাল চলবে। এটাই স্বাভাবিক।

১৮৬০ সালে তৈরি ঐ আইনের ৪৯৭ নম্বর ধারার সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন জৈনক যোশেফ শাইন। তবে শীর্ষ আদালত বলছেন পরকীয়া সম্পর্কের কারণে জীবনসঙ্গী যদি আত্মহত্যা করেন এবং আদালতে যদি তার প্রমাণ দাখিল করা যায় তবেই এটি অপরাধে পরোচনা হিসেবে গণ্য হবে। অন্যদিকে সরকারি কৌসুলিরা বিয়ের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে আইনটি বহাল রাখার পক্ষে ছিলেন। ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ১৯৭৯ সালের হুদুদ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী পরকীয়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে। তবে এ ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের শাস্তি পরিমাণ বেশি রাখা হয়।

ফিলিপিন্সে পরকীয়া এখনো অপরাধ। স্ত্রী আর তার সঙ্গীর ৬ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে, যদি তার স্বামী প্রমাণ করতে পারে যে, ওই পার্টনারের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রয়েছে তার স্ত্রীর। অন্যদিকে আবার যদি তার স্বামীর অন্যকোনো মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্ত্রী যদি প্রমাণ করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে স্বামীর ১দিন থেকে সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে ৪ বছর।

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় রক্ষণশীল দেশ সৌদি আরবে পরকীয়াকে বিরাট অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। স্বামী বা স্ত্রী যে কারও অভিযোগ প্রমাণিত হলে জরিমানা, নির্বিচারে আটক, জেল, মারধর এমনকি মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে।

আমাদের দেশে একটি কেস স্টাডি দিয়েই শুরু করি। সুজন ও রীতার (ছদ্মনাম) দাম্পত্য জীবন ভালোই চলছিল। হঠাৎ একটি মোবাইল ফোন তাদের সংসারকে তছনছ করে দেয়। সুজনের এক বন্ধু তাকে ফোন করে জানায় যে তার স্ত্রী রীতা অন্য আরেকটি ছেলের সাথে বসুন্ধরা সিটিতে ঘোরাফেরা করছে। ব্যবসায়ী সুজন বসুন্ধরা সিটিতে তখনই গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে থাকা ছেলেটির পরিচয় জানতে চায়। এ সময় সুজনের স্ত্রী উল্টো তাকে প্রশ্ন করেন আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনি না।

সুজন রাগ সংবরণ করতে না পেরে স্ত্রীকে কয়েকটি থাপ্পড় মারেন। নারীর গায়ে হাত তোলার অপরাধে উপস্থিত নিরাপত্তা রক্ষীরা সুজনকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। পরে পুলিশের জেরায় সব সত্য প্রকাশ করেন রীতা। এসময় রীতার প্রেমিক পুলিশকে বলেন, রীতার সঙ্গে আমার এক বছরের সম্পর্ক। অবিবাহিত হিসেবে পরিচয় দিয়েছে আমার কাছে। সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এসময় স্বামীকে না চেনার ভান করায় সুজনও রীতাকে ঘরে নিতে অস্বীকার করেন। ঘটনার কিন্তু এখানেই শেষ নয়! শেষমেশ রীতা সুজনের কাছে ক্ষমা চায় এবং প্রেমিক ওই পুরুষটি তাকে ভুল বুঝিয়ে এ পথে নামিয়েছে বলে তার বিচার দাবি করেন। সুজন শেষমেশ রীতার কথামতো ওই প্রেমিক পুরুষের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দেন।

বাংলাদেশের দন্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় ব্যভিচারের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো লোকের স্ত্রী জানা সত্ত্বেও বা সেটা বিশ্বাস করার অনুরূপ কারণ রয়েছে এমন কোনো নারীর সঙ্গে স্বামীর অনুমতি ছাড়া যৌনসঙ্গম করেন এবং অনুরূপ যৌনসঙ্গম যদি ধর্ষণের অপরাধ না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি ব্যভিচারের দায়ে দায়ী হবেন, যার শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্যম কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা যাবে। এ ক্ষেত্রে নির্যতিতাকে অন্য লোকের স্ত্রী হতে হবে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এ যে, ব্যভিচারের ক্ষেত্রে স্ত্রী লোকের কোনো শাস্তির বিধান আইনে নেই। ঐ স্ত্রী লোকটি যে দুষ্কর্মের সহায়তাকারিণী বা ব্যভিচারের অপরাধে দোষী অথচ তিনি কোনো সাজা পাবেন না। এ বিষয়ে মহামান্য লাহোর হাইকোর্ট একটি নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা পাকিস্তান লিগ্যাল ডিসিশন, ১৯৭৪ সন্নিবেশিত রয়েছে। মহিলারা আসামি হতে পারে না। তবে ওই পুরুষটির সাজা দিতে হলে অভিযোগকারীকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, ওই মহিলার সঙ্গে যৌনমঙ্গম করার সময় আসামি জানতো অথবা জানার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল যে, যৌন মঙ্গমকারী মহিলা অন্য কোনো ব্যক্তি স্ত্রী।

উল্লেখ্য, থাকে যে, কোনো মহিলাকে তার আগের স্বামী তালাক দিয়েছেন এ সরল বিশ্বাসে আসামি বিবাহ করলে তাকে এ ধারার অধীন দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে মহিলার সঙ্গে যৌনমঙ্গম করা হয় সে মহিলা ঐ সময় বিবাহিত না হলে এ ধারার অধীনে কোন অপরাধ আমলে আনা যায় না।

এ ধারার অধীন শাস্তি দিতে হলে বিবাহের বিষয়টি যথাযথভাবে প্রমাণ করতে হয়। তবে মহামান্য লাহোর হাইকোর্ট বলছে, অবিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রী যদি দীর্ঘদিন ধরে যে একত্রে বসবাস করে তাহলে বলা যাবে না, তারা ব্যভিচারের অপরাধ করেছে।

যেহেতু এ ধারার অপরাধ জামিনযোগ্য, অভিযুক্ত প্রেমিক পুরুষ আদালতে স্বেচ্ছায় আত্নসমর্পণপূর্বক জামিনের আবেদন জানান এবং বিচারক মহোদয় তাকে জামিন দেন। এ মামলায় আসামিকে সাজা দিতে হলে বাদীকে পাঁচটি বিষয় অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। প্রথমত- আসামি কোন নারীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করেছিল, দ্বিতীয়ত- ঐ নারী বিবাহিত ছিল, তৃতীয়ত, আসামি বিবাহের বিষয়টি জানত এবং তা বিশ্বাস করার কারণও ছিল, চতুর্থত ঐ যৌন সঙ্গম নারীর স্বামীর সম্মতি বা সমর্থন ব্যতিরেকে হয়েছিল, পঞ্চমত, ঐ যৌন সঙ্গম নারী ধর্ষণের সামিল ছিল না।

যেহেতু সাক্ষ্য আইনের ১০১ ধারামতে কোনো ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর। গোপাল চন্দ্র বনাম লাসমত দাসী মামলা যা ৩৪ ডিএলআর, ১৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, বিচার্য বিষয় সম্পর্কে যে পক্ষ কোনো ঘটনার অস্তিত্বের দাবি করে সে পক্ষই তা প্রমাণ করবে।

এ মামলায় আসামি যে নারীর সঙ্গে ব্যভিচারী করেছে, বাদী সুজন প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ায় বিচারিক প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে পাঁচ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড, সেই সাথে অর্থদন্ডের দন্ডিত করে রায় প্রদান করেন।

বাংলাদেশে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পর্দার গুরুত্ব :

ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা পালন করা ফরজ। ইসলাম উভয়কেই পর্দা পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন। পর্দা পালন করা মুসলিম নারীর অনন্য রুচিবোধ ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। পুরুষের জন্যেও পর্দা করা উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যম; পাশাপাশি নারীর মান-সম্মান, ইজ্জত রক্ষাকবচও বটে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। পর্দাহীনতার কারণে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে আজ সর্বত্রই লাঞ্ছনার শীকার হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষের প্রতি পর্দা পালনের বিষয়টি পবিত্র কুরআনুল কারিমে ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- (হে নবী! আপনি) মুমিন (পুরুষদের) বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিচু করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা কিছু করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত। (হে নবী! আপনি) ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে; এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত দাসি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৩৯৫]

ইসলামে 'পর্দার বিধান' অনেকের কাছেই গুরুত্বহীন ও অস্পষ্ট হয়ে আছে। তারা পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় ও অবরোধ মনে করেন। তাদের ধারণা- মুসলিম নারীরা পর্দার কারণে নিজেদেরকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখবে, এমনকি প্রয়োজনেও ঘর থেকে বের হতে পারবে না এবং কোন কাজেও অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। ধর্ম প্রচারক ও দায়ীগণের পর্দাবিধানের নির্দেশনাকে তারা ধর্মান্ধতা ও বাড়াবাড়ি মনে করেন, যা নিতান্তই অজ্ঞতা ও অযৌক্তিক। বরং হিজাব পরিহিতা নারী অতিরিক্ত সম্মান-মর্যাদা লাভ করেন এবং আল্লাহর অফুরন্ত দয়া, কল্যাণ ও বরকত লাভেও ধন্য হন। এমনকি পর্দা মেনে ইহজাগতিক সকল কাজেই অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় এবং অধঃপতনের সমাজেও আমরা লক্ষ্য করছি, যেসব নারী পর্দার মধ্যে বেড়ে ওঠে, তারা বখাটেদের অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকে। সাধারণত পর্দানশীন নারীদের উত্ত্যক্ত করতে দুষ্টরা দ্বিধাবোধ করে, তাদের প্রতি কিছুটা হলেও মমত্ববোধ ও দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন করে।

৩৯৫. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩০-৩১

আর এ কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (চাদরের) কিয়দংশ নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।'[৩৯৬]

ইসলামি শরিয়ত মূলত মানবতার কল্যাণের জন্যই প্রণীত। পর্দানশীন রমণী হিজাবের মাধ্যমে পরিপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করে। যৌন হয়রানি বন্ধ করার বড় হাতিয়ার হলো পর্দা ও হিজাব ব্যবস্থা। হিজাব হচ্ছে মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ইউনিফর্ম। যেমন বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সুনির্দিষ্ট ইউনিফর্ম থাকে। নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম না পরলে তাতে ওই পেশার যোগ্য বলে মনে করা হয় না। তেমনিভাবে মুসলিম নারীদের এ ইউনিফর্ম পরতেই হবে। তা তাদের জন্য দ্বীনি ফরজ বিধান। আমাদের দেশে হিজাব নিয়ে এক শ্রেণির প্রগতির ধ্বজাধারীরা যে বাগবিতন্ডা করে, মূলত জাহেলিয়াতের কারণেই তারা তা করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা নিয়ে তর্কবিতর্ক করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ হিজাব বা পর্দা আল্লাহ তায়ালা নির্দেশিত ফরজ বিধান। বেপর্দার কারণেই আজ সমাজে নারী নির্যাতন, যৌন হয়রানি, পরকীয়ার বলি, আত্মহননের বীভৎস চিত্র ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এসব থেকে মুক্তি পেতে সমাজে পর্দাপ্রথা পালনে কঠোরতা জারি করতে হবে। পাশাপাশি সকলের উচিত, চরিত্র ও নৈতিক অবক্ষয়সহ যাবতীয় ক্ষতি থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে পর্দার বিধান মেনে চলা। ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী পর্দা মেনে অশ্লীলতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা। নিজে নিরাপদ থাকা এবং অন্যকে নিরাপদ রাখা। আল্লাহ তাআলা সবাইকে পর্দা মেনে চলার তাওফিক দান করুন। ইসলাম বিশ্বজনীন এক চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি, রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের উপর আরোপ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান।

---

৩৯৬. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯

মূলত ‘হিজাব বা পর্দা’ নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়। এ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।’[৩৯৭]

ইসলাম পর্দা পালনের যে বিধান আরোপ করেছে তা মূলত অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরসনের লক্ষ্যে এবং সামাজিক অনিষ্টতা ও ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচার নিমিত্তেই করেছে। নারীদের প্রতি কোনো প্রকার অবিচার কিংবা বৈষম্য সৃষ্টির জন্য করেনি। বরং তাদের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার্থেই তাদের উপর এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণ অপরিহার্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।’[৩৯৮]

এ জন্য পর্দা-বিধান ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে সমাজ-ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে উম্মতের নারীদের জন্য অনেক বড় ইহসান। এ বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন দলিল। মানবসমাজকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দা বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে বর্তমান সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দা-বিধানের পূর্ণ অনুসরণ এখন সময়ের দাবি।

পর্দার বিধান :

পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলির মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান। আল্লাহ তায়ালাই এ বিধানের প্রবর্তক।

---

৩৯৭. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৩
৩৯৮. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৩

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ'।[৩৯৯]

এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকাই ঈমানের দাবি। এ বিধানকে হালকা মনে করা কিংবা এ বিধানকে অমান্য করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা করার অধিকার কারো নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ এবং তার রাসূল কোনো বিষয়ের নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা কোনো মু'মিন নারীর জন্য সে বিষয় অমান্য করার কোনো অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট।'[৪০০]

পর্দার পালনের গুরুত্ব :

পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪০১]

এ আয়াতে পর্দার সঙ্গে চলাফেরা করার গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে যে, পর্দার সহিত চলাফেরা করলে সবাই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে পর্দানশীন নারীদেরকে কেউ উত্যক্ত করার সাহস করবে না। প্রকৃতপক্ষে যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে অধিকাংশ সময় তারাই ইভটিজিং ও ধর্ষণসহ নানা রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং রাস্তাঘাটে তারাই বেশি ঝামেলার শিকার হয়। তাই নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার্থে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস শরীফেও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।[৪০২]

---

৩৯৯. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৩
৪০০. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৬
৪০১. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯
৪০২. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১১৭৩

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবীদের উদ্দেশ্যে) বললেন, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? তারা চুপ হয়ে গেলেন। (কেউ বলতে পারলেন না) এতে পর্দার গুরুত্ব পরিস্ফূটিত হয়। আর পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় বিবেকের দাবীও তাই। এছাড়াও পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে। কেননা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা পর্দানশীনদের ভালোবাসেন। আর কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।'[৪০৩]

প্রকৃত অর্থে তাকওয়া সম্পন্ন বা মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নির্দেশসমূহ মেনে চলে। আর সর্বসম্মতিক্রমে পর্দা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। যেহেতু পর্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ সেহেতু পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে। এছাড়াও পর্দা-বিধান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত হয়। পারিবারিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়। কারণ, পর্দা পালনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরকিয়াবিহীন পবিত্র জীবন গঠিত হয় এবং চরিত্রহীনতা ও অবিশ্বাস তাদের থেকে বিদায় নেয়। তাই মুসলিম উম্মাহ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য যে, দুনিয়া ও আখিরাতে পর্দার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

পর্দাহীনতার পরিণতি :

বাংলাদেশে মূলত পর্দাহীনতার কারণে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট পাপের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌন সন্ত্রাস প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে নানা অঘটনসহ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। যার বাস্তব চিত্র নিত্যদিনের সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে। এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে পরকিয়া ও চরিত্রহীনতার মতো ঘৃণিত কর্মের সূত্রপাত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উঠে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে।

---

৪০৩. *আল কুরআন*, ৪৯ : ১৩

যার বাস্তবতা আজ আমাদের নখদর্পণে। মূলত পর্দাহীন নারীরা হচ্ছে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট নারী। তাদের ব্যাপারে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচে নিকৃষ্ট তারাই যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।[৪০৪]

তাই আমরা বলতে পারি যে, সুসভ্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এমনকী অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রসূলুল্লাহ (রা.) তাদেরকে লা'নত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম (স.) লা'নত (অভিশাপ) দিয়েছেন সেসব নারীদেরকে যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। অর্থাৎ পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে।[৪০৫]

এছাড়াও পর্দাহীনতার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করা হয়। আর এ অবাধ্যতার কারণে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুই শ্রেণীর জাহান্নামীদেরকে আমি দেখিনি (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে তাদের দেখা যাবে)। এক. এমন সম্প্রদায়, যাদের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, আর সেই চাবুক দিয়ে তারা (অন্যায়ভাবে) মানুষকে প্রহার করবে।

দুই. এমন নারী, যারা পোশাক পরিধান করা সত্তেও নগ্ন। তারা অন্যদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের মাথা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়।[৪০৬]

এ হাদীসে মূলত পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকী জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। এ হাদীস থেকে পর্দাহীনতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

---

৪০৪. *বায়হাক্বী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১৩২৫৬
৪০৫. *সুনানে আবু দাউদ*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪০৯৭
৪০৬. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং-৫৪৪৫

তাই জান্নাত প্রত্যাশী কোনো নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, যেসব পুরুষ তাদের অধীনস্ত নারীদের পর্দায় রাখার চেষ্টা করে না, তাদের জন্যও অনুরূপ পরিণতি।

যেভাবে পর্দা পালন করতে হবে :

একজন নারীর পর্দা পালনের তিনটি পর্যায় রয়েছে। যথা- গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা, বাইরে গমনকালীন পর্দা এবং বৃদ্ধা অবস্থায় পর্দা। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেকটি পর্যায়ে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। সামনে পর্দার তিনটি পর্যায় সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হল।

গৃহে অবস্থানকালীন পর্দা :

নারীর প্রধান আবাসস্থল হলো তার গৃহ। সাধারণত গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা নারীর জন্য শোভনীয়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা নারীদেরকে তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে দেখা গেছে আমাদের সমাজে নারীরা বাইরে বেপর্দায় চলা ফেরা কারণে আজ ইভটিজিংএ শীকার হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় নিজেদেরকে প্রর্দশন করো না।[৪০৭]

আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নারীর প্রকৃত অবস্থানক্ষেত্র হচ্ছে তার গৃহ। নারী প্রয়োজন ব্যতীত গৃহের বাইরে যাবে না বরং গৃহেই অবস্থান করবে।[৪০৮]

মূলত নারী নিজেকে যত সংযত ও আবৃত রাখে আল্লাহ তায়ালার কাছে সে ততোই প্রিয় হয়ে ওঠে। ইসলামের দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব ততোই উচ্চতর হয়ে ওঠে। তাই মু'মিন নারীদের উচিত গৃহাভ্যন্তরে এমনভাবে অবস্থান করা যাতে আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের দৃষ্টিতে সে না পড়ে। আর এভাবে গৃহে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দার যথার্থতা অর্জিত হয়।

---

৪০৭. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৩৩
৪০৮. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং-৬/৪০৯

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, যখন তোমরা তাদের (নবী পত্নীদের) কাছে কিছু চাইবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।[৪০৯] এ আয়াতে বিশেষভাবে নবী-পত্নীদের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এ বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না, বরং পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিবে।

এ নির্দেশনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তেও গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষ, নিকটাত্মীয় হোক বা দূরাত্মীয় সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। তবে প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলবে। আর পরপুরুষরাও পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলতে হবে। এতে পর্দার অপরিহার্যতা পরিস্ফুটিত হয়। আয়াতের শেষাংশে পর্দার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পর্দার এ বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ (স.) এর পুণ্যাত্মা পত্নীদেরকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন।

অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূলে করীম (স.) এর সাহাবায়ে কিরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে। কিন্তু এসব বিষয় সত্বেও তাদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। (তাহলে বলুন তো) আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী-পত্নীদের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে। আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না![৪১০]

---

৪০৯. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৩
৪১০. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুপ্ত- ৭/১৯৫

বহু বিশুদ্ধ হাদীস থেকেও প্রতিভাত হয় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন বা নবীপত্নীরা সাধারণত তাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দা পালন করতেন। আল্লাহ তায়ালা মু'মিন নারীদেরকেও অনুরূপভাবে পর্দা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, (হে নবী!) মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তবে যা সাধারণত (অনিচ্ছা সত্ত্বে) প্রকাশিত হয়ে যায় তা ভিন্ন। তারা যেন ওড়না দিয়ে তাদের বক্ষকে আবৃত করে রাখে।

আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।[৪১১]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নারীরা মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ এমন পুরুষ যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ, তারা ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। এতে পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে বিরত থাক। তখন এক আনসার সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য।[৪১২]

আলোচ্য হাদীসে ব্যবহৃত 'হামউ' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে স্বামীর নিকটাত্মীয়। শব্দটির উদ্দেশ্য ব্যাপক। শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামীর যেকোনো দিকের ভাই, চাচা, মামা, খালু, ফুফা এবং তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে সন্তান। যেমন : দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, তাদের প্রত্যেকের ছেলে সন্তান ইত্যাদি।

---

৪১১. *আল কুরআন*, ২৪ : ৩১
৪১২. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং-৫২৩২

ইমাম তিরমিযী, লাইস ইবনু সা'দ, আল্লামা কাযী ইয়ায ও তাবারী সহ বহু আলেম অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ নারীর জন্য তার দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর ও তাদের ছেলেদের সামনে নিজেকে প্রদর্শন করা থেকে দূরে থাকতে হবে যেভাবে মৃত্যু থেকে দূরে থাকতে চায়। আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, নারীরা তাদের গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে মাহরাম নয় এমন সকল পুরুষ থেকে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলবে। অর্থাৎ নারীরা এমনভাবে গৃহে অবস্থান করবে যাতে নিকটাত্মীয় বা দূরাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা বেগানা পুরুষের নজরে সে না পড়ে। গৃহে অবস্থানকালীন মুহূর্তে এভাবে পর্দাবৃত থাকা নারীর জন্য অপরিহার্য।

বাইরে গমনকালীন পর্দা : বলা বাহুল্য যে, নারীদের জন্য গৃহের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য ইসলাম প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স.) তার স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৪১৩] মূলত ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তাই মানব প্রয়োজনের সকল দিকই ইসলামে বিবেচিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে পর্দাবৃত হয়েই বাইরে বের হতে হবে। কিছুতেই পর্দাহীনভাবে বের হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (স.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু, যখনই সে পর্দাহীনভাবে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে উঁকি মেরে তাকায়।[৪১৪]

আর পবিত্র কোরআনে নারীদেরকে বাইরে গমনকালীন মুহূর্তে পূর্ণ পর্দা পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট নির্দেশ, 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন (প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময়) তাদের (পরিহিত) জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৪১৫]

---

৪১৩. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং-৪৭৯৫
৪১৪. *সুনানে তিরমিযী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ১১৭৩
৪১৫. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৫৯

এ আয়াতে নারীদেরকে বাইরে গমনের সময় তাদের পরিহিত জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, জিলবাব হলো নারীর এমন পোশাক যা দিয়ে তারা পুরো দেহ ঢেকে রাখে। অর্থাৎ বাইরে গমনের সময় দেহের সাধারণ পোশাক- জামা, পাজামা, ওড়না ইত্যাদির উপর আলাদা যে পোশাক পরিধান করার মাধ্যমে নারীর আপাদমস্তক আবৃত করা যায় তাকে জিলবাব বলা হয়। আমাদের দেশে যা বোরকা নামে পরিচিত। এ থেকে বুঝা যায় যে, বাইরে গমনের সময় বোরকা পরিধান করে আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়া আবশ্যক। আর আয়াতে জিলবাবের একাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেয়া। যা সাহাবী, তাবেয়ী ও নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরদের তাফসীর থেকে প্রতিভাত হয়।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা (এ আয়াতে) মুমিন নারীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে তারা যখন বাইরে যাবে তখন তারা যেন জিলবাব দিয়ে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) তাদের মাথার উপর দিক থেকে তাদের মুখমণ্ডলও আবৃত করে নেয়। তবে তারা (চলাফেরার সুবিধার্থে) একটি চোখ খোলা রাখবে।[৪১৬]

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, আমি আবীদাহ সালামানীহকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি তার মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়েছেন যে, এ আয়াতে (পুরো দেহ আবৃত করার পর) মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪১৭]

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের পরবর্তী মুফাসসিরদের ব্যাখ্যার দিকে তাকালেও দেখা যায় যে, ইবনে জারীর তাবারী, ইবনে কাসীর, বায়যাবী, বাগভী, নাসাফী, সুয়ূতি, আবু বকর জাসসাস, মুফতি মুহাম্মদ শফিসহ সব তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন।

---

৪১৬. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬/৪৮২
৪১৭. *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৬/৪৮২

অর্থাৎ সকলে একমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতে নারীদেরকে তাদের চেহারাসহ আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বাইরে গমনকালীন পর্দার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। আর এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, কোনো প্রয়োজনে নারীকে বাইরে যেতে হলে তখন তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে চেহারাসহ গোটা দেহ আবৃত করে পূর্ণ পর্দার সঙ্গে বের হওয়া। যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। এক্ষেত্রে জিলবাব বা বোরকা পরিধানের মাধ্যমে আপাদমস্তক আবৃত করে নিবে। প্রয়োজনে চেহারা বা মুখমণ্ডলের জন্য আলাদা নিকাব ব্যবহার করবে। আর হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালীর জন্য মোজা পরিধান করবে। তবে চলাফেরার সুবিধার্থে রাস্তা-ঘাট দেখার জন্য শুধু চোখ খোলা রাখবে।

বয়স্ক অবস্থায় পর্দা :

বয়স্ক নারীদের জন্য পর্দা পালনের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা গ্রহণেন অবকাশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতিশয় বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের অতিরিক্ত বস্ত্র খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৪১৮]

আয়াতের নির্দেশনা হল, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয় তার জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। গায়রে মাহরাম ব্যক্তিও তার কাছে মাহরামমের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়। বৃদ্ধা নারীদের জন্য গায়রে মাহরাম পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত করা জরুরী নয়। এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্য বলা হয়েছে, মাহরাম পুরুষদের সামনে যেসব অঙ্গ খুলতে পারবে, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে।[৪১৯]

---

৪১৮. *আল কুরআন*, ২৪ : ৬০
৪১৯. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুপ্ত, ৬/৪৩৯

এ ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো, চরম বার্ধক্যে পৌঁছার কারণে যেসকল নারী বিবাহের উপযুক্ত নয় এবং যাদের প্রতি কারো আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না, এ ধরনের বৃদ্ধা নারীর জন্যই এ বিধান। তাদেরকে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে অন্যান্য নারীদেরকে যেমন আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে হয়, তাদের জন্য তা জরুরী নয়। এ রকম বৃদ্ধা নারীগণ তা ছাড়াই পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে শর্ত হল, তারা তাদের সামনে সেজেগুঁজে যেতে পারবে না। এর সঙ্গে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিধানের এ শিথিলতা কেবলই জায়েয পর্যায়ের। সুতরাং তারা যদি বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে এবং অন্যান্য নারীদের মত তারাও পরপুরুষের সামনে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করে চলে তবে সেটাই তাদের জন্য উত্তম।[৪২০]

পরিশেষে বলছি, এ বিধানের ব্যাপারে সারকথা হলো, কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সর্বসম্মতিক্রমে হিজাব বা পর্দা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নারী জাতির জন্য এক ফরয বিধান। সর্বাবস্থায় এ বিধানের প্রতি পূর্ণ সমর্পিত থাকা অপরিহার্য। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক শিথিলতা গ্রহণের অবকাশও অবশ্যই রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যথাযথভাবে এ বিধান পালনের তাওফীক দান করুক।

বাংলাদেশের সমকামিতা :

বাংলাদেশীরা প্রেম এবং যৌনতার ক্ষেত্রে আবহমান কাল ধরেই রক্ষণশীলতা অবলম্বন করে এসেছে। এছাড়া বাংলাদেশের সমাজে এগুলো ট্যাবু ছিলো। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয়ভাবেও কখনোই বৈধ করার চেষ্টা করা হয়নি এই প্রেম বা যৌন স্বাধীনতার ব্যাপারটা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে কখনোই সমকামিতা নিয়ে কোথাও কোনো কিছু লিখিত হয়নি; সমকামিতার কোনো লিপিবদ্ধ ইতিহাস বাংলাদেশে কখনোই পাওয়া যায়নি। যেহেতু বাংলাদেশের সমাজে যৌনতা, প্রেম এসব নিয়ে মানুষ তেমন একটা আলোচনা করতোনা কিংবা করলেও খুব গোপনে করতো এবং এসব সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ছিলো তাই এমনটা হয়েছে; ১৯৮০ এর দশকে কিছু পতিতালয়ে সমকামী পুরুষ যৌনকর্মীর কথা বাংলা সংবাদপত্রে উল্লেখিত হয় যদিও সমকামিতার পক্ষে কিছু লিখা হয়নি; আর তখনো

৪২০. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, প্রাগুপ্ত, ২/৪৬৮

'সমকামিতা' শব্দটি তখনো বাংলাদেশীরা ব্যবহার করতোনা, পত্রিকায় 'পায়ুকাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিলো। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে এক সমকামী পুরুষের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস ধরা পড়লে তাকেও পায়ুকামী এবং পুরুষ যৌনকর্মী উল্লেখ করে পত্রিকাগুলো। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমকাম বা সমকামী শব্দ ব্যবহৃত হতো। বাংলাদেশের চলচিত্র, নাটক সাহিত্য বা যে কোনো গণমাধ্যমে কখনো পায়ুকাম বা সমকাম কোনোটা নিয়েই কখনো খোলাসা আলোচনা করা হয়নি আর হলেও সেটা হয়েছে সমকামিতাকে নেতিবাচক এবং আপত্তিকর হিসেবে উল্লেখ করে এবং এটাও শুধু সংবাদপত্রে হয়েছে অন্যান্য জায়গায় সমকাম বা যৌনতা সম্পর্কিত আলোচনাও নিষিদ্ধ ছিলো। আবার বাংলাদেশির চলচিত্র বা নাটকে প্রেম উপস্থাপন হয়েছে রক্ষণশীলভাবে এবং সেটা ছিলো বিষকামী প্রেম। ২০১৫ সালে ডয়চে ভেলে বাংলার এক প্রতিবেদন জরিপে দেখা যায় মানুষের মতামত।[৪২১]

এবং ২০১৯ সালে ডয়চে ভেলে বাংলাতেই আরেকটি প্রতিবেদনের মতামত।[৪২২]

২০১৪ সালে সমকামীদের পক্ষ নিয়ে লিখা একটি সাময়িকী বের হয় যার নাম ছিলো রূপবান কিন্তু ২০১৬ সালে সাময়িকীটির সম্পাদক জুলহাজ মান্নান তার এক বন্ধু সহ রাজধানী ঢাকার কলাবাগানে দূর্বৃত্তদের দ্বারা খুন হলে সাময়িকীটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের মতো একটি রক্ষণশীল দেশে সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করাটা দুরূহ হলেও কিছু সংগঠন আছে যারা মানুষের সমকামের অধিকার বিষয়টি নিয়ে সক্রিয়। মূলত সমকামী হিসেবে কেউ আত্মপ্রকাশ করলে তাকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হতে হয়। বাংলাদেশে সমকামী অধিকারকর্মীদেও হত্যার হুমকি পেতেও জানা যায়। বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যকার প্রেম এবং বিয়ে কিছুটা সমর্থিত যদিও এ ক্ষেত্রেও অনেক সামাজিক এবং আইনি বাঁধা রয়েছে। সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যকার প্রেম একদমই সমর্থিত নয়। সম্মতি থাকলেও, ঠিক এই কারণে বাংলাদেশের মানুষরা তাদের সমকাম প্রবৃত্তি গোপন করেন আর প্রকাশ করলেও খুব কাছের বিশ্বস্ত মানুষের কাছে ছাড়া করেননা।

---

৪২১. *dw.com*, 28 october 2015
৪২২. *dw.com*, 26 may 2019

আইন ও অপরাধের ধারা সম্পাদনা বাংলাদেশের সংবিধান এ সকল নাগরিকের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার দেওয়া হলেও নৈতিক অবক্ষয়ভিত্তিক বিধিনিষেধ রয়েছে।

নাগরিক সংসদের একজন সদস্য হিসেবে প্রার্থিতা পাবে না যদি উক্ত নাগরিক কোন অপরাধী হয়, অথবা দুশ্চরিত্র অপরাধ এর দোষী সাব্যস্ত হয়। সমকামিতা নিয়ে যদিও বাংলাদেশে কোনো স্পষ্ট আইন নেই কিন্তু বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারা মোতাবেক পায়ুমৈথুন শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ, যার শাস্তি দুই বছর থেকে শুরু করে দশ বছর কারাদণ্ড এবং সাথে জরিমানাও হতে পারে। এ আইনে বলা হয়েছে - ৩৭৭ প্রকৃতিবিরুদ্ধ অপরাধ : কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোন পুরুষ, নারী বা পশু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করে, তবে দুই বছর কারাদণ্ড দেয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে যা দশ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অঙ্কের জরিমানাও দিতে হবে।

ব্যাখ্যা : ধারা অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণে যৌনসঙ্গমের প্রয়োজনীয় প্রমাণ হিসেবে লিঙ্গ প্রবেশের প্রমাণ যথেষ্ট হবে।৩৭৭ ধরার ব্যাখ্যায় পায়ুসঙ্গমজনিত যে কোন যৌন কার্যকলাপকে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ কারণে পায়ুমৈথুনও উক্ত আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। বালাদেশের বিয়ের আইনে একজন পুরুষ একজন নারীর সাথেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পাওে, সমলৈঙ্গিক বিয়ের কোনো স্বীকৃতি বাংলাদেশের আইনে নেই।

বিবাহ বিচ্ছেদ :

বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে নগর-গ্রাম নির্বিশেষে ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আইন অনুযায়ী মীমাংসার জন্য ৯০ দিন সময় দেয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সময়ে স্বামী-স্ত্রী যারা সম্পর্কের ইতি টানতে চান, তাদের উভয় পক্ষকে এক সঙ্গে নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সুযোগ দেয়া।

কিন্তু বাংলাদেশে এই আলাপ আলোচনার কাজটি এখনো মূলত পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং কাছের মানুষেরা করে থাকেন। পৃথিবীর অনেক দেশে এ ক্ষেত্রে মনোবিদ বা ম্যারেজ কাউন্সিলরের পেশাদার সাহায্য নিতে পারেন কোন দম্পতি। কিন্তু বাংলাদেশে পেশাদার কারো কাছে সাহায্য কমই পান বিবাদমান পক্ষ দুইটি।

বাংলাদেশে **১৯৬১** সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী তালাক দিতে চাইলে একজন ব্যক্তিকে তিন দফায় আইনি পত্র বা ডিভোর্স লেটার পাঠাতে হয়। প্রতি ৩০ দিনের ব্যবধানে একেকটি চিঠি পাঠাতে হয়। ৯০ দিনের মধ্যে কোন সমঝোতা না হলে তালাক কার্যকর হয়।[৪২৩]

বিবাহ বিচ্ছেদ এবং ৯০ দিন সময় :

সব কটি দফায় প্রথম স্বামী বা স্ত্রী যাকে সেটি পাঠানো হবে, তার ঠিকানার সাথে স্বামী বা স্ত্রী যে এলাকায় বসবাস করেন সেখানকার স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান বা সিটি কর্পোরেশন মেয়র বা কাউন্সিলরকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশের কপি পাঠাতে হয়।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা সালেহা বিনতে সিরাজ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, এ ধরনের আলোচনায় বসা গেলে অনেক সময়ই দুই পক্ষের জন্য ভালো হয়। তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে বিবাদ মিটিয়ে পুনরায় সংসারে ফিরিয়ে নেওয়া যায় স্বামী-স্ত্রীকে। কারণ এ ধরনের আলোচনায় আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে রিকনসিলিয়েশন বা পুনর্মিলন ঘটিয়ে দেয়ার। সংখ্যায় কম হলেও সেটা করা যায় অনেক সময়।

ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে ২০২০ সালে সাড়ে **১২** হাজারের বেশি ডিভোর্স হয়েছে। এর অর্ধেকের মত হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে। সালেহা বিনতে সিরাজ জানিয়েছেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ২০২০ সালে তালাকের জন্য আবেদনকারী ৩৮৪টি দম্পতি আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে নতুন করে সংসার শুরু করেছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, অনেক সময়ই আলোচনায় বসানো যায় না দুই পক্ষকে।

---

৪২৩. *বিবিসি বাংলা নিউজ*, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

অনেকে ডিভোর্স লেটারে ইচ্ছা করে ভুল ঠিকানা দেয়, তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার অনেকের প্রচন্ড অনীহা থাকে আপোষ করার ব্যাপারে। তবে এখনো কর্পোরেশনের নিজস্ব মনোবিদ বা ম্যারেজ কাউন্সিলর নেই।

আলোচনায় অনীহা :

তালাক হবার আগে ৯০ দিন সময় দেওয়া হয় যাতে কোন দম্পতির বিরোধ মীমাংসায় তৃতীয় আরেকটি পক্ষ, যিনি কোন একটি পক্ষের প্রতি বিশেষ অনুগত নন, নিরপেক্ষভাবে উভয়ের সমস্যা শুনে সমাধানের একটি উপায় বের করতে পারেন। কিন্তু অনেকেই বাইরের মানুষের সাথে নিজের ব্যক্তিগত বিষয় আলাপ করতে চায় না।

ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নারী কর্মী বিবিসিকে বলছিলেন, ২০১৭ সালে তিনি তার স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কে ইতি টেনেছেন। তার তৎকালীন স্বামীকে প্রথম দফা ডিভোর্সের চিঠি পাঠানোর পর, স্থানীয় কাউন্সিলরের অফিস থেকে তাকে এবং তার স্বামীকে চিঠি দিয়ে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তার স্বামী সেখানে যাননি।
বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রায় নিয়মিত তাদের মধ্যে মনোমলিন্য হচ্ছিল, তখনো তিনি কাউন্সিলরের কাছে যেতে চেয়েছেন একাধিকবার। কিন্তু তখনো তার স্বামী রাজি হননি, তিনি এ বিষয়ে কারো সাথে আলাপ করতেই রাজি ছিলেন না।

পেশাদার ম্যারেজ কাউন্সিলর :

বাংলাদেশে এক দশক আগে ও পেশাদার ম্যারেজ কাউন্সিলর পদটির সঙ্গে পরিচয় ছিল না সাধারণ মানুষের। গত এক দশকে শহর এলাকায় বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর মত বড় বিভাগীয় শহরে বেশ কিছু পেশাদার ম্যারেজ কাউন্সেলিং প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখনো এই সেবা গ্রহীতার সংখ্যা কম এবং তারা নাগরিক মানুষ। ঢাকায় কাউন্সেলিং সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ক্রিয়ার ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হাজেরা খাতুন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, শুরুতে একেবারেই হাতে গোনা মানুষ আসতেন এ সেবা নিতে। সেসময় অনেকে নাম পরিচয় গোপন রাখতে চাইতেন।

তবে ২০১৬ সালের পর থেকে ম্যারেজ কাউন্সেলিং বা ফ্যামিলি কাউন্সেলিং সেবা নিতে আসা মানুষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে।

হাজেরা খাতুন বলেছেন, তারা ডিভোর্সের আগে, ডিভোর্সের সময় এবং ডিভোর্স পরবর্তী এই তিন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাউন্সেলিং সেবা দেন। প্রথমে সমস্যা শুনি, এরপর যিনি সেবা নিতে এসেছেন তার সাথে অপর পক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। উভয় পক্ষ সম্মত হলে একসঙ্গে বসে আলোচনা করি। আমরা কোন সিদ্ধান্ত দেই না, বরং তারা যে পরিস্থিতিতে আছেন এবং যে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, তার সম্ভাব্য ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে উভয়ের কাছে একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরি। এরপর যে যার সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়।

হাজেরা খাতুন জানিছেন, সেবা নিতে এখনো পর্যন্ত নারীরাই বেশি আসছেন। এছাড়া প্রথম আলোচনার পর অনেক পুরুষই আর দ্বিতীয়বার ফেরত আসতে চান না। তিনি বলেন, কাউন্সিলরের কাছে যাওয়া নিয়ে সমাজে এক ধরণের স্টিগমা আছে, সেটা এখনো অনেকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে মনে রাখতে হবে সাহায্য চাওয়ার মধ্যে কোন লজ্জা নেই।

সন্ত্রাসবাদ :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এমপি বলেছেন, আজকের বিশ্বে গণতন্ত্র, শান্তি এবং মানব নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিগুলোর মধ্যে সন্ত্রাসবাদ একটি। আইনমন্ত্রী রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে মামলা ব্যবস্থাপনা এবং প্রসিকিউটরিয়াল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রোগ্রামের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারোয়ার, মার্কিন জেলা আদালতের বিচারক ডেভিড কার্টার অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের আবাসিক আইন উপদেষ্টা মিশেল প্রিন্স অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের ওপিডিএটি'র সহযোগিতায় ঢাকায় আয়োজিত ছয় মাস মেয়াদি এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশের সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও প্রসিকিউটরগণ অংশ গ্রহন করেন।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্প্রতি বন্দুকধারীর গুলিতে নিরপরাধ ১৯ শিক্ষার্থীসহ ২১ জন নিহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং নিহতদের স্মরণে কিছু সময় দাঁড়িয়ে নিরবতা পালনের আহবান জানালে সকলে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেন। আনিসুল হক বলেন, বৈশ্বিক হুমকি হওয়ায় বিশ্বের প্রতিটি দেশকে এ সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ সন্ত্রাস দমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থা মোকাবিলায় বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সন্ত্রাসবাদের প্রস্তুতি, সহায়তা এবং উস্কানিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে ২০০৯ সালে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন করেছে।

এছাড়া ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংঘটিত অপরাধ দমনের জন্য ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। উভয় আইন অনুসারে, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধের সুষ্ঠু ও কার্যকর বিচারের জন্য সারা দেশে সাতটি সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং আটটি সাইবার ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আনিসুল হক বলেন, করোনা মহামারির সময়েও জনগণের ন্যায় বিচারের অধিকার রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায়, 'আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ' জারি করে ভার্চুয়াল আদালত চালু করা হয়েছিল। করোনার মহামারি পরিস্থিতি সত্ত্বেও, সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালগুলো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আবেদন নিষ্পত্তি করেছে, যা জরুরি সমস্যা মোকাবিলায় এবং কারাগারে বন্দীদের ভিড় কমাতে অবদান রেখেছে।[৪২৪]

লিভ টুগেদার :

বাংলাদেশের সংবিধানে শুধু নয় বাংলাদেশের সকল আইনেই লিভ টুগেদার বৈধ নয় বরং অপরাধ। দন্ডবিধি ১৮৬০ সালের ৪৯৭ ধারা অপরাধকে লিভ টুগেদার বা ব্যাভিচার অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি ৭ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম ও জরিমানা। তবে এই অপরাধে নারী অপরাধী হয়না অপরাধী বাংলাদেশে বাড়ছে বিবাহ বহির্ভুত 'লিভ টুগেদার'।[৪২৫]

---

৪২৪. আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, *বাসস*, ঢাকা : ২৮ মে ২০২২
৪২৫. *অনলাইন সংস্করণ*, ৩০ নভেম্বর, ২০২১

গত এক দশক ধরে উন্নত অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও বিয়ে বা সামাজিকভাবে স্বীকৃত সম্পর্কের বাইরে গিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের একত্রে বসবাস বা লিভ টুগেদারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে এখনো সম্পর্ক খুবই সীমিত পরিসরে এবং গোপনে রয়েছে। এ ধরনের একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি বাংলা। সমাজবিজ্ঞানীদের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যমটি বলছে, বিশ্বায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের কারণে এ ধরনের সম্পর্কেও সংখ্যা ধীরে হলেও বাড়ছে।
এ বিষয়ে কথা হয়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকায় বসবাসকারী দুই যুগলের সঙ্গে, যারা প্রচলিত সম্পর্কের বাইরে গিয়ে একত্রে বসবাস করছেন।

"এ যুগল" বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে দুই পরিবারই প্রাথমিক সম্মতি জানিয়েছে। কিন্তু যখন আমরা দ্বৈত জীবন শুরু করি এসব চিন্তা মাথায় ছিলনা। দুই পরিবারই তুলনামূলক রক্ষণশীল হওয়ায় তখন এতটা অন্তরঙ্গতা মেনে নিতেন না। তাই আমরা পরিবারকে এ ব্যাপারে কিছুই জানতে দেইনি। পরস্পরের বোঝাপড়া ছিল তাই পারিবারিক স্বীকৃতির কথা না ভেবেও আমরা একসঙ্গে থাকা শুরু করি।

"বি যুগল" জানান, প্রথমে আমরা বন্ধু ছিলাম, সেখান থেকে ভালোলাগা শুরু হয়। বেশ কবছর আমরা রিলেশনে ছিলাম। তারপর ভাবলাম, যেহেতু আমাদের মধ্যে একটা স্থায়ী সম্পর্কে যাওয়ার বা বিয়ের ব্যাপারে একটা চিন্তা ভাবনা হচ্ছে, তাই ভাবসিলাম, সেটা পসিবল কিনা বা আমরা পরস্পরের জন্য ঠিক আছি কিনা। সেটা বোঝার জন্যই একসঙ্গে থাকতে শুরু করা।

বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের চাকরিরত এক তরুণী জানান, একসঙ্গে চাকরিরত অবস্থায় একজনকে অপরজনের ভালো লাগে, কিন্তু ওর পরিবারে অনেক দায়িত্ব রয়েছে, এখন তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়। আমিও এখনি বিয়ে করতে চাই না, তাই আমরা এক সঙ্গে বসবাস (লিভ টুগেদার) করছি।
ঐ তরুণী বলেন, আমাদের দুজনকেই ঢাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে হতো। তখন ভাবলাম, তাহলে একসঙ্গে কেন থাকি না। দুজনের খরচ যেমন কমবে, পাশাপাশি দম্পতি হিসেবে আমরা কেমন হবো, বোঝাপড়া কেমন হবে, সেটাও পরিষ্কার হবে। এসব ভেবেই একসঙ্গে বাসা ভাড়া করে থাকতে শুরু করি।

তিনি আরো জানান, ঢাকার একটি অভিজাত এলাকায় আমরা একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকি। ভাড়া নেয়ার সময় স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিতে হয়েছে। তবে আমাদের পরিবার এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। এদিকে লিভ টুগেদারে বাংলাদেশের যুগলরা কতটা আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এ নিয়ে বাংলাদেশে এখনো কোন গবেষণা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে যখন তাদের মধ্যে নানা সমস্যা দেখা দেয়, তখন তাদের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোন আইনগত বা সামাজিক সম্পর্কের বাইরে গিয়ে এভাবে একত্রে বসবাসের বিষয়টি বেরিয়ে আসে।

"বি যুগল" জানাচ্ছিলেন, তাদের পরিচিত এরকম বেশ কয়েকটি যুগল রয়েছেন, যারা এভাবে একত্রে বসবাস করছেন। কয়েকটি দম্পতি রয়েছেন, যারা একসময় লিভ টুগেদার করতেন, তবে এখন বিয়ে হয়ে গেছে। আবার কেউ কেউ রয়েছেন, যারা একসময় লিভ টুগেদারে থাকলেও সেই সম্পর্ক এখন ভেঙ্গে গেছে। তবে অনেকের মধ্যেই এ ধরনের সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বলে তিনি জানান। অনুসন্ধানে জানা যায়, শুধু উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোই নয়, সমাজের নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যেও এভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া একত্রে বসবাসের প্রচলন শুরু হয়ে গেছে।

বেসরকারি একটি কারখানায় কর্মরত সিদরাতুল মুনতাহা নামক এক কর্মকর্তা জানান, পেশাগত কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, নিজেদের মধ্যে ভালোলাগা থেকে অনেক কর্মী বা শ্রমিক আনুষ্ঠানিক কোন সম্পর্ক ছাড়াই একত্রে বসবাস করছেন, সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হলে অনেক সময় আমাদের কাছে অভিযোগও আসে। আবার কিছুদিন পর হয়তো তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, আবার নতুন কারও সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। প্রেম থেকে একাকীত্ব কাটানো বা আর্থিক সাশ্রয়ের কথা ভেবে অনেকে এভাবে সম্পর্কে জড়ান বলে তিনি ধারণা করেন।

বিষয়টি নজরে আনা হলে বেসরকারি সংস্থা আইন ও শালিস কেন্দ্রের পরিচালক নীনা গোস্বামী জানান, আমাদের কাছে এমন অনেক অভিযোগ আসে, যে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে একত্রে বসবাস করছেন, কিন্তু এখন বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। তারা সরাসরি লিভ টুগেদার করার কথা বলে না, কিন্তু এ ধরনের অভিযোগের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়।

পরবর্তী সময়ে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত প্রতারণা বা বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার মিতি সানজানা জানান, বাংলাদেশের আইনে দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের লিভ টুগেদার করার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন পরিষ্কার আইন নেই। তিনি আরও জানান, বিবাহিত ব্যক্তি যদি কোন বিবাহিত বা অবিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে লিভ টুগেদার করে, সেটা নানা রকম আইনের মধ্যে পড়ে, নানা শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে যদি একত্রে বসবাস করে সেক্ষেত্রে আইনে সরাসরি বা পরিষ্কারভাবে কিছু বলা নেই।

বৃদ্ধাশ্রম :

বৃদ্ধাশ্রম হলো মূলত বৃদ্ধ নারী পুরষের আবাসস্থল। বৃদ্ধাশ্রমকে অনেক সময় ইংরেজিতে ওল্ড পিপলস হোম বা ওল্ড এজ হোম বলা হয়, যদিও বৃদ্ধদের বাসস্থান বোঝানো হয়। সাধারণত সেখানে থাকা প্রত্যেককে বা প্রত্যেক দম্পতি একটি করে ঘর বা রুম স্যুট পায়। ভবনটির মধ্যেই তাদের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা প্রদান করা হয়। যার মধ্যে খাবার, একত্রিত হওয়া, চিত্তবিনোদন এবং কিছু সুস্বাস্থ্য ও অসুস্থতাজনিত সেবা প্রদান। বৃদ্ধাশ্রমে থাকার স্থান ভাড়ার ভিত্তিতে পাওয়া যায় অথবা অ্যাপার্টমেন্টের মতো, কন্ডেমিয়ামের মতো একই ভিত্তিতে সেখানে তা চিরস্থায়ীভাবে ক্রয় করা যায়। বৃদ্ধাশ্রম এবং নার্সিং হোমের মধ্যে পার্থক্য মূলত প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার মানের ক্ষেত্রে। বৃদ্ধাশ্রম থেকে ব্যতিক্রম, অবসরপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে সাধারণত পৃথক এবং স্বতন্ত্র বাড়ি থাকে।

বৃদ্ধ বাবা-মাকে সন্তানরা যাতে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য হয়, তার জন্য আইন করা হচ্ছে। সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিলেও, আইন যাতে দ্রুত হয় সেজন্য আদালতে গেছেন এক আইনজীবী। এর এ নিয়ে সরকারকে নোটিশ দিয়েছে আদালত। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ সিলেটের সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা জানান ডয়চে ভেলেকে। তিনি বলেন, সেখানে একটি পরিবারে বৃদ্ধ বাবাকে বাড়িতেও থাকতে দেয়নি তার একমাত্র সন্তান। অথচ এই সন্তানকে তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অ্যাডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ মনে করেন, বাংলাদেশে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ লোপ পাচ্ছে।

এ কারণে বাংলাদেশে এখন ইউরোপ বা অ্যামেরিকার মতো ওল্ড হোম গড়ে উঠছে। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে এই হোমগুলো। অযত্ন বা অবহেলায় তারা শেষ জীবন পার করছে। যা এদেশের ঐতিহ্যের পরিপন্থী এবং অমানবিক। তাই বুধবার হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে একটি রিট আবেদন করেন ফরিদুজ্জামান ফরহাদ। আবেদনে তিনি বৃদ্ধ বাবা মাকে সন্তানরা যাতে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকে, তার জন্য আইন করার কথা বলেন। আদালতও তার আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেছে বলে জানা যায়। আদালত বলেন, এ বিষয়ে আইন করতে সরকারকে কেন নির্দেশ দেওয়া হবেনা, তা চার সপ্তাহর মধ্যে জানাতে হবে। বাংলাদেশেও বৃদ্ধ বাবা-মায়ের শেষ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে বৃদ্ধাশ্রমে।

অ্যাডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ জানান, এ আইন হলে বৃদ্ধ বাবা- মার ভরণপোষণের জন্য সন্তানদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ দিতে হবে। আর না দিলে জেল অথবা জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে। এ বিষয় নিয়ে যোগাযোগ করা হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জানায় যে, তারা এ নিয়ে একটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। প্রস্তাবিত আইন অনুযায়ী বৃদ্ধ বাবা-মাকে সন্তানের সঙ্গে রাখতে হবে। ওল্ড হোম বা বৃদ্ধশ্রমে রাখা যাবেনা। তবে তারা স্বেচ্ছায় অন্য কোনো বাড়িতে থাকতে চাইলে সন্তানকে তাদের মাসিক আয়ের ১০ ভাগ দিতে হবে। একাধিক সন্তান হলে, তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভরণপোষণের বিষয়টি ঠিক করবে। আর কেউ এ আইন না মানলে তার সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদন্ড এবং ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা হবে। জানা গেছে, এ ধরনের একটি আইন করতে জাতীয় সংসদে বেসরকারি দিবসে কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মুজিবুল হক চুন্নু প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার ভিত্তিতেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। তবে তা আইনে পরিণত করতে আরো কয়েকটি ধাপ পেরোতে হবে।

পারিবারিক সহিংসতা :

পারিবারিক সহিংসতা (গৃহ নির্যাতন বা পরিবারে সংঘটিত সহিংসতা নামেও পরিচিত) বলতে বিবাহ বা একসাথে বসবাসের মতো পারিবারিক পরিবেশে সংঘটিত সহিংসতা বা অন্যান্য নির্যাতনকে বোঝানো হয়।

সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সহিংসতার প্রতিশব্দ হিসেবে পারিবারিক সহিংসতা প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, যা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকা একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি করে থাকে এবং বিপরীত লিঙ্গের সম্পর্কগুলোতে বা একই লিঙ্গ ভিত্তিক সম্পর্ক কিংবা প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী বা সঙ্গীদের মধ্যে হতে পারে। বিস্তৃত অর্থে, শিশু, কিশোর, বাবা-মা বা বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সহিংসতাও পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে বিবেচিত। এটি শারীরিক, মৌখিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রজননমূলক এবং যৌন নির্যাতনসহ একাধিক রূপ পরিগ্রহ করে, যেখানে সূক্ষ্ম, জবরদস্তিপূর্ণ রূপ থেকে শুরু করে বৈবাহিক ধর্ষণ, দমবন্ধ, মারধর, নারী জৌনাঙ্গের বিকৃতি এবং এসিড নিক্ষেপের মতো সহিংস শারীরিক নর্যাতন পর্যন্ত হতে পারে যা অবশেষে পঙ্গুত্ব বা মৃত্যু ডেকে আনে। পারিবারিক হত্যা কান্ডের মধ্যে রয়েছে পাথর মেরে হত্যা করা, গৃহবধূকে অগ্নিদগ্ধ করা, অনার কিলিং বা সম্মান রক্ষার্থে হত্যা এবং যৌতুকের কারণে মৃত্যু (যা কখনও কখনও পারিবারের সদস্যের যোগসাজসে হয়ে থাকে)।

বিশ্বব্যাপী পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিরা অধিকাংশই নারী এবং নারীরাই সহিংসতার সবচেয়ে ভয়াবহ ধরনের মুখোমুখি হন। আবার তারা পুরুষের তুলনায় ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সহিংসতাকে আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবেও ব্যবহার করেন। কিছু কিছু দেশে পারিবারিক সহিংসতাকে আইনগত অনুমোদিত হিসেবেও দেখা যায়, বিশেষত যদি নারী প্রকৃতই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেন বা সন্দেহভাজন হন। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি দেশের লিঙ্গ সমতার স্তর এবং পারিবারিক সহিংসতার হারের মধ্যে একটি প্রতক্ষ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ পারস্পারিক সম্পর্ক রয়েছে, লিঙ্গ সমতা কম থাকা দেশগুলোতে পারিবারিক সহিংসতা অনেক হারে বেশি। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই বিশ্বব্যাপী পারিবারিক সহিংসতা সর্বাধিক অবহেলিত অপরাধগুলোর মধ্যে একটি। পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি সামাজিকভাবে লজ্জার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় বলে পারিবারিক সহিংসতার শিকার পুরুষরা স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের দ্বারা অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। পারিবারিক সহিংসতা প্রায়শই ঘটে যখন নির্যাতক ব্যক্তি মনে করেন যে, নির্যাতন করা এক প্রকার অধিকার, গ্রহণযোগ্য, ন্যায়সঙ্গত বিষয় বা এ বিষয়ে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

এটি আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক সহিংসতার একটি চক্র তৈরি করতে পারে যেখানে এ ধরনের সহিংসতাকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। অনেক লোক নিজেকে নির্যাতনকারী বা ভুক্তভোগী হিসেবে স্বীকৃতিদেয় না

কারণ তারা তাদের অভিজ্ঞতাগুলো অনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করেন।[৪২৬]

পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা, এর উপলব্ধি, সংজ্ঞা এবং দলিলিকরণের বিষয়টি দেশে দেশে ব্যাপকভাবে ভিন্ন। পারিবারিক সহিংসতা প্রায়শই জোরপূর্বক বিয়ে বা বাল্যবিবাহের প্রেক্ষাপটে ঘটে থাকে। নির্যাতন কেন্দ্রিক সম্পর্কগুলোতে, নির্যাতনের একটি চক্র থাকতে পারে যেখানে প্রথমে উত্তেজনা বাড়তে থেকে এবং তারপর সহিংসতার ঘটনা ঘটে থাকে, অতঃপর মিলন এবং শানতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্নতা, শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ, নির্যাতকের সঙ্গে যন্ত্রণাদায়ক বন্ধন, সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা, আর্থিক সংস্থান, ভয়, লজ্জা এবং বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য পারিবারিক সহিংস পরিস্থিতিতে আবদ্ধ হতে পারেনা। নির্যাতনের ফলস্বরূপ ভুক্তভোগীগণ শারীরিক অক্ষমতা, অনিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন, দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা, মানসিক অসুস্থতা, সীমাবদ্ধ অর্থসংস্থান এবং সুস্থ সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে দুর্বলতার পরিচয় ইত্যাদি নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যে শিশুরা সহিংসতাপূর্ণ পরিবারে বসবাস করে তারা প্রায়শই ছোট বেলা থেকে বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় ভোগে, যেমন এড়িয়ে চলা, অযাচিত অতিরিক্ত ভীতি এবং অনিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন, যা পরিণতিতে পরোক্ষ মানসিক আঘাত তৈরিতে অবদান রাখতে পারে।[৪২৭]

সামাজিক দিক :

পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রকম, তবে পশ্চিমের বাইরে অনেক জায়গায় ধারনাটি নিয়ে যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি আছে। কারণ এই দেশগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ককে সমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, বরং এমন একটি সম্পর্ক হিসেবে বিবেচিত হয় যেখানে স্ত্রীকে স্বামীর কাছে নিজেকে সমার্পণ করতে হবে। এটি কয়েকটি দেশের আইনে অনুমোদিত হয়েছে- উদাহরণস্বরূপ, ইয়েমেনে বিবাহ বিধি অনুসারে একজন স্ত্রীকে অবশ্যই তার স্বামীর আনুগত্য করতে হবে এবং তার অনুমতি ব্যতীত বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না।

৪২৬. Internet, from *Journal of family violence*, 29 (1) : 35-49
৪২৭. Internet, from *Attachment & Human Development,* 9 (3) : 187-205

ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন ইন ফ্যামিলি এন্ড রিলেশনশিপস অনুসারে, ”বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে বেশিরভাগ জনগণের মধ্যে স্ত্রীর প্রহারকে ন্যায্য হিসাবে দেখা হয়, সাধারণত স্ত্রীদের যদি প্রকৃত বা সন্দেহভাজন বিশ্বাস ভঙ্গকারী হয়ে থাকে বা স্বামীর প্রতি অবাধ্য হয়ে থাকে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই হিংসাত্মক কাজগুলো প্রায়শই সমাজে (পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের কাছে) নির্যাতন হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং স্ত্রীর উস্কানিমূলক আচরণে এমনটি ঘটে বলে মনে করা হয় এবং তাকেই দোষী হিসেবে দেখা হয়। যেখানে স্ত্রীকে মারধর করা প্রায়শই অনুচিত আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সমর্থিত, সেখানে অনেক স্থানে সম্মান রক্ষার্থে হত্যার মতো চরম আচরণও সমাজের উচ্চতর শ্রেণি দ্বারা অনুমোদিত হয়। এক সমীক্ষায় জর্দানের রাজধানী আম্মানের ৩৩.৪% কিশোর সম্মান রক্ষার্থে হত্যার অনুমোদন দিয়েছে। এই জরিপটি জর্ডানের রাজধানীতে পরিচালিত হয়েছিলো, যা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি উদার। গবেষকরা এ প্রসঙ্গে বলেন “আমরা মনে করতেই পারি যে জর্ডানের আরও গ্রামীণ ও রক্ষণশীল অংশগুলোতে সম্মান রক্ষার্থে হত্যার পক্ষে সমর্থন আরও বেশি হবে।”

২০১২ সালের একটি সংবাদ প্রতিবেদনে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, রয়টার্স ট্রাস্ট ল গ্রুপটি ভারতকে এই বছর নারীদের জন্য বিশ্বের অন্যতম খারাপ দেশ হিসেবে অভিহিত করেছে, অংশত যেহেতু পারিবারিক সহিংসতা সেখানে প্রায়শই লক্ষ্যণীয়। ইউনিসেফের একটি ২০১২ সালের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ১৫ এবং ১৯ বছর বয়সী ৫৭ শতাংশ থেকে ভারতীয় ছেলে এবং ৫৩ শতাংশ মেয়ে স্ত্রী মারধরকে ন্যায্য বলে মনে করে।

রক্ষণশীল সংস্কৃতিতে, অপর্যাপ্ত পোশাক পরা একজন স্ত্রী তার স্বামী বা আত্মীয়দের হাতে মারাত্মক সহিংসতার শিকার হতে পারেন, সমাজের বেশিরভাগ মানুষ এই হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়াকে যথাযথ মনে করে, এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আফগানিস্তানের ৬২.৮% মহিলা বলেছেন, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রহার করতে পারেন যদি সে স্ত্রী অনুপযুক্ত পোশাক পরিধান করে।

পারিবারিক সহিংসতায় ধর্মের প্রভাব নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম চিরায়তভাবেই পুরুষ শাসিত পরিবার সমর্থন করেছে এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতাকে প্রাচীন কাল থেকে সামাজিক অনুমোদন দিয়েছে। ক্যাথলিক চার্চ বিবাহ বিচ্ছেদেও বিরোধিতা করার জন্য সমালোচিত হয়েছিলো

কেননা তা অবমাননাকর বিবাহে সহিংসতার শিকারদের ব্যক্তিকে আটকে ফেলে। পারিবারিক সহিংসতার ওপর ধর্মেও প্রভাব সম্পর্কিত মতামতে ভিন্নতা লক্ষণীয়। ফিলিস চেসলারের মতো কিছু লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ইসলাম নারীর প্রতি সহিংসতার সাথে যুক্ত, বিশেষত সম্মান রক্ষার্থে হত্যার প্রতিক্রিয়ায়। অন্যান্যরা যেমন-পাকিস্তানের আগা খান বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক তাহিরা শহিদ খান যুক্তি দেন যে, ধর্মের কারণে নয়, বরং মূলত পুরুষের আদিপত্যবাদ এবং সমাজে নারীর হীন অবস্থান এ ধরনের সহিংসতাকে পরিচালিত করে। অনেক পশ্চিমা দেশেই এবং ইসলাম, অভিবাসন এবং নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মধ্যে সম্পর্কেও বিষয়ে উম্মক্ত (যেমন মিডিয়ার মাধ্যমে) এবং রাজনৈতিক বক্তৃতা অত্যন্ত বিতর্কিতভাবে দেখা হয়।

পারিবারিক সহিংসতাকে অপরাধ বিবেচনা করে এমন পর্যাপ্ত আইন অভাব বা বিকল্প আইন যা সম্মতিজনক আচরণ নিষিদ্ধ করে, ডিভির ঘটনা হ্রাস করার ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্ট করতে পারে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল বলেছেন, “এটি অবিশ্বাস্য যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কয়েকটি দেশ বাল্য বিবাহ ও বৈবাহিক ধর্ষণকে উপেক্ষা জানাচ্ছে এবং অন্যরা গর্ভপাতকে অবৈধ করেছে, বিবাহের বাইরে যৌনতা এবং সমকামী যৌন ক্রিয়াকলাপকে এমনকি মৃত্যুদন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে।” ডাব্লিউএইচএও এর মতে “ নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অন্যতম সাধারণ ধরনটি স্বামী বা পুরুষ সঙ্গী দ্বারা সম্পাদিত।” ডাব্লিউএইচএও উল্লেখ করে যে, এ ধরনের সহিংসতা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয় কারণ প্রায়ই “আইনী ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক নিয়মে এটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না, বরং একটি ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় বা জীবনের একটি সাধারণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।” ব্যভিচারের অপরাধকে নারীদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক সহিংসতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এই নিষেধাজ্ঞাগুলো প্রায়শই আইন হিসেবে বা বাস্তবে পুরুষদের আচরণ নয় বরং নারীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য করা হয় এবং নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার কর্মকান্ডকে যুক্তিযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

হিউম্যান রাইটস হাই কমিশনার নাভিপিল্লাইয়ের মতে, “কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন এবং তর্ক করে চলেছেন যে, পারিবারিক সহিংসতাকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ধারনাগত কাঠামোর বাইরে রাখা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানদন্ডের অধীনে নারীদের অধিকার সমুন্নত রাখতে এবং

বৈষম্য থেকে মুক্তি নিশ্চিত করতে লিঙ্গ নির্বিশেষে এবং পরিবারে কোনো ব্যক্তির অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং প্রতিকার প্রদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরও সুস্পষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

পারিবারিক সহিংসতার শিকারদের সম্পর্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা আরো বেশি নির্যাতন রোধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষণশীল সম্প্রদায়গুলোতে তালাকপ্রাপ্ত নারী প্রায়শই প্রত্যাখ্যাত এবং একঘরে বোধ করেন। এ কলঙ্ক এড়াতে অনেক নারী বিবাহবন্ধনে থাকতে এবং নির্যাতন সহ্য করাকে মেনে নেন। বৈষম্যমূলক বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের আইনও এ ধরনের অনুশীলনের প্রসাওে ভূমিকা নিতে পারে। যখন সে তার স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হয় বা স্বামী মারা যায়, তখন সে তার বাড়ি, জমি, বাড়ির জিনিসপত্র এবং অন্যান্য সম্পত্তি হারাতে পারে।

বিচ্ছেদ বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর সম্পত্তির সমানাধিকার নিশ্চিত করতে ব্যর্থতা নারীদের সহিংস বিবাহ ত্যাগে নিরুৎসাহিত করে, যেহেতু নারীর সামনে তখন দুটোই পথ থাকে; হয় ঘরে বসে সহিংসতা সহ্য করা নয়তো রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি করা। বিবাহ বিচ্ছেদ পেতে আইনি অক্ষমতাও পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধিও একটি কারণ। কিছু সংস্কৃতিতে যেখানে পারিবারিকভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করা হয় সেখানে একজন নারী তার স্বামীর বা পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের সম্মতি ছাড়াই বিচ্ছিন্নতা বা বিবাহ বিচ্ছেদের চেষ্টা করলে সম্মান ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হতে পারে। কনে মূল্যের রীতিনীতি বিবাহকে আরও কঠিন করে তোলে; সেখানে যদি স্ত্রী চলে যেতে চায় তাহলে হয়ত স্বামী তার পরিবারকে দেয়া কনে মূল্য ফেরৎ চাইতে পারে। যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশগুলোতে পারিবারিক সহিংসতার শিকারদের বিকল্প আবাসন পেতে অসুবিধা হতে পারে যা তাদের অবমাননাকর সম্পর্কের মধ্যে থাকতে বাধ্য করতে পারে।

অনেক পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তি নির্যাতক ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে যেতে বিলম্ব করে কারণ তাদের পোষা প্রাণী রয়েছে এবং চলে গেলে পোষা প্রাণীদের কী হবে তা নিয়ে তারা চিন্তিত থাকেন। সেফ হাউসগুলোতে পোষা প্রাণীকে আরও গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া দরকার কেননা অনেকেই পোষা প্রাণী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

ব্যক্তি বনাম পারিবারিক এককের অধিকার :

একক হিসাবে পরিবেরের অধিকারের বিপরীতে পরিবেরের সদস্যের স্বতন্ত্র অধিকারগুলো বিভিন্ন সমাজে উলেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। এটি এমন এক মাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে যেখানে সরকারও কোন পারিবারিক ঘটনা তদন্ত করতে ইচ্ছুক হতে পারে। কিছু সংস্কৃতিতে পরিবারের পৃথক সদস্যরা সামগ্রিকভাবে পরিবারের স্বার্থের পক্ষে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব স্বার্থ ত্যাগ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত স্বায়ত্বশাসন বা স্বাধিকারের অযৌক্তিক দাবি সেখানে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে নিন্দিত হয়। এই সংস্কৃতিগুলোতে পরিবার ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য করে এবং এটি সম্মানের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হয়, ব্যক্তিক পছন্দ এখানে সম্প্রদায়ের ভেতরে পারিবারিক সুনাম ক্ষুন্ন করতে পারে যা পরিণতিতে চূড়ান্ত শাস্তি যেমন সম্মান রক্ষার্থে হত্যার কারণ হতে পারে।

অভিবাসন নীতি :

কিছু দেশের অভিবাসন নীতি নাগরিকত্ব পেতে আগ্রহী ব্যক্তি তার স্পনসরের সাথে বিবাহিত কিনা তা নিয়েই জড়িত। এর ফলে ব্যক্তি সহিংস সম্পর্কের মধ্যে আটকা থাকতে পারে- এই ধরনের ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করলে তাদের নির্বাসিত হওয়ার ঝুঁকির তৈরি হতে পারে (তাদেন বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক বিয়ে করার অভিযোগ উঠতে পারে)। প্রায়শই যেসব সংস্কৃতিতে নারী নিজ বিবাহ পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে গেলে তাদের পরিবার থেকে অসম্মানিত হয়, সেখানে তারা বিবাহিত থাকতেই পছন্দ করে আর তাই নির্যাতনের চক্রের মাঝে বন্দী হয়ে থাকে।

অভিবাসী সম্প্রদায় :

অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রায়শই এই সম্প্রদায়গুলোতে নিয়ন্ত্রক দেশের আইন ও নীতি সম্পর্কে খুব কম সচেতনতা থাকে। যুক্তরাজ্যের প্রথম প্রজন্মের দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইংরেজ আইনের অধীনে অপরাধমূলক আচরণ

বলতে কী বোঝায় তা সম্পর্কে তাদের খুব কম জ্ঞান ছিল। গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন, বিবাহের মধ্যেই যে ধর্ষণ হতে পারে এমন কোনও রকমের সচেতনতা তাদের ছিল না। অস্ট্রেলিয়ায় করা একটি গবেষণায় অভিবাসী নারীদের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী দ্বারা নির্যাতিত এবং কোন প্রতিবেদন করেনি এমন কিছু নারীদের নমুনা নেয়া হয়েছিল, সেখানে দেখা গেছে, ১৬.৭% জানেনা ডিভি অবৈধ, এবং ১৮.৮% জানেন না তারা সুরক্ষা পেতে পারেন।

বাংলাদেশের মদ :

বাংলাদেশের নতুন অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুযায়ী ২১ বছরের নীচে কেউ মদ্যপানের পারমিট পাবে না। এ বিধিমালায় মূলত অ্যালকোহল জাতীয় মাদকদ্রব্য কোথায় বেচাকেনা হবে, মদ্যপায়ীরা কোথায় বসে মদ পান করবেন, পরিবহনে করতে পারবেন কিনা- এসব বিষয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে বলে বলছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।[৪২৮]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের নতুন বিধিমালার কয়েকটি ধারা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই বিধিমালায় বলা হয়েছে "২১ বছরের নিম্নের কোনো ব্যক্তিকে মদ্যপানের জন্য পারমিট প্রদান করা যাইবে না”। কেউ কেউ এটাকে ব্যাখ্যা করছেন এভাবে যে,"বাংলাদেশে ২১ বছর বয়স হলেই মদ পানের লাইসেন্স পাওয়া যাবে। "আবার কোনো এলকায় ১০০ জন পারমিটধারী মদপানকারী থাকলে ওই এলাকায় বিক্রির লাইসেন্স দেয়া হবে” বিধিটিও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে,"বিধিমালার ওই শর্তগুলোর অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কারণ মদ পানের পারমিট পাওয়া আইনেই শর্ত সাপেক্ষ।

বরং বয়স আরো একটি নতুন শর্ত হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে বিধিমালায়। আর বিক্রির লাইসেন্স পেতে ১০০ জন পারমিটধারীর শর্তটি আগে বোর্ডের সিদ্ধান্তে প্রচলিত ছিলো। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ অনুযায়ী মুসলিম ছাড়া বাংলাদেশে বসরবাসরত বিদেশি, অন্যধর্মের অনুসারী যাদের ধর্মে মদ পান নিষিদ্ধ নয়, বিশেষ পেশা যেমন চা শ্রমিক, পরিচ্ছন্নকর্মী তারা শর্তসাপেক্ষে মদ পান করতে পারেন। ইসলাম ধর্মে মদ পান নিষিদ্ধ বিধায় সাধারণ বিবেচনায় তারা মদ পানের পারমিট পান না। তবে শর্তসাপেক্ষে স্বাস্থ্যগত কারণে মদ পানের পারমিট দেয়া হয় মুসলিমদের। বিধিমালা

৪২৮. *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

তৈরির আগে পারমিটের ব্যাপারে বয়সের কথা উল্লেখ ছিলোনা। বিধমালায় শর্ত সাপেক্ষে পারমিট পেতে হলেও কমপক্ষে ২১ বছর বয়সী হতে হবে।

তারা যা বলেন, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুস সবুর মন্ডল জানান,"মুসলামান ছাড়া অন্য ধর্মের অনুসারীরা মদ পান করতে পারবেন কিন্তু পারমিট নিতে হবে। আইনে এটা আগে থেকেই আছে। কিন্তু এখন বিধিমালায় সর্বনিম্ন বয়স ২১ বছর করা হয়েছে। এর কম বয়স হলে পারমিট পাবেন না। মুসলিম হলে তাকে সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ের একজন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র লাগবে স্বাস্থ্যগত কারণে পারমিট নিতে। তাদেরও বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে। আইনে এই বয়সের শর্তটি ছিল না।"

বিধিমালায় মদ উৎপাদন, বিক্রি, বিলাতি মত আমদানি, কাঁচামাল আমদানি, দেশি এবং পাহাড়ি এলাকায় মদ তৈরির বিষয়ও স্পষ্ট করা হয়েছে। বলা হয়েছে কোনো এলাকায় মদ বিক্রির লাইসেন্স পেতে হলে ওই এলাকায় কমপক্ষে ১০০জন পারমিটধারী মদ্যপায়ী থাকতে হবে। এই বিধিমালায় মদের বার, মদের দোকান, পরিবহণ, বারের কর্মচারী সব বিষয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে। আবদুস সবুর মন্ডল বলেন,"আগে আমরা মদ বিক্রির লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে ওই এলকায় কমপক্ষে ১০০ জন পারমিটধারী থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিতাম। কিন্তু সেটা বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। তবে এটা এখন বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত করা হল।"

তিনি বলেন,"এই বিধিমালা নিয়ে এখন পর্যন্ত বিভ্রান্তির কোনো অবকাশ নেই। ২১ বছর হলেই সবাই মদ পানের পারমিট পাবেন এই কথা যারা বলছেন তারা ঠিক বলছেন না। এখানে সব কিছুই শর্তসাপেক্ষ। তবে বিধিমালাটি নতুন। আমরা পাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গেলে বুঝতে পারব কোনো জটিলতা আছে কী না।"

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন,"বিধিমালায় আপাতত কোনো সমস্যা দেখছি না। বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী আগেও মদ খাওয়ার পারমিট দেয়া হতো। এটা দেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত এখনো আছে। তবে আমি মনে করি বয়স নির্দিষ্ট করে দিয়ে সেটা আরো নিয়ন্ত্রণ করা হলো।

এটা হয়তো যারা মদ খেতে চান তাদের জন্য কিছুটা সমস্যা তৈরি করতে পারে।" তিনি বলেন,"যেখানে সেখানে মদের বার খোলার বিরুদ্ধে আমরা জনস্বার্থে একটা রিট করেছি হাইকোর্টে। বিধিমালায় যে ১০০ পারমিটধারীর শর্ত যুক্ত হয়েছে তাতে বার খোলার বিষয়টি অবারিত হয়নি বরং নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।"

তবে ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল মনে করেন,"২১ বছর বয়স নির্ধারণ করা ঠিক হয়নি। যতই শর্ত থাকুক তাতে তরুণদের মধ্যে মদ্যপানে উৎসাহ বাড়তে পারে। যদি বয়সের বিষয় শর্তে থাকে তাহলে তা ৩০ বছর হতে পারে। তার আগে শর্ত সাপেক্ষেও মদ পানের অনুমতি দেয়া ঠিক বলে আমি মনে করি না। আর ১০০ জন পারমিটধারী এক হলেই মদ বিক্রির লাইসেন্স পাবেন তাও ঠিক মনে করি না। তাহলে তো অনেক মদের বার হয়ে যাবে। বাংলাদেশে অনেক বিদেশি এখন আসছেন। বিনিয়োগ বাড়ছে। জনসংখ্যাও বাড়ছে। তাই বিক্রির লাইসেন্স বাড়তে পারে। কিন্তু ওইভাবে হলে সবাই লাইসেন্স নিতে চাইবে।" বিধিমালায় বলা হয়েছে, যারা মদ পানের পারমিট পাবেন তারা একবারে তিন ইউনিট এবং মাসে সর্বোচ্চ সাত ইউনিট মদ কিনতে পারবেন। এক ইউনিট হলো ৭৫০ মিলি লিটার সমপরিমাণ মদ। বাংলাদেশে এখন ১২১টি প্রতিষ্ঠানের অধীনে ১৬৫টি মদের বার রয়েছে।

বাংলাদেশে দুর্নীতি :

বাংলাদেশে দুর্নীতি হল দেশটির একচি চলমান সমস্যা, এছাড়াও দেশটি ২০০5 সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় পৃথিবীর তৎকালীন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে স্থান লাভ করে। ২০১১ এবং ২০১২ সালে দেশটি তালিকার অবস্থানে যথাক্রমে ১২০ এবং ১৪০তম স্থান লাভ করে, যেখানে কোন দেশ নম্বরের দিক থেকে যত উপরের দিকে যাবে ততই বেশি দুর্নীতিগ্রস্থ হিসাবে গণ্য হবে। ভোগবাদী মানসিকতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অভাব দুর্নীতির পেছনে দায়ী।
তবে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট দেখলে বোঝা যায় ভোগবাদী মানসিকতাই দায়ী। বাংলাদেশে বর্তমানে সব শ্রেণির ব্যক্তিরাই ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। তবে উচ্চ পর্যায়ের কর্তারা মূলত তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে গিয়ে ঘুষ গ্রহণকে তাদের অভ্যাসে পরিণত করে।

মধ্যবিত্তরা ও নিম্নবিত্তরাও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। দেখা যায় যে প্রতি ক্ষেত্রেই মানুষ ঘুষ খেয়ে থাকে।[৪২৯]

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলাম যে নির্দেশনা দেয় :

ইসলাম নীতি-নৈতিকতার ধর্ম। দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। দুর্নীতি দমনে মহানবী (স.) শান্তি ও সুনীতির যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন- ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করতে পারলে বিদ্যমান দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত করা :

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি মানুষকে অগাধ ধন সম্পদের জন্য মরিয়া করে তোলে। ফলে মানুষ পাপের পথে ধাবিত হয়, দুর্নীতিগ্রস্থ হয়। রাসূল (স.) বলেন, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের আশঙ্কা করি না।

বরং আমি আশঙ্কা করি তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য আসবে - যেমন তোমাদের আগের লোকদের কাছে এসেছিল, তখন তোমরা সেটা পাওয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে, যেভাবে তারা করছেন। আর তা তাদের যেভাবে ধ্বংস করেছিল তোমাদেরর তেমনি ধ্বংস করে দেবে।'[৪৩০]

অধীনদের সুষম বেতন-ভাতা প্রদান :

দুর্নীতির একটি কারণ হলো, অধীন বা কর্মচারীদের সীমিত বেতন-ভাতা নির্ধারণ। অতিরিক্ত কাজের বোঝা, এর ওপর ন্যায্য পারিশ্রমিক না হলে অনেকেই অসৎ পথে পা বাড়ায়। রাসূল (স.) অধীনদের প্রতি ইনসাফ করার গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর বিখ্যাত উক্তি হলো, তারা (শ্রমিক ও কর্মচারী) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করেছেন। কারো ভাই তার অধীনে থাকলে তার উচিত নিজে যা খাবে তাকে তা-ই খাওয়াবে। নিজে যা পরবে তাকেও তাই পরতে

---

৪২৯. *Corruption Perceptions Index 2011" & 2012 / Transparency International /*, সংগ্রহের তারিখ ৮ জানুয়ারি ২০১৩

৪৩০. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪০১৫

দেবে, তাকে দিয়ে এমন কোনো কাজ করাবে না, যা তার সাধ্যের বাইরে। কোনোভাবে তার ওপর আরোপিত বোঝা বেশি হয়ে গেলে নিজেও তাকে সে কাজে সহায়তা করবে।[৪৩১]

সততার সঙ্গে নিয়োগদান :

রাষ্ট্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো অযোগ্য ও অসৎ ব্যক্তিদের অসদুপায়ে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান। কর্মকর্তাদের কাছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পবিত্র আমানত।

এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এই দায়িত্ব আমানত হিসেবে সাব্যস্ত করে বলেছেন, 'আমানত নষ্ট হতে থাকলে তোমার কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেকো।' আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আমানত নষ্ট হবে? তিনি বলেন, যখন অযোগ্য অদক্ষ ব্যক্তিদের কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেকো।' আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে আমানত নষ্ট হবে? তিনি বলেন, যখন অযোগ্য, অদক্ষ ব্যক্তিদের কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তখন তোমার কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেকো।'[৪৩২]

হারাম উপার্জনে নিরুৎসাহ করা :

যে ব্যক্তি ১০ দিরহামের একটি কাপড় পরিধান করে, যার মধ্যে এক দিরহাম হারাম থাকে, তার পরিধানে ওই কাপড় থাকা অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তার নামায কবুল করবেন না।[৪৩৩]

সুদ ও ঘুষ নিষিদ্ধ করা :

দুর্নীতি নির্মূল করতে হলে প্রথমেই সমাজ থেকে সুদ ও ঘুষ-দুর্নীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে রাসূল (স.) বলেন ঘুষদাতা ও গ্রহীতার প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) সুদখোর সুদদাতা, সুদের দলিল লেখক এবং সুদের দুই স্বাক্ষীর ওপর অভিশাপ করেছেন।[৪৩৪]

৪৩১. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৩০
৪৩২. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৫৯
৪৩৩. *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং- ৫৭৩২

দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নির্দেশ :

প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমেও দুর্নীতি দমনে ভূমিকা রাখতে পারে। মহানবী (স.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় (পাপাচার দুর্নীতি) হতে দেখে, সে যেন সম্ভব হলে তা হাত দ্বারা রুখে দেয়। আর এটা সম্ভব না হলে প্রতিবাদী ভাষা দিয়ে তা প্রতিহত করে। আর তাও না পারলে সে যেন ঐ অপকর্মকে হৃদয় দ্বারা বন্ধ করার পরিকল্পনা করে (মনে মনে ঘৃণা করে), এটি দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক।[৪৩৫]

৪৩৪. *ইবনে মাজাহ*, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং- ২২৭৭
৪৩৫. *তিরমিজি*, প্রাগুপ্ত, হাদিস নং- ২১৭২

পঞ্চম অধ্যায়

সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় এর সমাধান

ব্যভিচার :

সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ব্যভিচার নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী। কেননা ব্যভিচার একটি মারাত্মক ব্যাধি। হত্যার পরই যার স্থান। কারণ তাতে বংশ পরিচয় ঠিক থাকে না। লজ্জাস্থানে হিফাযত হয় না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামাজিক সম্মান রক্ষা পায় না। মানুষে মানুষে কঠিন শত্রুতার জন্ম নেয়। দুনিয়ার সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থা এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। একে অন্যের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। একারণেই আল্লাহ তা'য়ালা এবং তদীয় রাসূল (স.) হত্যার পরই এর উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَۚ- وَمَنْ
اِلَّا مَنْ تَابَ واٰمَنَ وَعَمِلَ يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا- يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا-
عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍؕ- وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

আর যারা আল্লাহ তা'য়ালার পাশাপাশি অন্যকে উপাস্য ডাকে না। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়ত সম্মত) কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করবে তারা অবশ্যই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে এবং তারা ওখানে চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিতাবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে নেয়, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে; আল্লাহ তা'য়ালা তাদের পাপগুলো পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[৪৩৬]

৪৩৬. *আল কুরআন*, ২৫ : ৬৮-৭০

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন,

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ-

জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলো হে আল্লাহর রাসূল! কোন পাপটি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মহাপাপ বলে বিবেচিত? রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কাউকে শরীক করা; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললো, অতঃপর কী? তিনি বললেন, নিজ সন্তানকে হত্যা করা ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে খাবে বলে। সে বললো, অতঃপর কী? তিনি বললেন, নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা।[৪৩৭]

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজীদে ব্যভিচারের কঠিন নিন্দা করেন। তিনি বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا-

তোমরা যিনা তথা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না। কারণ তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[৪৩৮]

সূরা আন নূর এর আলোকে সমকামিতা :

সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় সমকামিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সমকামিতা একটি মারাত্মক ব্যাধি। বাংলাদেশে প্রথম এলজিবিটি সংক্রান্ত জনসচেতনতা গড়ে তোলার প্রকাশ্য প্রয়াস শুরু হয় ১৯৯৯ সালে যখন রেংগ্যু নামক এক কানাডীয় নাগরিক (যিনি জাতিগতভাবে একজন চাকমা) বাংলাদেশের সমকামীদের জন্য প্রথম অনলাইন গ্রুপ গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। এর সদস্য সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু রেংগ্যুও মৃত্যুর পরে এর কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসে।এরপর ২০০২ সালে ইয়াহু পোর্টালে প্রকাশ এবং আবরার দ্বারা পরিচালিত টিন গে বাংলাদেশ এবং কাজী হক দ্বারা পরিচালিত বয়েস অব বাংলাদেশ নামক দুইটি অনলাইন গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হয়। ইয়াহু কর্তৃক দুইটি গ্রুপই মুছে ফেলা হয়।

---

৪৩৭. *সহীহ বুখারী*, প্রাগুপ্ত, হাদীস নং- ৪৪৭৭
৪৩৮. *আল কুরআন*, ১৭ : ৩২

বিভিন্নভাবে নাম পরিবর্তন ও বারবার চালু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত বয়েজ অনলি বাংলাদেশ যা বর্তমানে বয়েস অব বাংলাদেশ নামে পরিচালিত এই গ্রুপটিই টিকে আছে। বর্তমানে তানভির আলম নামে পরিচালিত গ্রুপটি বাংলাদেশী সমকামীদের সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক। এটি ২০০৯ থেকে ঢাকায় এলজিবিটি সচেতনতাবর্ধক অনুষ্ঠান করে আসছে। এই দলটি বাংলাদেশে একটি সুসংহত এলজিবিটি সমাজ গড়তে চায়, এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারাটির প্রয়োজ্যতার অবসান চায়।[৪৩৯]

কিন্তু ১৯৯০ দশকের গোড়ার দিকে ঢাকার কাকরাইলে বন্ধু নামে একটি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী সংস্থা স্থাপিত হয় যা প্রথম থেকেই পুরুষ সমকামীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে বন্ধুর শাখা দপ্তর স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থাটি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় এর কার্যক্ষেত্র প্রকাশ্য ও ক্রম প্রসারমান।

২০১৪ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রথম এলজিবিটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। প্রেমের প্রতিনিধিত্ব করে, এরূপ লোককাহিনী "রূপবান" থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সাময়িকীটির নামকরণ করা হয় রূপবান সাময়িকী। ১৪ এপ্রিল বাঙালি নববর্ষ হওয়ায়, এ দিনটি বাংলাদেশে শোভাযাত্রাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদযাপিত হয়। ২০১৪ সালে এ দিনটিতে "রেইনবো র‍্যালী" (রংধনু শোভাযাত্রা) ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। হুমকির পর ২০১৬ সালে এ ধরণের শোভাযাত্রা বাতিল করা হয়। ২০১৬ সালের ২৫ এপ্রিল রূপবান (ম্যাগাজিন) প্রতিষ্ঠাতা এবং রেইনবো র‍্যালির সংগঠক জুলহাজ মান্নান বন্ধুসহ খুন হয়।

অসংখ্য মানুষ বয়েজ অব বাংলাদেশের (বব) কাছে তাদের সমস্যার কথা বিশদভাবে বলতে থাকে। এই ফোরাম কখনোই নিজেদের সংস্থা হিসেবে নিবন্ধন করেনি, কারণ তারা নিজেদের নিছক পুরুষ পুরুষ যৌনক্রিয়া করতে উৎসাহিত করে, এরূপ উপাধি পেতে চায়নি। এই দলটির সমন্বয়কারী মনে করেন, তাদের কাজের পরিধি আরো ব্যাপক। অনলাইনে সক্রিয় এই দলটি সমকামী পুরুষদের সাক্ষাত করার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, এবং তাদের মধ্যে সামাজিকীকরণ বৃদ্ধিতে কাজ করে। ববে নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা ২০০০ এর বেশি এবং তাদের মধ্যে পিএইচডিধারী ও

৪৩৯. Internet, from *India exprss.com*, 15, November-2017

চিকিৎসকরাও আছে। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা বিয়য়ক ফান্ড এবং বিভিন্ন এনজিওগুলো বাংলাদেশে যাতে যৌনশিক্ষা এবং এলজিবিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বিবেচনা করে তার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ এশিয়ান এবং প্যাসিফিক পপুলেশন কনফারেন্সে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচিত হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সমকামীদের স্বীকৃতি দেওয়ার ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী আবুল কালাম আব্দুল মোমেন বলেন, এ ধরণের কোন নীতি বাংলাদেশের সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে যায় বলে বাংলাদেশ এ ধরণের কোনো সিদ্বান্ত বাংলাদেশে বাস্তবায়ণ করবে না।

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক পপুলেশন ডেভেলপম্যান্ট কনফারেন্সে বাংলাদেশ পুনরায় সমকামীদের স্বীকৃতি দেওয়ার বক্তব্যের বিরোধিতা করে। আব্দুল মোমেন ষষ্ঠ এশীয় প্যাসিফিক পপুলেশন কনফারেন্সে দেওয়া বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, অন্যান্য মুসলিম এবং কিছু খ্রিস্টান দেশের মত বাংলাদেশ সমকামীদের অধিকার সমর্থন করবে না। কারণ তা তার মূল্যবোধকে প্রতিনিধিত্ব করে না।

পারিবারিক সহিংসতা :

পারিবারিক সহিংসতা (গৃহ নির্যাতন বা পরিবারে সংঘটিত সহিংসতা নামেও পরিচিত) বলতে বিবাহ বা একসাথে বসবাসের মতো পারিবারিক পরিবেশে সংঘটিত সহিংসতা বা অন্যান্য নির্যাতনকে বোঝানো হয়। সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সহিংসতার প্রতিশব্দ হিসেবে পারিবারিক সহিংসতা প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, যা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকা একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি করে থাকে। **পারিবারের** একজন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি যে ধরনের মিথ্যা অপবাদ ও খোটা প্রদান করে থাকে **তাও পারিবারিক সহিংসতার অন্তর্ভূক্ত**। বিপরীত লিঙ্গের সম্পর্কগুলোতে বা একই লিঙ্গ ভিত্তিক সম্পর্ক কিংবা প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী বা সঙ্গীদের মধ্যে **পারিবারিক সহিংসতা** হতে পারে। বিস্তৃত অর্থে, শিশু, কিশোর, বাবা-মা বা বয়োজ্যোষ্ঠদের প্রতি সহিংসতাও পারিবারিক সহিংসতা হিসেবে বিবেচিত। এটি শারীরিক, মৌখিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রজননমূলক এবং যৌন নির্যাতনসহ একাধিক রূপ পরিগ্রহ করে, যেখানে সূক্ষ্ম, জবরদস্তিপূর্ণ রূপ থেকে শুরু করে বৈবাহিক ধর্ষণ, দমবন্ধ, মারধর, নারী জৌনাঙ্গের বিকৃতি এবং এসিড নিক্ষেপের মতো সহিংস শারীরিক নর্যাতন পর্যন্ত হতে পারে যা অবশেষে পঙ্গুত্ব বা মৃত্যু ডেকে আনে।

পারিবারিক হত্যা কান্ডের মধ্যে রয়েছে পাথর মেরে হত্যা করা, গৃহবধূকে অগ্নিদগ্ধ করা, অনার কিলিং বা সম্মান রক্ষার্থে হত্যা এবং যৌতুকের কারণে মৃত্যু (যা কখনও কখনও পারিবারের সদস্যের যোগসাজসে হয়ে থাকে)। বিশ্বব্যাপী পারিবারিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিরা অধিকাংশই নারী এবং নারীরাই সহিংসতার সবচেয়ে ভয়াবহ ধরনের মুখোমুখি হন। আবার তারা পুরুষের তুলনায় ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সহিংসতাকে আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবেও ব্যবহার করেন। কিছু কিছু দেশে পারিবারিক সহিংসতাকে আইনগত অনুমোদিত হিসেবেও দেখা যায়, বিশেষত যদি নারী প্রকৃতই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেন বা সন্দেহভাজন হন।

গবেষণায় দেখা গেছে, একটি দেশের লিঙ্গ সমতার স্তর এবং পারিবারিক সহিংসতার হারের মধ্যে একটি প্রতক্ষ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ পারস্পারিক সম্পর্ক রয়েছে, লিঙ্গ সমতা কম থাকা দেশগুলোতে পারিবারিক সহিংসতা অনেক হারে বেশি। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই বিশ্বব্যাপী পারিবারিক সহিংসতা সর্বাধিক অবহেলিত অপরাধগুলোর মধ্যে একটি। পুরুষ নির্যাতনের বিষয়টি সামাজিকভাবে লজ্জার বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় বলে পারিবারিক সহিংসতার শিকার পুরুষরা স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারীদের দ্বারা অবহেলিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। পারিবারিক সহিংসতা প্রায়শই ঘটে যখন নির্যাতক ব্যক্তি মনে করেন যে, নির্যাতন করা এক প্রকার অধিকার, গ্রহণযোগ্য, ন্যায়সঙ্গত বিষয় বা এ বিষয়ে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি আন্তঃপ্রজন্মভিত্তিক সহিংসতার একটি চক্র তৈরি করতে পারে যেখানে এ ধরনের সহিংসতাকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়। অনেক লোক নিজেকে নির্যাতনকারী বা ভুক্তভোগী হিসেবে স্বীকৃতিদেয় না কারণ তারা তাদের অভিজ্ঞতাগুলো অনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করেন।[৪৪০]

পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা, এর উপলব্ধি, সংজ্ঞা এবং দলিলিকরণের বিষয়টি দেশে দেশে ব্যাপকভাবে ভিন্ন। পারিবারিক সহিংসতা প্রায়শই জোরপূর্বক বিয়ে বা বাল্যবিবাহের প্রেক্ষাপটে ঘটে থাকে। নির্যাতন কেন্দ্রিক সম্পর্কগুলোতে, নির্যাতনের একটি চক্র থাকতে পারে যেখানে প্রথমে উত্তেজনা বাড়তে থেকে এবং তারপর সহিংসতার ঘটনা ঘটে থাকে, অতঃপর মিলন এবং শানতির পরিস্থিতি তৈরি হয়।

৪৪০. Internet, from Journal of family violence, 29 (1) : 35-49

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্নতা, শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ, নির্যাতকের সঙ্গে যন্ত্রণাদায়ক বন্ধন, সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা, আর্থিক সংস্থান, ভয়, লজ্জা এবং বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য পারিবারিক সহিংস পরিস্থিতিতে আবদ্ধ হতে পারেনা। নির্যাতনের ফলস্বরূপ ভুক্তভোগীগণ শারীরিক অক্ষমতা, অনিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন, দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা, মানসিক অসুস্থতা, সীমাবদ্ধ অর্থসংস্থান এবং সুস্থ সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে দুর্বলতার পরিচয় ইত্যাদি নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। যে শিশুরা সহিংসতাপূর্ণ পরিবারে বসবাস করে তারা প্রায়শই ছোট বেলা থেকে বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় ভোগে, যেমন এড়িয়ে চলা, অযাচিত অতিরিক্ত ভীতি এবং অনিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন, যা পরিণতিতে পরোক্ষ মানসিক আঘাত তৈরিতে অবদান রাখতে পারে।[৪৪১]

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, চরিত্রহীনা নারী চরিত্রহীন পুরষের যোগ্য আর চরিত্রহীন পুরষ চরিত্রহীনা নারীর যোগ্য। চরিত্রবতী নারী চরিত্রবান পুরষের যোগ্য আর চরিত্রবান পুরষ চরিত্রবতী নারীর যোগ্য। কোন মিথ্যা অপবাদই চরিত্রবানদের কলঙ্কিত করতে পারে না। এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবনোপকরণ।[৪৪২]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, মুনাফেক, রুগ্নমনা ও মিথ্যা গুজব রটনাকারীরা শহরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত না হলে আমি ওদের ওপর তোমাকে কর্তৃত্ব দান করব। তারপর হে নবী! খুব অল্প সময়ই ওরা এ নগরে তোমার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে। অভিশপ্ত অবস্থায় ওদের যেখানে পাওয়া যাবে, পাকড়াও ও বিনাশ করা হবে।[৪৪৩]

অপবাদ দেওয়ার প্রবণতা এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের সুসম্পর্কে চিড় ধরায়। সামাজিক ও জাতীয় ঐক্যের জন্যও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে এ ধরনের প্রবণতা। যে কারণে ইসলামে অপবাদ দেওয়ার প্রবণতাকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিতে অপর মুসলমানকে অপবাদ দেওয়া কবিরা গুনাহ।

---

441. Internet, from Attahmnt & Human vlopmnt 9(3) : 187-205
৪৪২. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৮৫
৪৪৩. *আল কুরআন*, ২৪ : ২৬

মহান আল্লাহ বলেন, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।[৪৪৪]

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোনো আশঙ্কা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।[৪৪৫]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-বদান্যতা বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মতো, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।[৪৪৬]

মূলত যারা সংকীর্ণমনা তারাই উপকার করে অপরকে খোঁটা দেয়। আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না বলে হাদীসে এসেছে। আবু যর (র.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, তিন শ্রেণির লোকের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না। খোঁটাদানকারী; সে যা কিছু দান সদকা করে পরক্ষণেই তার খোঁটা দেয়। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রি করে এবং যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে বা পরিধান করে।[৪৪৭]

সন্ত্রাসবাদ :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। এতে কোন উগ্রবাদ ও চরমপন্থার স্থান নেই। ইসলামের চিরন্তন আদর্শ সব সময়ই সৃজনশীল ও আর্ত- মানবতার কল্যাণে নিবেদিত। মূলত ইসলাম কোন ধর্ম বা ভাবাবেগের নাম নয় বরং একটি ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই যা মানুষের মৌলিক অধিকার ও সৌজন্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ তা কখনোই ইসলাম অনুমোদন করে না এবং এসবের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম করা ইসলামের আদর্শ।

---

৪৪৪. *আল কুরআন*, ৩৩ : ৬১
৪৪৫. *আল কুরআন*, ২ : ২৬২
৪৪৬. *আল কুরআন*, ২ : ২৬৪
৪৪৭. *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুপ্ত*, হাদীস নং- ২০২

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই ইসলামকে সন্ত্রাসবাদ আর মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদী প্রমাণ করার অপচেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন থেকেই। আর এক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদীরা অনেক সফলতাও পেয়েছে। অথচ ইসলাম হচ্ছে শান্তি, উন্নয়ন ও প্রগতিশীল জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন, "তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায়, এ দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন নিজ ইচ্ছায়। আর তাদেরকে সরল পথ দেখান।"[৪৪৮]

প্রভূত সংখ্যক হাদীসে 'দ্বীন' তথা ইসলামকে মধ্যমপন্থী জীবনব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ইসলামী জীবনাদর্শে উগ্রপন্থা বা চরমপন্থা কোন ভাবেই স্বীকৃতি নয় বরং এসবের বিরুদ্ধে ইসলাম জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেছে।

আর ইসলাম শব্দটি সিল্ম শব্দমূল হতে গঠিত। ব্যুৎপত্তিগতভাবে সাল্ম এর কয়েকটি অর্থ হল, (১) বাহ্য ও অভ্যন্তরীন উভয়বিধ অপবিত্রতা (বিপদ-আপদ) ও দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা, (২) সন্ধি ও নিরাপত্তা, (৩) শান্তি ও (৪) আনুগত্য ও হুকুম পালন।[৪৪৯]

সালাম ও সাল্ম উভয় শব্দেরই অর্থ হল আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম পালন। অর্থগুলোর মধ্যে 'পবিত্র ও দোষত্রুটি মুক্ত হওয়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শব্দমূল হতে (ক্রিয়াপদে/ফে'ল) আসলামা, ইসলাম গ্রহণ করল ও ক্রিয়াবিশেষ্য ইসলাম, আত্মসমর্পণ এবং কর্তৃকারকে মুস্লিমু, ইসলাম গ্রহণকারী শব্দ তিনটির উৎপত্তি হয়েছে। কুরআনে ৮ স্থানে ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হরকত তথা স্বরচিহ্নের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন আকারে তবে একই অর্থে এই শব্দমূল থেকে উৎপন্ন বেশ কয়েকটি পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধবিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব, ইসলামি বিধান, যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব, শান্তি বা শান্তি কামনামূলক মুসলিম অভিবাদন। শেষোক্ত অর্থে আয়াতে, ইসলাম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে উগ্রবাদ, জঙ্গীবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদ, ধর্মান্ধতা ও সন্ত্রাসবাদের দূরতম সম্পর্ক থাকার কোন সুযোগ নেই।

---

৪৪৮. *আল কুরআন*, ০৫ : ১৫-১৬
৪৪৯. *ইসলাম-ইউকিপিডিয়া*

ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হলেও সাম্প্রতিক সহিষ্ণু বিশ্বব্যবস্থায় ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে একাকার করার অপচেষ্টা চলছে। বৈশ্বিক ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলো ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে মুসলমানদের নামে সাথে যুক্ত করেছে সন্ত্রাসবাদী তকমা। আসলে সন্ত্রাসবাদ কোন জাতি-রাষ্ট্রের একক সমস্যা নয় বরং বৈশ্বিক সমস্যা। যদিও সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদের কোন বেঁধে দেয়া সংজ্ঞা বা সীমারেখা নেই। তবে প্রচলিত সংজ্ঞানুযায়ি সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে যে সকল কাজ জনমনে ভীতির সঞ্চার করে এবং ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও কোন আদর্শিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য কৃত এমন কাজ যা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও জননিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আইন বহির্ভূত ও সৌজন্যহীন উগ্রবাদী কার্যকলাপ এবং যুদ্ধকেও সন্ত্রাসবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মূলত প্রথাবিরুদ্ধ উগ্রতা সন্ত্রাসবাদের প্রতিভূ। যা ইসলামী আদর্শের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে সভ্যতা, সৃজনশীলতা ও মানবতার প্রধান প্রতিপক্ষ। ইসলাম এ ধরনের প্রবণতাকে কোন ভাবেই সমর্থন করে না বরং এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো, 'ফিতনা তথা সন্ত্রাস হত্যার চেয়েও ভয়াবহ'।[৪৫০]

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'শুনে রাখো, সে সব জালিমদের ওপর আল্লাহর লানত, যারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং এ পথকে জটিল ও বক্র করে তুলতে চেষ্টা করে, আর এসব লোকই হয় আখিরাতকে অস্বীকারকারী।[৪৫১]

ইসলাম সন্ত্রাসবাদ বা উগ্রবাদকে তো সমর্থন করেই না বরং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণা, 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনার চূড়ান্তভাবে অবসান হয় এবং দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়।[৪৫২]

আল্লাহ তায়ালা বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডকে আদৌ পছন্দ করেন না।[৪৫৩]

---

৪৫০. *আল কুরআন*, ০২ : ১৯১
৪৫১. *আল কুরআন*, ১১ : ১১৮-১১৯
৪৫২. *আল কুরআন*, ০২ : ১৯৩
৪৫৩. *আল কুরআন*, ০২ : ২০৫

'সন্ত্রাসবাদ' কথাটার বহুল প্রচলন শুরু হয়েছে পশ্চিমা বিশ্ব থেকেই। আর এটিই হচ্ছে তাদের বৈশ্বিক প্রতিপক্ষ মুসলিম শক্তিকে মোকাবেলার মোক্ষম হাতিয়ার। সঙ্গত কারণেই বিশ্বের যেকোন স্থানে সংঘঠিত সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রবাদী ঘটনার সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সংযুক্তকরণ পশ্চিমা বিশ্বের রীতিমত ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আসলে অহেতুক ইসলামভীতিই বিশ্ব পরাশক্তি ও পশ্চিমা বিশ্ব এ বিষয়ে একেবারে প্রান্তিকতায় নিয়ে গেছে। আর সে জন্যই মার্কিন চিন্তাবিদ হান্টিংটনও ইসলামী ও পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র সাবেক প্রধান জেমস ওলসি এ দুই সভ্যতার দ্বন্দ্বকেই 'চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর বিশ্ব রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদবিরোধী কথাবার্তা যতটা জোরদার হয়েছে অতীতে আর কখনও এমনটি দেখা যায়নি; বরং এর আগে সন্ত্রাসী অনেক দল ও গোষ্ঠী বৃহৎ শক্তিগুলোর আর্থিক, সামরিক ও নৈতিক সমর্থনও পেয়েছে। ২০০১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ১৩৭৩ নম্বর প্রস্তাব অনুমোদন করা সম্ভব হয়। ২০০৩ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই ২৮টি দল বা সংগঠনকে সন্ত্রাসী বলে ঘোষণা দেয়। এসব দল বা সংগঠনের মধ্যে ১৮টি দল বা সংগঠনই মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক। অথচ অতীতে এসব কখনো লক্ষ্য করা যায়নি।

হোয়াইট হাউজ শুরু থেকেই কথিত ইসলামী র‍্যাডিক্যালিজমকে বৈশ্বিক সমস্যা হিসাবে প্রচার করে এবং তা মোকাবিলা করাকেই সার্বিক সমাধান বলে সিদ্ধান্ত নেয়। হোয়াইট হাউজের দৃষ্টিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যেভাবে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ এবং শীতল যুদ্ধের সময় কমিউনিজম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, তেমনিভাবে কথিত ইসলামী ফ্যাসিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এ দেশটির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাদের ভাষায় কথিত ইসলামী ফ্যাসিবাদ ও ইসলামী সন্ত্রাসবাদের হোতা বা মদদাতা হচ্ছে প্রথম সারিতে আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও লেবানন এবং দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে সুদান, লিবিয়া ও ফিলিস্তিন স্বশাসন কর্তৃপক্ষ। তাই বল প্রয়োগ করে এসব দেশের সরকার পরিবর্তন করা মার্কিন সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বা প্রাধান্য পেয়েছে। যার বাস্তব প্রতিফলনও বিশ্ববাসী লক্ষ্য করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অশুভ প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সে ধারাবাহিকতায় মুসলিমদের সন্ত্রাসবাদী তকমা দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা যাচ্ছে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো। আর বিশ্ব পরাশক্তিগুলো তাদের পালেই হাওয়া দিচ্ছে। অথচ ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদ বা কোন ফিতনার দূরতম সম্পর্ক অতীতে প্রমাণ করা যায়নি আর ভবিষ্যতে যাবে না-ইনশা আল্লাহ।

উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসবাদের জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের দায়ি করার অশুভ প্রবণতা দীর্ঘ দিনের হলেও তা আর অতীতের মত হালে পানি পাচ্ছে না বরং সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তে এর ভিন্নচিত্রই বিশ্ববাসীর সামনে উঠে এসেছে। যা আত্মসচেতন বিশ্ববাসীর অন্তদৃষ্টি খুলে দিতে সহায়ক হচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি ব্রাসেলস-ভিত্তিক ‘পলিটিক্যাল ক্রিয়েটিভ ফাউন্ডেশন’-এর একটি রিপোর্ট সৌদি আরবভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল-আরাবিয়া প্রকাশিত হয়েছে। রিপোটের ভাষ্যমতে, বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের শিকার ৯১.২ ভাগ নিরপরাধ মুসলিম। সারাবিশ্বে যত সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটছে তার ৯০ ভাগেরও বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছেন বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মুসলিমরা। অতিসম্প্রতি প্রকাশিত ফরাসি রিপোর্টে দাবি করা হয়, এ সব হামলাগুলোর মধ্যে ৮৯.১ ভাগ সন্ত্রাসবাদের ঘটনা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেই ঘটানো হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে মুসলিমরা। অথচ উল্টো দোষ চাপানো হয়েছে মুসলমানদের ওপর।

‘পলিটিক্যাল ক্রিয়েটিভ ফাউন্ডেশন’এর এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে হামলা করার পর থেকে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী যত সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে তাতে শুধু মুসলমানরাই ৯১.২ শতাংশ হামলার শিকার হয়েছে। রিপোটের ভাষ্যমতে, গত ৪০ বছরে চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা বিশ্বব্যাপী ৩৩ হাজার ৭শত ৬৯টি হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। আর এ হামলাগুলো নিহত হয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজার ৯৬ জন। আর ১ লাখ ৫১ হাজার ৪৩১ জন মানুষ আহত হয়েছে। আর এজন্য সংশ্লিষ্টদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি, উগ্রবর্ণবাদ ও ধর্মান্ধতাকে সরাসরি দায়ি করা হয়েছে। কিন্তু এসব সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সম্পৃক্ত করা যায়নি বরং গবেষণায় ভিন্নচিত্রই ওঠে এসেছে।

মূলত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ অনুরাগ-আনুগত্য এবং যেকোন মূল্যে হীনস্বার্থ হাসিলের বিষয়টি সক্রীয় থাকে। আর সাম্প্রদায়িক ভাবনার সৃষ্টি হয় উগ্রবাদী ও সঙ্কীর্ণ ধর্মচিন্তা থেকে।

ক্ষেত্র বিশেষে আঞ্চলিকতা ও গাত্রবর্ণও বিবেচনায় আনা হয়। অবশ্য মহল বিশেষে সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মাশ্রিত ও ধর্মের বিষবৃক্ষ মনে করা হলেও এর সাথে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের কোন সম্পর্ক নেই বরং সাম্প্রদায়িকতার পাত্র-মিত্ররা তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থের জন্যই এসবের জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। অথচ সন্ত্রাসবাদের আঁতুর ঘর অন্যকোন স্থানে। আসলে সন্ত্রাসবাদের মূলে না গিয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর দোষ চাপানোর অশুভ প্রবণতার কারণেই তা এখন জাতিরাষ্ট্রের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদে রূপ নিয়েছে। যা এখন প্রায়ই অপ্রতিরোধ্যই বলা চলে।

অথচ সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। ইসলাম মানুষকে জাতি ও বর্ণ দিয়ে বিচার করে না। বরং তার বিশ্বাস ও কর্মের মূল্যায়ন করে। বিশ্বাস মানুষের অন্তরের বিষয়। বিশ্বাস গড়ে ওঠে জ্ঞানের আলোয়। বিশ্বাস কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই; আর ইসলাম তা অনুমোদনও করে না। তাই কারও বিশ্বাস নিয়ে বিদ্রুপ, কটূক্তি বা কটাক্ষ করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ; গালমন্দ ও বিদ্বেষ ছড়ানোকে ইসলামে হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, ‘তারা আল্লাহ ছাড়া যে সবকে ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিয়ো না; তাহলে তারা আল্লাহকে গালি দেবে শত্রুতাবশত অজ্ঞতার সঙ্গে।[৪৫৪]

মূলত উগ্র বা চরমপন্থী সাম্প্রদায়িকতার পরিশিলীত রূপই হচ্ছে বর্ণবাদ। আর বর্ণবাদ সেই দৃষ্টিভঙ্গি, চর্চা এবং ক্রিয়াকলাপ যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবেই অনেকগুলো গোষ্ঠীতে (races) বিভক্ত এবং একই সাথে আরও বিশ্বাস করা হয়; কোন কোন গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে উঁচু অথবা নিচু; কিংবা তার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী; অথবা অধিকতর যোগ্য কিংবা অযোগ্য।

অবশ্য বর্ণবাদের এক এবং অভিন্ন সংজ্ঞা নির্ধারণ করাও সম্ভব হয়নি। কারণ, গবেষকদের মধ্যে গোষ্ঠী (race) ধারণা নিয়েই মতবিরোধটা বেশ প্রবল। বর্ণবাদ কখনো গাত্রবর্ণ, কখনো আঞ্চলিকতা, কখনো গোত্র, কখনো বর্ণ (caste) দিয়ে হতে পারে। কারো কারো মতে, মানুষের আচরণ যদি

৪৫৪. *আল কুরআন*, ০৬ : ১০৭

কখনো তার জাতি বা বর্ণ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেটি অন্য কারো জন্য ক্ষতিকর না হলেও তাকে বর্ণবাদ বলা হবে। এ বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মত হলো, শুধুমাত্র আঞ্চলিকতা, গোত্র বা বর্ণচিন্তায় প্রভাবিত হয়ে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা; নিগ্রহ, শোষণ এবং অত্যাচার চালানোর নামই বর্ণবাদ। আর বর্ণবাদের উগ্র বহিঃপ্রকাশই সন্ত্রাসবাদ। ইসলামে ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, নৃতাত্ত্বিক, জাতিগত ও ধর্মীয় প্রভেদে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সমর্থন করা হয় না। এই শ্বাশ্বত জীবন বিধানে কোনো প্রকার শ্রেণিবৈষম্য নেই। ঈমান আনা, না আনার বিষয়টি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছার ওপর ন্যাস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, 'দ্বীন সম্পর্কে জোরজবরদস্তি নেই; সত্য ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে, আল্লাহ ওপর ইমান আনবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।[৪৫৫]

বস্তুত ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ একে অপরের পরিপূরক। ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক উপযোগিতা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন না করেই স্বল্প ও অস্বচ্ছ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গোঁড়ামী বা চরমপন্থা অবলম্বন করায় হচ্ছে ধর্মান্ধতা। অতীব পরিতাপের বিষয় যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে ধর্মানুরাগী মুসলমানদেরকেই এখন ধর্মান্ধ তকমা লাগানো হচ্ছে এবং এই প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবেই বেড়েছে। আর এজন্য ইসলাম ও মুসলমানদের বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছে। ধর্মপ্রাণ ও আল্লাহভীরু মানুষদের নামে সন্ত্রাসবাদী, ধর্মান্ধ ও উগ্রবাদী আখ্যা দেয়া হচ্ছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই। কিন্তু যারা প্রকৃত অর্থে ধর্মান্ধ, সন্ত্রাসাবাদী ও উগ্রবাদী তারা থাকেন একেবারেই আলোচনা-সমালোচনার বাইরে। এমনকি 'ধর্মান্ধতা' শব্দের অপব্যবহারও বেড়েছে বৈশ্বিক রাজনীতিতে। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই শব্দের অপব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক, উগ্রবাদী ও ধর্মান্ধ বলে গালি দেয়া হচ্ছে। শুধু ইসলাম নয় বরং 'ধর্মান্ধ' কথাটি কোন ধর্মেরেই ধর্মপ্রাণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

---

৪৫৫. *আল কুরআন*, ০২ : ২৫৬

অথচ বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যই এই শব্দের অপব্যবহার করা হচ্ছে। বস্তুত, ইসলামে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ, চরমপন্থা, বর্ণবাদ ও ধর্মান্ধতার কোন স্থান নেই। ইসলাম কারো ওপর বলপূর্বক কিছু চাপিয়ে দেয়াকে মোটেই সমর্থন করে না বরং কর্মফলের বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার ওপর ছেড়ে দেয়াকেই সঙ্গত ও ইনসাফপূর্ণ মনে করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় যারা মু'মিন আর যারা ইহুদি, খ্রিস্টান ও ছাবিইন; তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তবে তাদের জন্য তাদের রবের নিকট বিনিময় রয়েছে'।[৪৫৬]

'অবশ্যই আপনি বিশ্বাসী মুমিনদের ভালোবাসা ও সম্প্রীতিতে নিকটতম পাবেন তাদের, যারা বলে আমরা নাসারা (সাহায্যকারী) খ্রিস্টান।[৪৫৭]

ইসলাম যেকোন ধরনের হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য বিরোধী। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'কোনো মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ (করার শাস্তি বিধান) ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; (আবার এমনিভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করলো তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো।[৪৫৮]

ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত অদ্বিতীয় ও ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যা সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মাধ্যমে মানব জাতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রত্যয়ী ঘোষণা, 'ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন-জীবন বিধান'।[৪৫৯]

আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে শান্তি, নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও কল্যাণের মূর্ত প্রতীক হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' তথা বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ।

---

৪৫৬. *আল কুরআন*, ০২ : ২৬২
৪৫৭. *আল কুরআন*, ০৫ : ৮২
৪৫৮. *আল কুরআন*, ০৫ : ৩২
৪৫৯. *আল কুরআন*, ০৩ : ১৯

রাসূল (স.) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তা সভ্যতার ইতিহাসে নজীরবিহীন। তাকে শান্তি, মুক্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য বিশ্ববাসীর রহমত হিসেবে আখ্যায়িত করে পবিত্র কালামে হাকীমে বলা হয়েছে, 'আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছি।[৪৬০]

' অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী'।[৪৬১]

কালামে পাকে আরও বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ'।[৪৬২]

তিনি অন্যত্র বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকেই ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর'।[৪৬৩]

বস্তুত মহানবী (সা.) তার অনুপম চরিত্র মাধুর্য্য শক্তিতেই তিনি সফলতার চরম শিখরে আরোহন করেছিলেন। বিখ্যাত ইংরেজ পন্ডিত জর্জ বার্নার্ড শ ইসলাম ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বলেছেন, 'চমৎকার প্রাণবন্ততার কারণে মুহাম্মদের ধর্মের প্রতি আমি সবসময় সুউচ্চ ধারণা পোষণ করি। আমার কাছে মনে হয় এটাই একমাত্র ধর্ম যেটা সদা পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গীভূত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। যা প্রত্যেক যুগেই মানুষের হৃদয়ে আবেদন রাখতে সক্ষম। আমি মুহাম্মদকে নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেছি। তিনি অতি চমৎকার একজন মানুষ এবং আমার মতে খ্রিষ্টানবিরোধী হওয়া সত্বেও তাঁকে অবশ্যই মানবতার ত্রাণকর্তা বলতে হবে।

পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট ইসলাম বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড লুইসও মনে করেন ইসলাম খুব স্পষ্টভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে। এমনকি ইসলাম আত্মহত্যারও বিরোধিতা করে। ইসলামের যুদ্ধনীতি মোতাবেক সব অবস্থাতেই শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বেসামরিক মানুষকে যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা দিতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে রাসায়নিক ও পরমাণু বোমার মতো গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহারও নিষিদ্ধ'।

---

৪৬০. *আল কুরআন*, ২১ : ১০৭
৪৬১. *আল কুরআন*, ৬৮ : ০৪
৪৬২. *আল কুরআন*, ৩৩ : ২১
৪৬৩. *আল কুরআন*, ৫৯ : ০৭

আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন গোত্রের নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি অপরাপর নবী-রাসূলদের বিভিন্ন গোত্রের জন্য বা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রেরণ করলেও রাসূল (স.) কে শেষ নবী হিসাবে বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর সে মিশনে তিনি পুরোপুরি সফলও হয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'আমরা আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না'।[৪৬৪]

' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন,'তিনি আল্লাহ যিনি তার রাসূলকে হিদায়ত ও সত্য জীবন ব্যবস্থা সহ পঠিয়েছেন, যেন তিনি এ দ্বীনকে সমস্ত বাতিল ব্যবস্থা সমূহের উপর বিজয়ী করেন। আর সত্য প্রতিষ্ঠাতা রূপে আল্লাহর যথেষ্ট'। বস্তুত ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ন করে, স্বার্থহানি ঘটিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা-অপপ্রয়াসই সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে গণ্য করা হয়। আর বর্ণবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মান্ধতা উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িকতার পরিশীলিত রূপ মাত্র। আর অন্যের স্বার্থে কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে, ভিন্নমত ও ভিন্নধর্মের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই নিজ সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা কোনভাবেই কোন নীতি গর্হিত কাজ নয়। তা সাম্প্রদায়িকতা বা সন্ত্রাসবাদের পর্যায়ভুক্ত বিবেচনারও সুযোগ নেই।

সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদের জন্য মুসলমানদের দায়ী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরাই এখন এর প্রধান ভিকটিম। যা সাম্প্রতিককালের ঘটনা প্রবাহের দ্বারা খুবই স্পষ্ট। শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদ হুমকির মুখে পড়েছে-এমন উদ্ভট ও কল্পিত বিশ্বাস থেকে ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের দু'টি মসজিদে নির্বিচার গুলীবর্ষণে হত্যা করা হয়েছে অর্ধশতাধিক মানুষকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিমা বিশ্বসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব সন্ত্রাসবাদী ও বর্ণবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে তার প্রায় সবগুলোই হয়েছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ঘটনার আদ্যপান্ত পর্যালোচনায় এক ভয়াবহ চিত্রই বিশ্ববাসীর সামনে ওঠে এসেছে।

৪৬৪. *আল কুরআন*, ৩৪ : ২৮

প্রাপ্ত তথ্য মতে, গত ২০১৫ সালের অক্টোবরে সুইডেনের ট্রোলহাটনের স্কুলে হামলায় নিহত হন ৩ জন মুসলিম। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে কানাডার কুইবেক অঙ্গরাজ্যের এক মসজিদে ২৯ বছর বয়সী বিসোনেত্তে নামের ব্যক্তি তাদের ওপর গুলীবর্ষণ শুরু করে। ওই হামলায় আহত হয় আরও ১৯ জন। ২০১৭ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টল্যান্ডে ছুরিকাঘাতে নিহত ২ জন। হত্যাকারীর বক্তব্য ছিল, 'স্বাধীনভাবে কথা বলতে দাও নইলে মরো। তুমি একে সন্ত্রাসবাদ বলতে পারো, আমি এটাকে দেশপ্রেম বলবো'। একই বছরের জুনে যুক্তরাজ্যের ফিনসব্যুরি পার্কের বাইরে একটি মসজিদের বাইরে মুসল্লিদের ওপর চালিয়ে দেয়া ভ্যানের চাপায় নিহত হয় মুকাররম আলি ও অপর ১২ জন আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন, ড্যারেন অসবর্ন নামের হত্যাকারী ভ্যান হামলার পর চিৎকার করে বলেছিলো, 'আমি সব মুসলমানকে মারতে চাই-অল্প কয়েকজনকে মারলাম'।

২০১৭ সালে পূর্ব লন্ডনের বেকটনে ব্রিটিশ মুসলিম মডেল রেশাম খান এবং তার চাচাতো ভাই জামিল মুখতারের ওপর এসিড হামলা চালানো হয়। অথচ বিশ্বব্যাপী একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে, অধিকাংশ জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদী হামলার সাথে মুসলমানরা জড়িত। কিন্তু চুলচেরা বিশ্লেষণে তা বরাবরই অসার বলেই প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণা সংস্থার জরিপের ফলাফলে দেখা দেছে, গত ১০ বছরে দেশটিতে শতকরা ৭১ ভাগ হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীরা। অথচ এজন্য ঘটনার জন্য পুরোপুরি মুসলমানদেরকেই দায়ী করা হয়েছে বরাবরই।

নিউইয়র্ক-ভিত্তিক সংস্থা অ্যান্টি-ডিফেম্যাশন লিগ কাজ করে ইহুদি-বিরোধী ও বিভিন্ন জাতিগত বিদ্বেষমূলক ঘটনা নিয়ে। সংস্থাটির এক জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৮ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যতোগুলো সহিংস হামলার ঘটনা ঘটেছে সেগুলো মধ্যে ৭১ শতাংশ চালিয়েছে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী ও আধিপত্যবাদীরা। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০১৭ সালের তুলনায় গতবছর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। এদিকে,'দ্য ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস অব অস্ট্রেলিয়া' নামের গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, 'এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলছে।' সিডনি-ভিত্তিক সংস্থাটির 'বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচক ২০১৮' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে (সারাবিশ্বে) উগ্র-ডানপন্থী দল ও ব্যক্তিরা ১১৩টি সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। এতে মৃত্যু হয়েছে ৬৬ জনের। এদের অধিকাংশই মুসলমান।'

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, শুধুমাত্র ২০১৭ সালেই হামলা হয়েছে ৫৯টি। আর সে বছর মারা গেছেন ১৭ জন। ২০১৭ সালে ১২টি হামলা হয়েছে যুক্তরাজ্যে, ছয়টি সুইডেনে এবং গ্রিস ও ফ্রান্সে দুটি করে হামলা চালানো হয়েছে। একই বছরে যুক্তরাষ্ট্রে হামলা হয়েছে ৩০টি। নিহত হয়েছেন ১৬ জন। সংস্থাটির হিসাবে সেসব হামলার অধিকাংশই পরিচালিত হয়েছে 'মুসলিমবিরোধী ভাবাবেগে আক্রান্ত উগ্র-ডানপন্থী শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা। 'গ্লোবাল টেরোরিজম ডাটাবেজ'এর তথ্যে জানা যায়, ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সেসব সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে সেগুলো তিনভাগের দু'ভাগ চালিয়েছে বর্ণবাদী, মুসলমানবিরোধী, ইহুদিবিরোধী, ফ্যাসিস্ট, সরকারবিরোধী এবং জাতিবিরোধী ভাবাবেগে প্রভাবিত ব্যক্তিরা।

'বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচক ২০১৮' প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি শতাব্দীর শুরুতে উত্তর আমেরিকায় অনেক সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে জেহাদি দলগুলোর জড়িত থাকার খবর এসেছে। কিন্তু, গত দুই বছরে উগ্র-ডানপন্থি রাজনীতির সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব শান্তিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এতে আরও বলা হয়, '২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় নয়টি সন্ত্রাসী হামলায় সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। সেসব হামলার জন্যে দায়ী শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীরা।' প্রতিবেদনটির ভাষ্য মতে, ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীদের কথা বেশি শোনা গেলেও বাস্তবতা হচ্ছে, গত ১০ বছরে উগ্র ডানপন্থীরাই বেশি হামলা চালিয়েছে। কিন্তু চাপানে হয়েছে 'উদর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে'।

মূলত ধর্মীয় সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো যেভাবে প্রচারিত হয় উগ্র-ডানপন্থীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সেভাবে প্রচারিত হয় না। এখন সেদিকটিতে নজর দেওয়া সময় এসেছে। কেননা, সব জায়গাতেই উগ্র-ডানপন্থীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। উল্লেখ্য, গত ১৫ মার্চ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরের দু'টি মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার সময় শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীদের হামলায় অন্তত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। উগ্র বর্ণবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ সব সময়ই বিশ্ব শান্তি, প্রগতি, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। ইতিহাস পর্যালোচনায় সে চিত্রই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। বর্ণবাদী ও সন্ত্রাসবাদীরা প্রতিনিয়ত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করলেও পরিকল্পিতভাবে এসব উগ্রবাদী তৎপরতার জন্য দায় চাপানো হয় মুসলমানদের ওপর। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর গবেষণায় এসব অভিযোগের কোন সত্যতা মেলে না।

বস্তুত, ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীরা কখনোই বিশ্বশান্তির জন্য হুমকী নয় বরং সংখ্যালঘু শ্বেতসন্ত্রাসীরাই এখন বিশ্বশান্তির জন্য প্রধান অন্তরায়। অথচ এসব অপরাধীরা থাকে নেপথ্যে। এরা কোন ধর্মেরই প্রতিভূ নয় বরং সভ্যতা ও মানবতারই প্রতিপক্ষ। মূলত নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ ট্রাজেডির মাধ্যমে বিশ্বের শান্তি প্রিয় মানুষের অন্তরদৃষ্টি খুলে দিয়েছে। সম্প্রতি তার সাথে যুক্ত হয়েছে সম্প্রতি ব্রাসেলস-ভিত্তিক 'পলিটিক্যাল ক্রিয়েটিভ ফাউন্ডেশন'-এর একটি রিপোর্ট। যা শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর অন্তরদৃষ্টি খুলে দিতে সহায়ক হয়েছে।

মূলত শীতল যুদ্ধের পর পুঁজিবাদের কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য গণতন্ত্র বা লিবারেল ডেমোক্রেসির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা হিসাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া জোরদারের প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একই সাথে পশ্চিমা সভ্যতা নিজের অভ্যন্তরীণ সংহতি ধরে রাখার জন্য বিজাতীয় শত্রুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর এ শত্রু হিসাবেই বেছে নেয়া হয়েছে ইসলামকে। জাপানী বংশোদ্ভূত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফুকোয়ামার নিম্নোক্ত বক্তব্য এ প্রসেঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: 'ইসলাম একটি রাষ্ট্রীয়, সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ জীবনাদর্শ। এর রয়েছে সুনির্দিষ্ট নৈতিক বিধান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে স্পষ্ট বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী। ইসলামের আবেদন ও আকর্ষণ অত্যন্ত জোরালোভাবে বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক। কারণ, এ ধর্মের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিশ্বের এক বিশাল অংশে লিবারেল ডেমোক্রেসির ওপর বিজয়ী হয়েছে এবং লিবারেল ব্যবস্থাগুলোর জন্য ইসলাম খুবই মারাত্মক হুমকি। এমনকি যেসব মুসলিম দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় ইসলাম অনুপস্থিত, সে সব দেশেও ইসলাম এক মারাত্মক হুমকি।' ফুকোয়ামার বক্তব্য থেকেই পশ্চিমী বিশ্বের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের কারণ খুবই সুস্পষ্ট।

মূলত কথিত ইসলামভীতি তাদের ভাষায় ইসলামী মৌলবাদভীতিই পুরো বিশ্ব পরিস্থিতিকে অস্থির ও অশান্ত করে তুলেছে। বিংশ শতকের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের ঘরোয়া বিতর্কে ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইয়াহুদী, ইসলামী, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের কিছু ধারা জোরদার হয়ে ওঠে। এ ধারাকে পাশ্চাত্য পন্ডিত পিটরাল বার্গার ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী ধারা বলে উল্লেখ করেছেন। এ সময় থেকেই মৌলবাদ বা মৌলবাদী শব্দটির ব্যবহার বাড়তে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে এ শব্দের ব্যবহার আরও ছড়িয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে হান্টিংটন ও বার্নার্ড লুইসের মতো কোন কোন চিন্তাবিদ এ তত্ত্ব তুলে ধরেন যে, ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব বা সংঘাত হবে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে। আর এই বায়বীয় ভীতি থেকেই পশ্চিমা ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে তাদেরপ্রতিপক্ষ বানিয়েছে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে পরিকল্পিতভাবে জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

মূলত ইসলামী সভ্যতার জন্য দু'টি মৌলিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল দুই দিক থেকে। একটি হল এর অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়। আর দ্বিতীয়টি হল মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা আধুনিকতাবাদের সর্বাত্মক হামলা। ইসলামপন্থীরা মনে করে বর্তমান সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল ইসলামের ঐতিহ্য ও অতীতের দিকে ফিরে যাওয়া। পশ্চিমা চিন্তাবিদদের সমালোচনার কারণে ঘরের ভেতরই পশ্চিমা আধুনিকতাবাদের মধ্যে চিন্তাগত বিভেদ দেখা দিয়েছে এবং জন্ম নিয়েছে পোস্ট মডার্নিজম বা উত্তর-আধুনিকতাবাদ। এছাড়াও বিশ্বায়নের ফলে ইসলামকে এর সকল দিকসহ পুনরুজ্জীবিত করার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর সে সুযোগটাই নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন উদীয়মান মুসলিম শক্তি। আর তা বিশ্ব পরাশক্তি ও পশ্চিমা বিশ্ব মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই বৈশ্বিক রাজনীতি মুসলমানদের পুনরুজ্জীবনকে ঠেকানোর জন্যই মুসলিম শক্তিকে সন্ত্রাববাদী আখ্যা দেয়ার ব্যর্থ কসরত করা হচ্ছে।

মূলত ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ জীবন বিধান। তাই ইসলামে উগ্রবাদ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। ইসলাম শত্রুর সঙ্গেও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ঘোষণা, 'হে মুমিনগণ! আল-াহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন'।[৪৬৫]

৪৬৫. *আল কুরআন*, ০৫ : ০৮

উপসংহার

আল-কুরআন মানব রচিত কোনো গ্রন্থ নয়। এটা মহান আল্লাহর বাণী। এতে মানব জাতির পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম-বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের শিক্ষার সার সংক্ষেপ এই গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্য সব আসমানী কিতাবের আর কোন কার্যকারিতা নেই। পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। কুরআনের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং এখন আল-কুরআনই মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শক। আলোচ্য থিসিস বা গবেষণা কর্মটিতে বিস্তারিতভাবে পারিবারিক ও সামাজিক বিধিবিধানসহ সূরা আন নূরের আলোকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা : বাংলাদেশে এর প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পেয়েছি।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের মানবতাবাদীরা মানুষকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। সমাজের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে অন্যায় অপকর্ম, যিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, অপবাদ, খোঁটা দেওয়া মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজের অনুসরণ ও অনুকরণের ফলে আজ বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে অশান্তির দেশ। আজ মানব জাতি যখন অধঃপতন আর অবক্ষয়ের অন্ধকূপের অতল গহবরে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে, তখন কী করে মুসলিম জাতি চুপচাপ দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে? একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আজ মুসলিম উম্মাহকে দায়িত্ব নিতে হবে গোটা মানব জাতিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে পরিচালনা করার।

যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টিকূলের মধ্যে সেরা বানিয়েছেন, বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাকশক্তি, বাকস্বাধীনতা একমাত্র মানূষকেই দিয়েছেন সেহেতু তাদের উচিৎ ছিল একমাত্র তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র পরিচালনা করা। কিন্তু মানুষ তা না করে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হয়েছে এবং তাঁর অবাধ্য হয়েছে, ভুলে গেছে তার অতীত ও ভবিষ্যতের কথা। তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষকে সঠিক পথের সন্ধ্যান দিয়েছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক মানুষকে সেই জীবন ব্যবস্থার দিকে আহবান করাই হচ্ছে ইসলামের মূল কাজ। বর্তমান বিশ্বে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য আধিপাত্যবাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে দ্বীনের মূল অবস্থান থেকে দূরে সরে গেছে। এ কারণেই আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি ও দুঃশাসন বিরাজ করছে। এ পথ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর বিধি বিধানকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা। সূরা আন নূরে পারিবারিক ও সামাজিক সকল বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিশদ পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা যদি সূরা আন নূরের আলোকে আমাদের পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা সাজাতে পারি বা পরিবর্তন করতে পারি তাহলেই ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির সম্ভাবনা আছে।

বাংলাদেশ সূরা আন নূরের শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পারিবারিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে যিনা, ব্যভিচার, পরকিয়া, সমকামিতা, লিভ টুগেদার, মদ, জুয়া, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, মিথ্যা অপবাদ, পারস্পরিক কলহ, খোঁটা দানসহ সার্বিক বিষয়ে যদি সমাজের এবং পরিবারের প্রতিটি মানুষকে এর সুবিধা ও অসুবিধা বুঝানো যায় তাহলেই পরিবার, সমাজ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ।

সূরা আন নূরের আলোকে আমাদের পরিবার, সমাজ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারি মহান রবের নিকট এ প্রত্যাশা কামনা করছি। আমীন।

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুরআন

২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম ইবন মুগীরাহ ইবন আহনাফ বারদিযবাহ আল জুফী আল বুখারী (রহ.), *সহীহ বুখারী*, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল- ২০১২)

৩. আল ইমাম আল হাফেজ হুজ্জাতুল ইসলাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জজ আল কুশিয়ারী আন-নায়সাবুরী, সহীহ মুসলিম, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনুদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- ২০১০)

৪. সুলাইমান ইবন আশআস ইবন ইসহাক ইবন বুশাইর ইবন সাদ্দাদ ইবন আমর ইবন ইমরান আল আযদি আস সিজিস্তানি, *সুনানে আবু দাউদ*, অনু : ড. আ. ফ. ম. আবূ বকর সিদ্দীক (ঢাক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- ২০০৬)

৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আস সুলামি আদ দারির আল বুগি আত তিরমিযি, *সুনানে তিরমিযী*, অনু : হুসাইন বিন সোহরাব (ঢাকা-হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ২০১১)

৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আল রবঈ ইবনু মাজাহ আল কাযবীনী, সুনানে ইবনে মাজাহ, অনু : মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ২০০১)

৭. আবু আবদুর রহমান আহমাদ আন নাসাঈ (রহ.), *সুনান আন নাসাঈ*, অনু : আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল-২০১৩)

৮. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন কাছীর (রহ.), *তাফসীরে ইবন কাসীর*, অনু : অধ্যাপক মাওলানা আক্তার ফারূক (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৩)

৯. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনু : মাওলানা মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন খান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০১২)

১০. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, অনু : মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, প্রকাশকাল- তা.বি.)

১১. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন*, অনু : ওয়ারেসুল হক (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- ২০১২)

১২. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তকী উসমানী, *উলূমুল কুরআন*, অনু : মাওলানা মাহমুদুল হাসান আরিফ (ঢাকা : মাকতাবাতুত তাকওয়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল- তা.বি.)

১৩. ইমাদ আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদ আহমাদ*, অনু : অনুবাদকমন্ডলী কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০৮)

১৪. শাইখ মুহাম্মাদ নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.), *সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব*, অনু : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল কাফী আল-মাদানী (ঢাকা : ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, প্রকাশকাল- তা.বি.)

১৫. আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী (রহ.), *তাফসীরে তাবারী*, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বধানে অনূদিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-১৯৯৩)

১৬. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.), তাফসীরে মাযহারী, অনু : মাওলানা তালেব আলী (ঢাকা : হাকিমাবাদ খানকায়ে মুজাদ্দেদিয়া, প্রকাশকাল-২০১০)

১৭. মাওলনা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম, *তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন* (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, প্রকাশকাল-২০১৩)

১৮. ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল মিসরী আত তাহবী (রা.), *তাহাবী শরীফ*, অনু : মাওলানা জাকির হোসেন (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০১৪)

১৯. ইমাম মালেক (রা.), *মুয়াত্তা*, অনু : মুহাম্মদ রেজাউল করীম ইসলামাবাদী, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল-২০০২)

২০. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী (রহ.), *মা'আরিফুল হাদীস*, অনু : হাফেয মাওলানা মুজীবুর রহমান (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, প্রকাশকাল- ১৯৫৪)

২১. আবু বকর আহমাদ ইবন হোসাইন ইবন আলী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুসা, *বায়হাক্বী*, অনু : মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল-২০১৩),

২২. ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ বকর আহমাদ ইবন আলী আর রাযী আল যাসসাস আল হানাফী (রহ.) *আহকামুল কুরআন*, অনু : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (রহ.) (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রকাশকাল-২০০১)

২৩. আব্দুর রাজ্জাক ইবন হাম্মান ইবন নাফি আল সানানি, *মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক* (লেবানান, বৈরুত, প্রকাশকাল-২০০৫)

২৪. ইমাম আবু বকর ইবন আবি শাইবা (রহ.), *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*, অনু : মুফতি ইলিয়াস খান (ঢাকা : পথিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- তা.বি.)

২৫. *তাওদীহুল কাফিয়া আশ শাফিয়া*, অনু : মাওলানা মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, প্রকাশকাল - তা.বি.)

২৬. আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.), *সিলসিলাহ সহীহাহ*, হাফেয মুফতি মোবারক সালমান (আতিফা পাবলিকেশন, প্রকাশকাল - তা.বি.)